



যুক্তি

সংখ্যা ৩ জানুয়ারি ২০১০

•••

যুক্তি

সংখ্যা ৩

সম্পাদক

অনন্ত বিজয় দাশ

প্রচ্ছদ ছবি

ডারউইন দিবস উপলক্ষে নেচার ওয়েবসাইটের ডারউইন সংকলন থেকে সংগৃহীত

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১০

পরিবেশক

বইপত্র, দ্বিতীয় তলা, রাজাম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

তক্ষশিলা, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা

শুদ্ধস্বর, ৯১, তৃতীয় তলা, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা

যোগাযোগ

যুক্তি

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল

নাজমা বুকডিপো

২য় তলা, রাজাম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট।

মুঠোফোন : +৮৮০১৭১২৯৬৬৮১৩, +৮৮০১৭১২৯৯১৮৫৬

ইমেইল : ananta_bijoy@yahoo.com

মুদ্রক

প্যারাডাইম অফসেট প্রেস

রাজা ম্যানশন, দ্বিতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট। ০১৭১১ ৩৭১ ৯১১

মূল্য

বাংলাদেশ : ১২০ টাকা

বিদেশ : ৮ ডলার (ইউএসএ)

সূচি

প্রবন্ধ

শেষ-অধিনায়ক : চার্লস ডারউইন / দ্বিজেন শর্মা ৯

বিবর্তন তত্ত্বের দর্শন / শহিদুল ইসলাম ২২

সুদূর অতীতে গেলে আমরা একই পূর্বপুরুষ দেখবো / আসিফ ২৭

বিবর্তনের সহজ পাঠ / অভিজিৎ রায় ৩৪

সাক্ষাৎকার

সন বি. ক্যারল ৬১

অনুবাদ

বিবর্তন নিয়ে চারটি ভ্রান্ত ধারণা /

মূল : চার্লস সুব্লিভান ও ক্যামেরন ম্যাকফেরসন স্মিথ ৭৩

প্রবন্ধ

বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণে বাধা কোথায় / বিরঞ্জন রায় ৮৭

আর্ডি—আমাদের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল / বন্যা আহমেদ ৯২

ডারউইন থেকে ডাবল হেলিক্স / দিগন্ত সরকার ১০৪

প্রসঙ্গ 'বিবর্তন' : জাকির নায়েকের মিথ্যাচার / শিক্ষানবিস ১১৯

সাক্ষাৎকার

প্রবীর ঘোষ ১৪২

অনুবাদ

ঈশ্বরবাদ খণ্ডন / মূল : ড্যান বার্কার ১৫৯

প্রবন্ধ

নারী জাগৃতির প্রান্তিক সমীক্ষায় রোকেয়া ও তসলিমা / রণজিৎ কর ১৭২

'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ! / সৈকত চৌধুরী ও অনন্ত বিজয় দাশ

সম্পাদকীয়

একটা বছর বিরতিতে যুক্তি তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ পেল। আমাদের সীমাবদ্ধতা-সংকট চীনের প্রাচীরের মত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফলে শত সাধ থাকা সত্ত্বেও সাথে কুলায়নি। জানি, পাঠকের দরবারে এ ওজর-আপত্তি ধোপে টিকবে না। তবু চরম সত্যি কথা, আগামীতেও আবার কবে যুক্তি নিয়ে হাজির হব অথবা আদৌ সক্ষম হব কি-না নিশ্চিত নই। শুধু আশা রইলো দেখা হবে আবার।

বিবর্তন তত্ত্ব : ইহজাগতিক বোধের প্রথম পাঠ

চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) নাম শিক্ষিতজনের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। ডারউইনের কীর্তি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হলেও অন্তত তাঁর নামটা অনেকে জানেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ডারউইনের জন্মদিবসবার্ষিকী এবং গত ২৪ নভেম্বর তাঁর দুনিয়া কাঁপানো বই *অরিজিন অব স্পিসিজ*’র দেড়শ বছর পূর্তি—ঘটা করে উদ্‌যাপিত হল সারা বিশ্বে। ২০০৯ সাল আন্তর্জাতিকভাবে ‘ডারউইন বর্ষ’ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে *শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ*, *বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ*, *ডিসকাশন প্রজেক্ট* প্রমুখ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান-সংগঠন ডারউইনের জন্মদিবসবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পাশাপাশি বছরব্যাপী তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করে। *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*-ও সীমিত সাধ্যের অংশ হিসেবে যুক্তি’র এবারের মূল বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে চার্লস ডারউইন ও জৈববিবর্তন তত্ত্বকে। স্মরণিকায় প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, অনুবাদের মাধ্যমে ডারউইন ও তাঁর জৈববিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাবনার পটভূমি, তত্ত্বের মূল বার্তা, জৈববিবর্তন প্রক্রিয়া, এবং প্রজাতির উৎপত্তি-বিকাশ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসার একটা সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা চালিয়েছি। কারণ আমরা মনে করি বিবর্তন তত্ত্ব একজন মানুষের ইহজাগতিক বোধের প্রথম পাঠ। এ তত্ত্ব ব্যতীত মানুষের ইহজাগতিক জ্ঞান পূর্ণতা পায় না, ইহজাগতিক বোধও গড়ে ওঠে না। এটি শুধু নিছক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, মানুষের চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, জীবনচরণকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। পৃথিবীতে ইতিহাস-সৃষ্টিকারী, মানুষের মননে-চেতনায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম গুটিকয়েক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বের মধ্যে এটি অন্যতম।

ধর্মতত্ত্বীদের হাজার বছরের জীর্ণ ধারণা ‘পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব, ঈশ্বরের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের অবস্থান প্রাণীজগতের শীর্ষে’। ধোঁয়াটে এ ধারণা দূরীকরণে ষোড়শ শতাব্দীতে কপারনিকাস যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, ‘পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা’র বদলে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বছবি—পরবর্তীতে এগিয়ে নিয়েছিলেন ব্রুনো, টাইকো ব্রাহে, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইনের মত প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। যতই ধর্মতত্ত্বীরা গলার আওয়াজ উচ্চ করুক, আজ আর কেউ পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু অবশেষরূপে টিকে রয়েছে ‘আশরাফুল মখলুকাত’। ১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থের মাধ্যমে প্রথম সেই অবশেষের ‘মুখতুড়’ জবাব দিয়েছিলেন। প্রাণের উৎপত্তি, বিকাশের উপর আরোপিত দীর্ঘদিনের অলৌকিকতার ধুম্রজাল সরিয়ে তিনি দেখালেন, এ ধরনীতে মানুষসহ সকল প্রজাতির উদ্ভব প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই ঘটেছে, কোন প্রাণীই বিশেষ সৃষ্টি নয়। ক্ষুদ্র এককোষী জীব এ্যামিবা, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কুমির, হাতি, পাখি, বাঁদর, শিম্পাঞ্জি, মানুষ, ময়ূর ইত্যাদি সব প্রজাতির জীবের ‘সাধারণ পূর্বপুরুষ’ (Common Ancestor) একই। বলা যায়, দূরের সম্পর্কে হলেও এরা সকলে একে অন্যের আত্মীয়। সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আদি সরল প্রাণ উৎপত্তির পর হতে মিউটেশন (পরিব্যক্তি), ভ্যারিয়েশন (প্রকারণ)-এর মাধ্যমে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে হাজারো প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো প্রজাতি টিকে গেছে আবার অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সকল

প্রাণীই বিবর্তনের ফসল। ডারউইনের এ বক্তব্য আজ শুধু মুখের কথা নয়, ফসিলবিদ্যা, ভূজীববিদ্যা থেকে শুরু করে বংশগতিবিদ্যা, কোষবংশগতিবিদ্যা, আণবিক জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের নবনব শাখা বিভিন্ন পরিসর হতে প্রমাণ সংগ্রহ করে বিবর্তন তত্ত্বকে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের যে কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মতই শক্ত ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা বিবর্তনকে আণবিক পর্যায়ে পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করে চলছেন। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর জিন বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে, আমরা কতটা একে অন্যের আত্মীয়; যেমন শিম্পাঞ্জি ও মানুষের ডিএনএ’র মিল প্রায় ৯৮.৬%, ওরাওটাঙের সাথে ৯৭%, এমন কী ইঁদুরের সাথে আমাদের ডিএনএ’র মিল প্রায় ৮৫%। এর অর্থ হচ্ছে, যে প্রজাতি যত পূর্বে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাদের সাথে আজকে মানব প্রজাতির ডিএনএ’র মিলের পরিমাণও কম। মানুষের অন্য কোনো প্রজাতি যেহেতু বেঁচে নেই সে হিসাবে বর্তমানে শিম্পাঞ্জি-ই আমাদের নিকট আত্মীয়!

কপারনিকাস যে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, ‘পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে একটি সাধারণ গ্রহে’ বানিয়ে দিলে ধর্মতত্ত্বীরা দীর্ঘদিন হুম্বিতম্বি করে একসময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ডারউইন করলেনটা কী? একেবারে ইতর প্রাণীর সাথে মানুষের আত্মীয়তার বন্ধন রচনা করলেন! ধর্মতত্ত্বীদের উন্মাসিকতা-অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বিজ্ঞান যতই চাক্ষুস প্রমাণ হাজির করুক না কেন, সবটাতেই তাদের আপত্তি। ‘মানুষের জীবন হতে ঈশ্বরের ভূমিকা’ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় গত দেড়শ বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে তারা দ্বন্দ্ব-বিরোধ-কুৎসায় লিপ্ত। সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র আঁটে। যেমনটা আমরা স্মরণ করতে পারি : *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার ৭ মাস পর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬০ সালের জুন মাসে অক্সফোর্ডে তাদের সম্মেলনের সময় উক্ত গ্রন্থ নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে। স্বাভাবিকভাবেই সভাটি পরিণত হয় এক চাঞ্চল্যকর, উত্তপ্ত বিতর্কে, যা পরবর্তীতে ‘অক্সফোর্ড বিতর্ক’ নামে খ্যাত। বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে এই বিতর্কে ধর্মতত্ত্বীদের খ্যাতিমান প্রতিনিধি অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের প্রতিনিধি টমাস হার্সলির কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলে গোটা হলরুম জুড়ে শুরু হয়ে যায় ধর্মতত্ত্বীদের লক্ষ্যবক্ষ। সেসময় উরসেস্টারের বিশপের স্ত্রী বলতে থাকেন : “ঈশ্বরের দোহাই, ডারউইনের এই তত্ত্বটি যেন সত্য না হয়—কিন্তু যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তত্ত্বটি যেন সাধারণ মানুষেরা কখনো জানতে না পারে।”

কিন্তু সত্যকে তো দীর্ঘদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না, প্রকাশ পাবেই। গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে কোনোভাবেই আর ‘ব্যক্তিগত মতবাদ’ হিসেবে আটকে রাখা গেল না। বিংশ শতাব্দীর শুরু দিকে বিজ্ঞানীরা যতই বংশগতি সম্পর্কে জানতে পারছিলেন, বিশেষ করে যখন জোহান মেন্ডেল, মরগ্যানের বংশাণু প্রবাহের সূত্র প্রকাশ্যে এসে গেল তখন বিবর্তন তত্ত্বও পূর্ণতা পেল। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা দূর হল। রচিত হল ‘বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব’। জেমস ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস ক্রিকের যৌথ প্রচেষ্টায় ডিএনএ’র গঠন আবিষ্কারের পর থেকে জীববিজ্ঞানের নতুন শাখা ‘আণবিক জীববিজ্ঞান’-ও বিবর্তনকে একেবারে পরীক্ষাগারে প্রমাণ করতে সক্ষম হল। এখন আর বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো সংশয় বা সন্দেহ নেই।

মনে রাখতে হবে, বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা বা কুৎসা লেপন শুধু ধর্মতত্ত্বীদের দ্বারা হয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ-আমেরিকার রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ ও অতিমুনাফালোভী ধনিকশ্রেণী জৈববিবর্তনকে ভালোভাবে না বুঝেই এই তত্ত্বকে তাদের মুনাফা লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে; জন্ম দিয়েছে সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism), ইউজেনিস্ম, বর্ণবাদের। যেহেতু জৈববিবর্তনের সূত্রানুযায়ী ‘যোগ্যতমের টিকে থাকা’ হচ্ছে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’, অতএব ধনকুবেররা তাদের অনৈতিক ব্যবসা, শ্রমিক শোষণ, অধিক মুনাফাকে স্বাভাবিক ঘটনা

হিসেবে বর্ণনা করে, জৈববিবর্তনের মত তথাকথিত ‘সমাজ-বিবর্তন’-এর অসিলা হাজির করে! হার্বার্ট স্পেন্সার, ফ্রান্সিস গ্যালটনের মত কতিপয় ব্যক্তি সময়ে সময়ে ‘অগ্নিতে ঘি প্রদান করেন’। এ বিষয়টি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে দিগন্ত সরকারের লেখায়। লেখক আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন, সেটা হল ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে। ডারউইনের সময় বংশগতি সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন বৈজ্ঞানিক ধারণাই ছিল না। ডারউইনও বিষয়টি স্পষ্ট জানতেন না। সরাসরি বললে বলতে হয়, ডারউইনের বংশগতি সম্পর্কে ‘প্যাঞ্জেনেসিস’ ধারণাটি আজ পরিত্যক্ত। তিনি *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর ‘ভ্যারিয়েশনের বিধি’ অধ্যায়ে এবং *ভেরিয়েশনস্ অব অ্যানিমেলস্ অ্যান্ড প্ল্যান্টস্ আন্ডার ডমেস্টিকেশন* গ্রন্থে যে ‘গেম্মুল’ (Gemmule) নামক অনুকল্প হাজির করেছিলেন তা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই আজকাল কেউ আর ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জনের একান্ত ইচ্ছা না হলে ডারউইনের বংশগতির অনুকল্পটি পাঠ করে না। এখানেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। ডারউইন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও তার অনুকল্পের যে অংশ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, তা নির্দিধায় বাদ দেওয়া হয়েছে আর যে অংশ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা ‘তত্ত্ব’ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সবাই জানে বংশগতি জীবদেহে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় মেডেল-মরগ্যানের সূত্রানুসারে।

আমরা ইতিহাস হতে দেখেছি, কায়মী শাসকগোষ্ঠী আর তাদের মিত্ররা যখন দেখে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তখন আশ্রয় নেয় সত্য বিকৃতির! এটাই সবচেয়ে সহজ পথ মানুষের চেতনা থেকে সত্যকে দূরে সরিয়ে রাখার। আজকের যুগে বিবর্তন তত্ত্ব বিভিন্নভাবেই প্রমাণিত, তারপরও বিবর্তন তত্ত্বের কিভাবে বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, তার চমৎকার উদাহরণ ‘প্রসঙ্গ বিবর্তন : জাকির নায়েকের মিথ্যাচার’ শীর্ষক লেখাটি। বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হলে ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞান, এবং বক্তব্যে প্রমাণ ও যুক্তি থাকতে হয়, এগুলো না থাকলে বিরোধিতা আর বিরোধিতা থাকে না, ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত বিবর্তন-তাত্ত্বিক দ্বিজেন শর্মা তাঁর লেখনীতে ডারউইনের রোজনামাচার নান্দীপাঠ করেছেন; একজন বিজ্ঞানীর একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ, ভালোবাসা, দৈনন্দিন কার্যাবলী—যা আমাদের সামনে মূর্তিমান করে তোলে ব্যক্তি ডারউইনের মুখচ্ছবি পাশাপাশি তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মসূহা, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা শিহরণ জাগায়, নতুন করে ভালোবাসতে-বুঝতে শেখায় বিজ্ঞানকে। অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম ‘বিবর্তন তত্ত্বের দর্শন’ প্রবন্ধে অত্যন্ত চমৎকারভাবেই বিবর্তন তত্ত্বের ইহজাগতিকতার বয়ান দিয়েছেন। অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন, মানব চেতনায় এ তত্ত্বের সুদূর প্রসারী প্রভাব। বিরঞ্জন রায় ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতার রকমফের, সেই সাথে পথ বাতলে দিচ্ছেন ইহজাগতিকতা বিকাশে বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মীদের ভূমিকা ও তাদের কর্মকৌশল। বলার অপেক্ষা রাখে না আসিফ ও অভিজিৎ রায় জৈববিবর্তন তত্ত্বের মূল বার্থা-প্রক্রিয়া সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছেন, অনেক ভুল ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—বাংলা ভাষায় এ ধরনের লেখা বিরল। বন্যা আহমেদ মানুষের বিবর্তনের ওপর সদ্যপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে সাজিয়েছেন ‘আর্ডি—আমাদের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল’ লেখাটি। মানব বিবর্তনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি তিনি আমাদের জানান দিয়েছেন, আজকের ‘জীববিজ্ঞানের শতাব্দীতে’ বিবর্তন বিরোধিতার স্বরূপ। বিরোধিতাকারীদের ‘মুখগুলো সব যায় চেনা।’ অধ্যাপক সন ক্যারলের সাক্ষাৎকার আর যৌথভাবে লেখা চার্লস সুল্লিভান ও ক্যামেরন ম্যাকফেরসন স্মিথের ‘বিবর্তন নিয়ে চারটি ভ্রান্ত ধারণা’ লেখা দুটি নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। নবীন লেখকের হাতে প্রথম অনূদিত লেখার বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা বরং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অধ্যাপক সন ক্যারল, চার্লস সুল্লিভান ও ক্যামেরন ম্যাকফেরসন স্মিথের প্রতি। অত্যন্ত উৎসাহের সাথেই আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন তাঁদের লেখা অনুবাদের।

ডারউইন এবং তাঁর জৈববিবর্তন তত্ত্বের বাইরে আরো কিছু লেখা আমরা এ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি, যথা : প্রবীর ঘোষের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় কিস্তি, ড্যান বার্কীর *Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist* গ্রন্থের ঈশ্বরবাদ খণ্ডন শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ, নারী জাগৃতির প্রান্তিক সমীক্ষায় রোকেয়া ও তসলিমা, এবং ‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ!—প্রবন্ধগুলি অবশ্যই চিন্তাজাগানীয়া, চিরাচরিত ধ্যান ধারণার বাইরে থেকে লেখা; যা প্রকাশ করে লেখকের যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিমোহ মানসিকতা আর কঠোর অধ্যবসায়। আশা করি যুক্তি এবারো তার পাঠকপ্রিয়তা ধরে রাখবে, সমাজমানসে বৌদ্ধিক বিকাশে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যুক্তির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, উদ্দীপনা আর নিরন্তর সহযোগিতায় প্রকাশযোগ্য করে তুলেছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। প্রথমেই স্মরণ করি *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*-এর অন্যতম সদস্য, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ ও মুক্তমনার যাদ্যাসিক পত্রিকা ‘মুক্তস্বের’ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাহবুব সাঈদ মামুন-এর কথা। অন্তরালের এই প্রাজ্ঞ মানুষটি যুক্তি আর মানবতাবোধের অনলে শোধিত একখণ্ড হীরের ন্যায় দ্বীপ্তমান। প্রথা আর মিথে আবদ্ধ এ সমাজে ‘রঙ মেখে সঙ সেজে’ প্রদর্শনোচ্ছায় তৎপর শতশত ‘সুশীল’ কিংবা ‘নেতা’-এর মত ভাগ ধরার প্রতি রয়েছে তাঁর তীব্র অনীহা। দীর্ঘদিন দূর পরবাসে থেকেও নীরবে-নিভূতে শোষণমুক্ত জনগণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আদর্শ-চিন্তা, কর্মপ্রক্রিয়া আর লক্ষ্যে মিল থাকায় আমরা আজ একই পথে যাত্রী। পথ চলতে অকৃত্রিম বন্ধুর মত আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, সাহস যোগান দিয়েছেন, মুক্তহস্তে যুক্তির প্রকাশনায় এগিয়ে এসেছেন নির্দিধায়। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা ছাড়া এ মানবের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিপোষনীয়।

বলতে হয় *বি.য়ু.কা’র* প্রাক্তন আহ্বায়ক, *তপোবন কিভারগার্টেন*-এর প্রধান শিক্ষক মাহমুদ আলী, বর্তমান সভাপতি, সাপ্তাহিক *দিবালোক* সম্পাদক হাসান শাহরিয়ার, সদস্য কর্মযোগী আনোয়ার হোসেন-এর কথা। যাঁদের নিরলস পরিশ্রম, মেধা, দক্ষতা আর দর্শনে মিলেমিশে গড়ে উঠেছে *বি.য়ু.কা’*। ২০০৫ সালের ২৭ জুলাই উজানশ্রোতে তরী ভাসিয়েছিলাম আমরা ক’জনা। যুক্তির প্রতি তাঁদের মমত্ববোধ, ভালোবাসা অভিবাদ্য। রয়েছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ ড. মোস্বাক আহমাদ দীন, স্থিতধী নুরুল ইসলাম—যাঁদের বুদ্ধি, সৎপরামর্শ, আলোচনা আমাদের আঁধার রাতে পথ চলতে আলো দেখিয়েছে। বিশেষ করে মোস্বাক আহমাদ দীন তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস জমা দানের শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও সাহায্যে যুক্তির দ্বিতীয় সংখ্যার গ্রন্থ দেখে দিয়েছেন তা কখনো ভুলবার নয়। নুরুল ইসলামের নিমোহ দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজসচেতন-নির্দলীয় রাজনৈতিক ভাবনা আমাদের চেতনার জগতকে অনুপ্রাণিত-আলোড়িত করেছে বিভিন্ন সময়। *বি.য়ু.কা’র* সদস্য, বর্তমানে ইংল্যান্ড প্রবাসী জাহিদ রাসেল, অসীম দাস, ইটালি প্রবাসী ছাদিকুর রহমান ছাদী—দূর পরবাসে থেকেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। এ মানবত্রয়ের দেহখানি শুধু প্রবাসে কিন্তু চিন্তার জগৎখানি সম্পূর্ণটাই সোঁদা মাটির গন্ধে মাখা বাংলাদেশে। প্রয়োজন মুহূর্তেই আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সহানুভূতিশীল হাত। সবশেষে বলতে হয়, *বি.য়ু.কা’র* বাকি সব সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং যুক্তির লেখকদের কথা। যারা প্রাণ সঞ্চার করেছেন যুক্তির, তিলতিল করে প্রকাশযোগ্য করেছেন পাঠকের কাছে। তাঁদেরকে অন্তহীন অভিবাদন। যুক্তির প্রাপ্য সকল প্রশংসা, ধন্যবাদ অবশ্যই উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের আর দায় নিঃসন্দেহে সম্পাদকের। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

শেষ-অধিনায়ক : চার্লস ডারউইন

দ্বিজেন শর্মা*

এক

১৮৭৬ সালের গ্রীষ্মের এক ভোরে লন্ডন থেকে উনিশ মাইল দূরে ওফিংটন রেলস্টেশনের লাগোয়া ডাউন গ্রামের নির্জন পথে যে বৃদ্ধ হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তিনি সেখানকার সকলেরই প্রিয়। তাঁর দীর্ঘ দেহ সামনে ঝুঁকে পড়েছে, শরীর দুলাচ্ছে চলার ছন্দে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে লাঠির ঠক ঠক আওয়াজ। এমনি ভোরে বেড়ানো তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। প্রায় মধ্যযৌবন থেকেই তিনি অসুস্থ। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে এক পোকাকার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ থেকেই অসুখের শুরু। জ্বর, বমি, বদহজম, পেটে যন্ত্রণা, মাথাব্যথা এমনি নানা বিকার চলছে প্রায় ত্রিশ বছর। ওষুধে উপকার হয় না। শেষে গেলেন জলচিকিৎসার জন্য মেলভার্ন। কিছুটা ফল হল। বেশ কিছুদিন ভাল ছিলেন। সে-থেকেই ভোরে বেড়ানোর অভ্যাস। পরনে কালো টিলে পোষাক, মাথায় লম্বা টুপি, মুখে উচ্ছ্বসিত সাদা দাড়ি, হেঁটেফেলা গৌঁফ, বুলে পড়া দ্রুত নীচে তীক্ষ্ণ বাদামী চোখ, কপালে অজস্র কুঞ্জন, মুখ রক্তভাষ মসৃণ। প্রায় সারা জীবনই রোগজর্জর, তবু মুখে তার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন নেই। প্রশান্তির প্রগাঢ়তায় দীপ্ত মুখশ্রী।

একদা, অনেককাল আগে ছেলেরাও সঙ্গে বেড়াতে আসত। এখন তারা বড়, প্রতিষ্ঠিত। মেয়েরাও বিবাহিত। তবু নিঃসঙ্গ নন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে অবসর নেবার কথা ভাবেন না। ঘড়ি দেখলেন। সাতটা বাজে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। হাতে অনেক কাজ।

আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একটানা গবেষণা, শুধু ন'টায় একবার আসেন ড্রয়িংরুমে, চিঠির খোঁজে।

প্রতিদিন অজস্র চিঠি আসে। দেশ-বিদেশ, দূর-দূরান্তর থেকে কত জনের কত জিজ্ঞাসা! প্রকাশক, পণ্ডিত, সহকর্মী, সুহৃদ, ভক্তবৃন্দ, বিজ্ঞানী, ছাত্র, সাধারণ মানুষ

* দ্বিজেন শর্মা : বাংলাদেশের প্রখ্যাত নিসর্গবিদ এবং বিজ্ঞান-লেখক। দীর্ঘকাল বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ এবং ঢাকার নটরডেম কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে কাজের সুবাদে অনুবাদক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : 'শ্যামলী নিসর্গ', 'জীবনের শেষ নেই', 'গহন কোন বনের ধারে', 'চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি', 'ডারউইন : বিগল-যাত্রীর ভ্রমণকথা', 'সতীর্থ বলয়ে ডারউইন' ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে সতীর্থ বলয়ে ডারউইন (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৯) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

নানা বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে তাঁকে চিঠি লেখেন। সাধ্যমত সবার চিঠির উত্তর দেন। সময়ভাবে গ্রন্থপাঠে অসমর্থ ব্যক্তিকে তার আশু বক্তৃতার জন্য বিবর্তনবাদের মর্মসার লিখে দিতেও বিরক্ত হন না। শুধু ধর্ম-সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর অপার অনীহা। নিজে নাস্তিক, ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী। কিন্তু, কারও ধর্মবোধে বিন্দুমাত্র আঘাত দেন না। শিক্ষাগুরু হেনস্লেয়া, অগ্রজপ্রতিম লায়েল, সুহৃদ হুকার সবাই আন্তিক। ধর্ম নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কখনও মনান্তর ঘটেনি। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন 'বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিটস্‌রয়। বিবর্তনবাদের গবেষণা থেকে তাঁকে বিরত করার জন্য ডাউন গ্রামেও এসেছিলেন। নিসর্গী হিসাবে তাঁকে নিজ জাহাজে নির্বাচন করার জন্য ফিটস্‌রয় আক্ষেপ করেছেন আজীবন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে ডারউইন কারও সঙ্গেই আপোস করেননি। এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রীর করুণ অনুনয়েও না। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'নাস্তিকাই স্বামীর রোগের উৎস'।

একটি চিঠিতে দেখলেন জনৈক জার্মান প্রকাশক তাঁকে আত্মজীবনী লেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। মনে পড়ল পিতামহের কথা। একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক, কবি ও বিজ্ঞানী। লামার্কের সমসাময়িক এই পুরুষসিংহ বিবর্তন-তত্ত্বেরও পিতামহ। আজকের সমগ্র জীবজগৎ যে একই পূর্বপুরুষ-উদ্ভূত এবং কোটি কোটি বৎসরের পরিবর্তনের ফল তাঁর বহু রচনায় এই তত্ত্ব বিবৃত ছিল। তিনিও আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তাঁরা সকলেই সেই গ্রন্থ পড়েছেন উত্তেজনা আর কৌতূহলে। ভাবলেন, তাঁর জীবনীও হয়ত সবাই পড়বে তেমনি। অন্তত আত্মীয়দের জন্য এমন কিছু লেখা বেমানান নয়।

আবার ফিরে গেলেন কাজে, তবু বারবার মনে এল সেই প্রসঙ্গ। আত্মজীবনী লিখলে কেমন হয়? কাজে মন বসল না। বেরিয়ে পড়লেন নিত্যদিনের দুপুর ভ্রমণে। সঙ্গে প্রিয় কুকুর পলি। যথানিয়মে প্রথমে গ্রিনহাউসে পরীক্ষাধীন গাছপালা দেখা এবং তারপর স্যান্ডওয়াকে। বৃত্তাকারে রোপিত লাইম, হেজেল আর বার্চ গাছে ঢাকা এই পথটি তাঁরই তৈরি। স্যান্ডওয়াক তাঁরই দেয়া নাম। গ্রিনহাউসের পর প্রশস্ত লন, দূরে অনুচ্চ পাহাড়, ঢালু উপত্যকায় পাইন বনে গভীর নির্জনতা।

এই পরিবেশই তাঁর ভাল লাগে। নির্জনতায় বিজ্ঞানে নিমগ্ন হবার জন্য এমনি পরিবেশই খুঁজছিলেন। আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে এই গাঁয়ে এসেছেন। বিপুল পৈতৃক সম্পদ ও বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া পর্যাপ্ত যৌতুকের জন্য কোন অর্থাভাব ছিল না। চিররুগ্ন হলেও প্রিয়তমা স্ত্রী আদর্শ সেবিকা। স্বদেশ ও বিদেশের অভ্যাগতেরা আসতেন ক্রমাগত। তাছাড়া তাঁর সাতটি সন্তান, বিপুল সংখ্যক আত্মীয় সমাগম, কখনো-বা বিপন্ন বন্ধুর সন্তান-সন্ততির উপস্থিতিতে ডাউন-ভবন সর্বদাই কল্লোলিত ছিল। কিন্তু তাঁর গবেষণায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হত না। অভ্যাগত ও বন্ধুরা অনেকেই ছিলেন সহযোগী

ও গবেষক। ‘বহুশোধিত সোনার মতো গুণান্বিতা’ বিচক্ষণ স্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় বাড়িতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত ছিল।

ছেলেবেলায় পতঙ্গ ও গোবরে পোকার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ছাত্রজীবনে প্রকৃতির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এক সময় ঠিক করেছিলেন গির্জায় যাজকের চাকুরি নিয়ে জীবন কাটাবেন গাঁয়ের নির্জনে। কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে উদ্ভিদবিদ্যার প্রখ্যাত শিক্ষক হেনস্লেয়ার অনুপ্রেরণায় প্রকৃতি-নিরীক্ষা সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। পরে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। চন্দ্রালোকিত সমুদ্র, মরুপ্রান্তরের আশ্চর্য সন্ধ্যা, বিশাল পর্বতভূমির নৈঃশব্দ্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ পর্যায়ের সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল ব্রাজিলের অরণ্যে। এই আদিম অনূঢ় অরণ্যের মহিমায় সম্মোহিত তাঁর সত্তার যেন রূপান্তর ঘটেছিল। তাই দেশে ফিরে এখানে, প্রকৃতির এই অব্যবহৃত ঐশ্বর্যের মাঝখানেই স্বস্তির আশ্বাদ পেয়েছিলেন। অতঃপর আর কোথাও যাননি। জন্মস্থান শ্রুসবারি থেকে অনেক দূরে শেষে এই পাড়াগাঁয়েই স্থায়ী বাসা বাঁধলেন।

এখন দুপুর। হেজেল আর লার্চ গাছের পাতায় হাওয়ার মৃদু গুঞ্জন। তিনি চলতে চলতে বারবার দাঁড়াচ্ছেন, গুনে গুনে দেখছেন ক’টি গাছ পেরিয়ে এলেন। এটি তাঁর অভ্যাস। এভাবেই তিনি তাঁর ভ্রমণপথের দূরত্ব মাপেন। বুড়ো হয়েছেন তবু দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ। গাছের উঁচু ডালে পাখির বাসা চোখে পড়ে, শুকনো পাতার ভিড়ে কাঠবিড়ালীর খেলা অনেকদূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পান, বলতে পারেন গাছের শিষডালে ঝুলে থাকা অর্কিডের নাম।

আজও অতি সাধারণ ব্যাপারেও তাঁর কৌতূহল এতটুকু ম্লান হয়নি। সন্তানের জন্য পাখির সহজাত মমত্ব, কাঠবিড়ালীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অর্কিডের পরাগ-সংযোগের আশ্চর্য অভিযোজনা এখনও তাঁকে বিস্মিত করে। আজকাল কেউ যখন প্রজাপতি কিংবা গোবরে পোকা ধরে আনে তিনি গভীর আগ্রহে পরীক্ষা করেন। মনে পড়ে কৈশোরে কখন কোথায় এই পোকা ধরেছিলেন। একবার হঠাৎ একটি দুস্প্রাপ্য গোবরে পোকা দেখে সেটা ধরতে দুহাতে রাখা দুটি পোকার একটি মুখে পুরেন এবং মুহূর্তে মুখের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন। এখনো উত্তেজনা-উদ্বেল সেইসব মুহূর্তে অবিকল চোখে ভাসে। এসব পোকার বিবরণ তিনি কাগজে পাঠাতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর নাম ছাপা হত। দুস্প্রাপ্য সংগ্রহ আর ছাপার হরফে নিজের নাম দেখার সে কী অতুল আনন্দ!

ক্রমে নেশাটি অশেষায় রূপান্তরিত হলে পিতা দারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। একে স্কুলের পড়াশোনায় অমনোযোগিতার কারণ হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। কোন ফল হল না। সেকালের যান্ত্রিক শিক্ষা, স্কুলের শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ এবং কল্পনাবিকাশের বিপ্রতীপ মুখস্থবিদ্যা তাঁর অসহ্য লাগত। শৈশবে মাতৃহীন এই নিঃসঙ্গ কিশোর তাই

স্কুল পালিয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। নানা জাতের পোকা-মাকড়, পাখি, মাঠের ইঁদুর তাঁকে প্রবলভাবে বাইরের জগতে আকর্ষণ করত। এরই পরিণতি যৌবনে অধ্যাপক হেনস্লেয়ার সঙ্গে প্রকৃতিনিরীক্ষা ও একাত্মতা এবং শেষাবধি কেমব্রিজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর কালবিলম্ব না করে ‘বিগল’ জাহাজে নিসর্গীর অবৈতনিক চাকুরী নিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে ভ্রমণ।

পাঁচ বছর পর যখন বাড়ি ফিরলেন, পিতা তাঁকে দেখে বিস্মিত হন, যেন রূপান্তরিত হয়েছেন তিনি। বললেন, ‘মাথায় খুলির গড়ন দেখি একেবারে বদলে গেছে।’ মনোবিদ-চিকিৎসকের এ উক্তির তাৎপর্য পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। খেয়ালি এক তরুণ নিসর্গী দেশে ফিরেছিলেন স্থিতধী বিজ্ঞানী হয়ে। সত্যটি প্রথম তাঁর পিতাই আবিষ্কার করেছিলেন।

আজ তিনি বিশ্বখ্যাত। শ্রেষ্ঠতম মনীষার প্রথম সারিতে তাঁর নাম। নিউটনের সঙ্গে তুলনায় তিনি উচ্চারিত। এই দুই বিজ্ঞানী যথাক্রমে ‘প্রিন্সিপিয়া’ ও ‘স্পিসিজেস’ দিয়ে ভৌত ও জীবজগৎ থেকে ক্রমান্বয়ে দৈবকে বিতাড়িত করে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথচ নিজের শ্রেষ্ঠতম রচনা ‘অরিজিন’ নিয়ে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার আশায় দীর্ঘ দুই দশক অপেক্ষা করেছেন। শেষে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে প্রথম দিনেই নিঃশেষিত হয় পুরো প্রথম সংস্করণ। বারো বছরে ছয়টি সংস্করণে সর্বমোট সংখ্যা ছাপা হল চল্লিশ হাজার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এই তত্ত্ব। বিবর্তন সম্পর্কে ইতিপূর্বে কম আলোচনা হয়নি। কিন্তু তাঁর মতো নিটোল যুক্তির ইমারতে আর কেউ তত্ত্বটিকে এমন দুর্ভেদ্য করতে পারেননি। জীবজগৎ সম্পর্কে অতঃপর যাবতীয় অজ্ঞতার সমাপ্তি ঘটল, পরাজিত কুসংস্কার নিরুদ্দিষ্ট হল ইতিহাসের আঁসাকুঁড়ে।

প্রজ্জ্বলিত দুপুর বাতাসে উষ্ণতা ছড়ায়। দমকা হাওয়ায় আন্দোলিত পাইনের বন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা উড়ে আসে। কলকাকলীতে উচ্ছ্রিত প্রাণের স্পন্দন। আজ অনেক দূর হেঁটে বেড়ালেন, যেন যৌবনের উচ্ছলতা আবার ফিরে পেয়েছেন। আশ্চর্য মনে হল দিনটিকে। ফেরার পথে একবার দিনের অবশিষ্ট কাজের কথা মনে করলেন। গবেষণা ছাড়া এখনও সময় পেলে পাতার পাতলা টুকরো কাটেন, ছবি আঁকেন। এসব কাজে তেমন পারদর্শী নন বলে আজও দুঃখ হয়। জীববিজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষাটি তাঁর মতে অপরিহার্য।

দুপুরে খাবার পর ড্রয়িংরুমে খবরের কাগজ পড়েন। তারপর লেখেনে চিঠিপত্রের জবাব। জার্মানি থেকে আসা সেই চিঠিটি আরেকবার পড়লেন। আত্মজীবনী নিয়ে অনেক ভাবলেন। শেষে একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়লেন। এখন তিনটা। এবার শোবার ঘরে বিশ্রাম। এ-সময় স্ত্রী উপন্যাস পড়েন। তিনি শোনেন। উপন্যাসে আজও আকর্ষণ আছে। সরল মিলনাত্মক কাহিনী ভাল লাগে। পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে এই ক্ষণিক

একাত্মতায় মুক্তি পান বিষয়মুখ বস্তুচর্চা থেকে, যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করে তাঁর চেতনা। মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি। কেমব্রিজে ছাত্রজীবনে কত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক পড়েছেন। মিল্টন আর শেক্সপিয়ারের ভক্ত ছিলেন। এখন আর কবিতা পড়েন না। নাটকেও রুচি নেই। সব যেন অপার্থ্য জঞ্জাল। অদ্ভুত পরিবর্তন, তবু সত্য।

জীবনী, ভ্রমণকাহিনী আর উপন্যাস এখনও ভাল লাগে। আর পড়েন বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ক্ল্যাসিকে অতৃপ্ত আকর্ষণ। টমাস হার্লির ‘অমেরুদণ্ডীর দেহসংস্থান’ আর বেলফোরের ‘ক্রণবিদ্যা’ বহুপঠিত, তবু সময় পেলেই আবারও পড়েন। জার্মান ভাষায় তেমন দখল নেই। তবু এই ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলি পড়তেই হয়। অপারগ হলে ছেলেদের সাহায্যে নেন। কার্ল মার্কসের পাঠান নিজের স্বাক্ষরিত ‘দ্যাস ক্যাপিটাল’ বইটিরও দেড়শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছেন মূল জার্মান থেকে।* পড়েন ‘ন্যাচার’ পত্রিকার নিবন্ধগুলি। গণিত আর পদার্থবিদ্যার অনেক নিবন্ধই সঠিক বোঝেন না। তবু চেষ্টার ক্রটি নেই। দুরূহের মর্মোদ্ধারেই তাঁর আনন্দ।

দিনের আলো নিভে আসে। আসন্ন সন্ধ্যার আভাসে পাইনবন নির্জনতর। বাইরে এলেন। লনে বসলেন ঘাসের উপর। স্ত্রী পাশের বেঞ্চিতে। জোরে হাওয়া বয়। প্রজ্জ্বলিত অ্যাজালিয়ার রঙ বাতাসে দোল খায়। লাইম গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়। গাঢ়

* যদিও গোটা বিষয়টিই বিবর্তন তত্ত্বের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়, তবু প্রাসঙ্গিক হওয়ায় জানানো যাচ্ছে ডারউইন সম্পর্কে এরকম একটি প্রচারণা রয়েছে : ‘মার্কস ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনকে তাঁর দ্যাস ক্যাপিটাল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠিয়েছিলেন এবং বইটি তিনি ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মার্কসকে চিঠি লিখে না করেন।’ মূল বিষয়টি হচ্ছে, এডওয়ার্ড এ্যাভেলিং (Edward Aveling) নাস্তিকতার উপর ‘The Student's Darwin’ নামের একটি বই লিখে ডারউইনকে উৎসর্গের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু ডারউইন রাজি হননি এবং তাঁকে চিঠি লিখে মত প্রকাশ করেছিলেন, ‘ধর্মীয় বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে সরাসরি লিপ্ত করানো উচিত নয়।’ এডওয়ার্ড এ্যাভেলিং হলেন কার্ল মার্কসের মেয়ে ইলানোর মার্কস (Elanor Marx)-এর স্বামী। ইলানোর মার্কসের কাছে কার্ল মার্কসের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র, কাগজপত্র সংরক্ষিত ছিল। স্বামী এ্যাভেলিংকে লেখা ডারউইনের চিঠিও তাঁর কাছে ছিল। পরবর্তীতে লোকমুখে এ্যাভেলিংকে লেখা এই চিঠির কথাই ‘মার্কসকে লেখা ডারউইনের চিঠি’ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। আর ডারউইনের কাছে এক কপি দ্যাস ক্যাপিটাল ছিল ঠিকই, তবে কানাডার বিখ্যাত বিবর্তন-তাত্ত্বিক মাইকেল রুজ (Machael Ruse) *Darwinism Defended* (Addition-Wesley Publ. Co, London, 1982) গ্রন্থে জানিয়েছেন : ‘ডারউইনের বাড়িতে গিয়ে তিনি দ্যাস ক্যাপিটাল বইটি সম্পূর্ণ অখোলা অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।’ (আরো দেখুন : The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2005). “Index to Creationist Claims” edited by Mark Isaak, from http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA002_2.html)।—সম্পাদক।

হয়ে আসে সন্ধ্যার নির্জনতা। পাইনের গভীর বন থেকে ভেসে আসে নাম-না-জানা পাখিদের ডাক।

অদূরে টেনিস খেলছে ছেলেরা। মাঝে মাঝে বল কাছে এসে পড়েছে। ফেরৎ দিচ্ছেন তিনি। বারবার তাকান ওদের দিকে। সেদিনের শিশুরা আজ যুবক। কী গভীর কৌতূহলেই না এদের শৈশব পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানুষের শৈশবেই তার মানুষতর জৈব-পরিচয়, তার আদিম আরণ্যক উত্তরাধিকার সবচেয়ে বেশি প্রকট থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে লেখা তাঁর গ্রন্থটি নিরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আজ পথিকৃৎ অবদান। প্রজাতির উৎস, মানুষের উদ্ভব, প্রবালদ্বীপের ভূতত্ত্বসহ নানাবিধ মৌলিক নিরীক্ষা, সিরিপিডার ওপর কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত মনোগ্রাফ, রোহিনী উদ্ভিদ, গৃহপালনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিবর্তন, পতঙ্গভুক উদ্ভিদ এবং কেঁচো সম্পর্কে বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনায় এই সাফল্য বড়ই অবিশ্বাস্য।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সব ঢেকে যায়: লন, বাগান, পাইনবীথি। তিনি ঘরে ফেরেন। জীবন বড় স্তিমিত, মছুর। কতদিন পার্টিতে যান না, সহ্য হয় না ভাল খাবার, রাত-জাগা, হৈচৈ। অথচ আনন্দ-উদ্দীপনায় তাঁর উৎসাহ চিরদিনের। আজ কতদিন এ গাঁয়ে আছেন, কিন্তু বাইরে গিয়েছেন খুবই কম। গোড়ার দিকে যেতেন জন্মভূমি শ্রুসবারি আর মাতুলালয় মায়ের। এখন বছরে শুধু একবার করে সমুদ্রস্নান আর ভাইবোন কিংবা মেয়েদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। একেবারে নিমগ্ন ছিলেন বিজ্ঞানের সাধনায়। রোগ আর যন্ত্রণার কবল থেকে যেটুকু সময় কেড়ে নিতে পেরেছেন তার এতটুকুও অপব্যয় করেননি কোনদিন।

খাবার ঘরে উদ্দাম উচ্ছলতা। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। এ স্পন্দন তাঁর পরিচিত। ভাবলেন একবার ওখানে যাবেন, বসবেন সবার সঙ্গে। শেষে আর গেলেন না। মনে হল বড় বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন, বেমানান ঠেকবেন তারুণ্যের ভিড়ে। তাঁর জন্য বরাদ্দ শুধু এককাপ চা, একটুকরা সিদ্ধ মাংস ও একটু পানীয়, আর কিছু না। মিষ্টি ভাল লাগে, কিন্তু খান না। ডাক্তারের বারণ।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সময়ের স্রোতকে এই মুহূর্তে বড় তীব্র মনে হয়, অসহায় মনে হয় নিজেকে। যেসব দিনেরা হারিয়ে গেছে তা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কোনদিন আর উজ্জলতা পাবে না এই স্তিমিত চেতনা। কেমব্রিজে যৌবনের সেই দিনগুলির স্মৃতি বারবার মনে আসে : কতো শিকার, পার্টি, হৈ-হল্লা, কী দূরন্ত বাঁধভাঙা যৌবনোচ্ছাস। হঠাৎ ক্লাস্তিতে ভেঙে পড়েন। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হন। সুদূর অতীত হঠাৎ খুব কাছে আসে। হারান দিনের বেদনার স্মৃতি বারবার মনে পড়ে, প্রতিটি নিখুঁত নিটোল হুবহু। কী দুঃসহ! মুক্তি চান তিনি এই অসহ্য ভার থেকে। কিন্তু পারেন না। বড়ো তীক্ষ্ণ তাঁর স্মৃতি। এমনটি তো ঘটেছে পিতা, পিতামহের জীবনেও।

মনে পড়ে শিক্ষাগুরু হেনস্লেমাকে, অগ্রজপ্রতিম লায়লকে। তাঁরা আর বেঁচে নেই। লায়ল শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ গাঁয়ে তাঁর কতবার এসেছেন। আর কোনদিন এ পথে তাঁদের ছায়া পড়বে না, শুনতে পাবেন না। তাঁদের প্রিয় কণ্ঠস্বর। সন্তরের গ্রীষ্মে গিয়েছিলেন ক্যামব্রিজ। ভূবিদ সেজউইক তখনো বেঁচে। ছিয়াশি বছর বয়সেও কর্মঠ। কিন্তু হেনস্লেমাহীন এই শহর তাঁরা শূন্য মনে হল। ইচ্ছা ছিল হেনস্লেমার সেই প্রিয় বাড়িটি একাবর দেখেন। হকার, হাক্সলি, ওয়ালেস এখন নিজ জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তাঁরাও আসেননি অনেকদিন। বহুদিন এখানে কোন আলোচনা হয়নি, হয়ত আর হবেও না। তিনি নিজেই আজ আপন ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে সংকোচিত, প্রত্যাহত। জীবনের অনিবার্য অবক্ষয় থেকে কারও মুক্তি নেই।

পিয়ানোয় একটি মধুর সুর বেজে ওঠে। স্ত্রী বাজাচ্ছেন, বিটোফন। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন না। সংগীতে কান নেই। অথচ একদা ছাত্রজীবনে গান শিখেছিলেন। নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানে গিয়েছেন। তাছাড়া ছবিও ভালবাসতেন, যেতেন আর্ট-গ্যালারিতে। তারপর বিজ্ঞানে যতো বেশি নিমগ্ন হয়েছেন ততই ভুলেছেন গানের সুর, ছবির রং। আজ আর কিছুই মনে নেই। শিল্পানুরাগের এ-মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করেন। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের কোন বিরোধ নেই। তাঁর বিশ্বাস এ নিজের দুর্বলতা, অপূর্ণতা।

এবার পিয়ানোর যে-সুর বাজছে তা সঠিক বুঝতে পারেন। স্যুলিভানের রচনা : 'তুমি এলে প্রিয়'। তাঁর প্রিয়তম সংগীত। গান থামলে উঠলেন তিনি। এবার তাকে ঘুমোতে হবে। আগামী দিনের কাজের জন্য এ তাঁর জরুরি প্রস্তুতি। শেষ মুহূর্তে আবার মনে পড়ল সেই চিঠির কথা। আত্মজীবনী লিখবেন? আমি চার্লস ডারউইন, রবার্ট ওয়ারিং ডারউইনের পুত্র, এরেসমাস ডারউইন, রবার্ট ওয়ারিং ডারউইনের পুত্র, এরেসমাস ডারউইনের পৌত্র...এবং অবশেষে আত্মজীবনী লিখেছিলেন : 'রিকালেকসন অব দ্য ডেভেলাপমেন্ট অব মাইন্ড অ্যান্ড কারেক্টার, অর্থাৎ ডারউইনের বিবর্তন।

দুই

'আমার জন্ম শ্রুসবারি, ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। মা মারা যান ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে। আমার বয়স তখন আট বছরের একটু বেশি। তাঁর শেষশয্যা, কালো ভেলবেট গাউন ও অদ্ভুত আকারের টেবিলটি ছাড়া মা সম্পর্কে আর কিছুই আমি মনে করতে পারি না। বসন্তেই আমি শ্রুসবারির কেসের ডে-স্কুলে ভর্তি হলাম। সবাই বলতেন আমার বোনের চেয়ে পড়াশোনায় আমি খারাপ। মনে হয়, আমি হয়ত দুই বখাটে ছিলাম। এই বয়সেই প্রকৃতিবিদ্যা এবং সংগ্রহে আমার নেশা ধরেছিল। গাছের নাম জানা ছাড়াও সবরকমের খোলস, মুদ্রা ও আকরিক সংগ্রহে আমার ক্লাস্তি ছিল না। আমার কোন ভাইবোনের এমন নেশা ছিল না। ...পাখির ডিম সংগ্রহে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল, কিন্তু কখনই বাসা থেকে একটির বেশি ডিম নিতাম না। আমার মাছ-

ধারারও নেশা ছিল। আমি নদী অথবা পুকুরে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। ১৮১৮ সালের গ্রীষ্মে ড. বাটলারের স্কুলে ভর্তি হই। এখানেই সাত বছর পড়াশোনা করেছি। আমি হোস্টেলে থাকতাম। কিন্তু একটু সময় পেলেই ছুটে আসতাম বাড়িতে। পথচলার সময় আমি হঠাৎ অন্যতর ভাবনায় কখনও ডুবে যেতাম। ...এ স্কুলের প্রভাব আমার জীবনে সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছিল। প্রাচীন ভূগোল ও ইতিহাসের খণ্ডখণ্ড ছাড়া আর কিছুই পড়ান হত না। আমি অলস ছিলাম না। কিন্তু হোরেসের কয়েকটি গাঁথা ছাড়া এখানে আর কোন পাঠ্যবস্তুই আমাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি।

'স্কুলের পাঠ শেষ হলে সকলেই নিশ্চিত হলেন যে আমার মেধা সাধারণের চেয়ে নিম্নমানের। বাবা আমার মনে গভীর আঘাত দিয়ে বলেন, 'সারাদিন শিকার, কুকুর, ইঁদুর-ধরা ছাড়া আর কিছুতেই তোমার মন নেই, তুমি নিজের কাছে, পরিবারের কাছে শেষাবধি লজ্জার কারণ হবে।' বাবা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং তাঁর স্মৃতি আমার মনে ভালবাসার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি আমার প্রতি তখন যে রুঢ় অভিযোগ করেছিলেন তার কারণ সম্ভবত তিনি হঠাৎ খুব বেশি রেগে গিয়েছিলেন।

'শৈশবস্মৃতি থেকে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেটুকু ইংগিত আমি আজ সংগ্রহ করতে পারি, তা হল বিচিত্র বিষয়ে আমার প্রবল আকর্ষণ, পছন্দসই বিষয়ের প্রতি অটুট নিষ্ঠা এবং দুর্বোধের মর্মোদ্ধারে গভীর আনন্দ। ...স্কুল জীবনের শুরুতেই আমি 'ওয়াডার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' পড়ি এবং এ থেকেই আমার মনে বিশ্বভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে। ১৮১৯ সালে আমি প্রথমে ওয়েল্‌সের সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যাই। সেখানে সিঁদুর-লাল পোকা, নানা জাতের মথ দেখে গভীর কৌতূহল অনুভব করি। এসময়ে পাখির প্রতিও আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হই এবং কেন প্রত্যেকেই পক্ষিবিষারদ হয় না এ নিয়ে আমার ভাবনার শেষ ছিল না।

'স্কুলে আমার অবস্থা অনুকূল না দেখে বাবা আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ১৮২৫ সালে গেলাম এডিনবরা। অগ্রজের সঙ্গে আমারও পাঠ শুরু চিকিৎসাবিদ্যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি নিশ্চিত হলাম যে আমার পৈতৃক সম্পত্তি যেহেতু সারাজীবন আরাম-আয়েসে কাটানোর জন্য যথেষ্ট, তাই কষ্ট করে ডাক্তারি শেখার প্রয়োজন কি! তাছাড়া এখানকার শিক্ষা ছিল বক্তৃতা-সর্বস্ব এবং একমাত্র হোপের রসায়ন ছাড়া আর সবই নিরস, বিকসী। ...হাসপাতালে দুটি অস্ত্রোপচার দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। একটি শিশুর অস্ত্রোপচার দেখে আমি ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। জীবনের দীর্ঘদিন ঘটনাটি ভুলতে পারি নি।

'এসময় আমি ড. গ্রান্টের সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর ব্যবহার ছিল নিরাবেগ ও আনুষ্ঠানিক। কিন্তু সবই বাহ্য। ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন উচ্ছ্বাসপ্রবণ। একদিন আমরা যখন হাঁটছি, হঠাৎ তিনি ল্যামার্ক ও তাঁর বিবর্তন-তত্ত্বের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আমি নীরবে তাঁর কথা শুনছিলাম, কিন্তু নিজে বিন্দুমাত্রও আলোড়িত হই নি।

ইতিপূর্বে পিতামহ লিখিত ‘জুনমিয়া’ পড়েছিলাম এবং সেখানেও এই একই ব্যাখ্যা বিবৃত ছিল। জীবনের প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের ব্যাখ্যা শোনার জন্যই হয়তো ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ গ্রন্থে এর ভিন্নতর অভিব্যক্তি ঘটেছে।

‘এডিনবরা দু’বছর থাকার পর বোনদের কাছ থেকে সব খবর শুনে বাবা নিশ্চিত হলেন যে আমার পক্ষে ডাক্তার হওয়া অসম্ভব। তাই তিনি আমাকে যাজক হবার প্রস্তাব পাঠালেন। ...গ্রামের কোন গির্জায় যাজকের চাকুরি আমার কাছে সেই মুহূর্তে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। আজ যখন ধর্মান্ধরা প্রচণ্ডভাবে আমাকে আক্রমণ করে তখন সেদিনের যাজক হবার বাসনা বড়ই হাস্যকর মনে হয়। আমার বা পিতার এ ইচ্ছা আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিনি। কেমব্রিজ ছাড়ার পর ‘বিগল’ জাহাজে নিসর্গীর চাকুরি নেবার পরই তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল। কিছুদিন আগে এক মনস্তাত্ত্বিক দলের নিরীক্ষা আমি পড়েছি। তাঁরা আমার খুলির গড়ন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আমি নাকি দশজন যাজকের চেয়েও বেশি ধার্মিক।

‘১৮২৮ সালের শুরুতে আমি কেমব্রিজ এলাম। যাজক হবার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি জরুরি ছিল। বিদ্যালয়িক দৃষ্টিকোণের বিচারে কেমব্রিজের তিন বছরও এডিনবার্গ বা স্কুলের মতই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গণিতে আমার উন্নতি ছিল অত্যন্ত মস্তুর। গণিত সম্পর্কে অগভীর জ্ঞানের জন্য এখনও আক্ষেপ করি। বি.এ. পরীক্ষায় যারা অনার্স পায়নি তাদের মধ্যে আমার ফল ভালই হয়েছিল। সম্ভবত পঞ্চম, দশম, না দ্বাদশ স্থান পেয়েছিলাম আজ আর ঠিক মনে নেই।

‘কেমব্রিজে অনেক বক্তৃতা হত, আমি যেতাম না। এভাবেই আমি সেজউইকের ভূতাত্ত্বিক বক্তৃতা শোনার সুযোগ হারিয়েছিলাম, অন্যথা আমি বোধহয় ভূতত্ত্বেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতাম। কিন্তু হেনস্লেয়ার উদ্ভিদবিদ্যার বক্তৃতা আমার কোনদিন বাদ পড়েনি। উদ্ভিদবিদ্যা আমার পাঠ্য ছিল না। সে-সময় সংগ্রহে আমি বিশেষ সাফল্য লাভ করি। হেনস্লেয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমরা দীর্ঘ ভ্রমণে যেতাম। প্রায় সন্ধ্যায়ই তিনি আমাকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাতেন। উদ্ভিদবিদ্যা, পতঙ্গতত্ত্ব, রসায়ন, আকরিক ও ভূবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-নির্ভর সিদ্ধান্তেই তাঁর অনুরাগ ছিল। হেনস্লেয়া আমাকে ভূতত্ত্বে পাঠ নেবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। তাঁর অনুরোধেই সেজউইক উত্তর-ওয়েলস পরিক্রমায় আমাকে তাঁর সঙ্গে নেন।

‘কেমব্রিজে শেষবর্ষে আমি প্রভূত যত্ন ও উৎসাহে হ্যামবোল্ডের ‘প্যারসন্যাল নেরেটিভ’ এবং স্যার জে. হারকেলের ‘ইন্ট্রডাক্সন টু দি স্টাডি অব ন্যাচারাল ফিলসফি’ পড়ি। বই দুটি আমাকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি যতটুকু আকৃষ্ট করেছিল, এক ডজন অন্য কোন বইয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। হ্যামবোল্ড থেকে আমি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ লিখে রেখে সবাইকে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাতাম।

‘সেজউইকের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমা শেষে বাড়ি ফিরে দেখি হেনস্লেয়া এক চিঠিতে আমাকে ‘বিগল’ জাহাজে ভ্রমণে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ প্রস্তাবে আমার আগ্রহের অবধি ছিল না। কিন্তু বাবার মত হল না। শেষে আমার মামার চেষ্টায় তিনি সম্মতি দিলেন। আমাদের জাহাজ ছাড়ল ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর। বিগল ভ্রমণই আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা এবং আমার জীবনদিশারী। এ থেকেই আমার মানসগঠন ও প্রশিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সঙ্গে আমার নৈকট্য তখনই গভীরতর হয় এবং আমার দেখার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আমার সঙ্গে লায়েলের ‘প্রিন্সিপ্যাল অব জিওলজি’ ছিল এবং আমি গভীর আগ্রহে পড়ি। বইটি নানাদিক থেকে আমার প্রভূত উপকারে এসেছিল। আমি যেসব জায়গায় গিয়েছি তার ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষার গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া সব রকম প্রাণী সংগ্রহ, এদের বর্ণনা, সামুদ্রিক প্রজাতিসমূহের সাধারণ ব্যবচ্ছেদও আমার কর্মসূচি ছিল। ছবি আঁকার অক্ষমতা ও শারীরস্থান সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের জন্য আমার স্তত্বীকৃত পাণ্ডুলিপির প্রধান অংশ শেষাবধি অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়েছিল।

‘এখন আমার নিজের পক্ষে যতটুকু পর্যালোচনা সম্ভব তাতে মনে হয় নিরীক্ষার আনন্দ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানে নবতম তথ্যযোজনের জন্য আমি ভ্রমণকালে সম্ভাব্য কঠোরতম পরিশ্রম করেছিলাম। তাছাড়া সমাজে যোগ্য আসন লাভের বাসনাও আমার মনে যথেষ্ট দৃঢ়বদ্ধ ছিল। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে ক্যাপ্টেন ফিটস্‌রয় আমার জার্নালের অংশবিশেষ শুনে এটি ছাপার যোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বোনদের চিঠিতে জানতে পারলাম সেজউইক বাবার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে বিজ্ঞানী হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠা আসন্ন। তাঁর পক্ষে আমার কার্যাবলী অবহিত হবার কোন সুযোগ থাকার কথা নয়। অবশ্য পরে জেনেছিলাম হেনস্লেয়া আমার কোন কোন চিঠি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং অনেকগুলি ছাপিয়ে তাদের বন্ধুদের মধ্যে বিলি করেছিলেন। চিঠিটি পড়ে আমি পাহাড়ের চূড়ায় ওঠি এবং একটি আগ্নেয়শিলাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে প্রতিধ্বনির আলোড়ন তুলি। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে আমি কতটা উচ্চাভিলাষী ছিলাম।

‘১৮৩৬ সালের ২ অক্টোবর আমি ইংল্যান্ডে ফিরে আসি। হেনস্লেয়ার কাছে পাঠান আমার সংগ্রহগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করতে কয়েক মাস কেটে গেল। অতঃপর আমার ভ্রমণকাহিনী রচনায় লিপ্ত হই। আমি তখন লন্ডনের মার্গবো স্ট্রিটে থাকতাম এবং বিয়ের আগে অবধি দু’বছর ওখানেই ছিলাম। দু’বছরে আমি ভ্রমণকাহিনী রচনা শেষ করি, ভূতাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশনে কয়েকটি নিবন্ধ পড়ি এবং ভ্রমণকালীন ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী রচনা সম্পূর্ণ করি। ১৮৩৭ সালের জুলাই মাসে ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী গ্রন্থনা শুরু করি এবং পরবর্তী বিশ বছর অবধি তা অব্যাহত থাকে।

‘১৮৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি আমার বিয়ের পর* কিছুদিন লন্ডনে থেকে শেষে ১৮৪৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সস্ত্রীক ডাউন গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। এ সময় আমি কয়েকবার অসুস্থ হই। যখন একটু সুস্থ থাকতাম তখন ‘প্রবাল প্রাচীর’ গ্রন্থটি শেষ করার চেষ্টা করতাম।

‘১৮৪৪ সালের শুরুতে ‘আগ্নেয় দ্বীপ’ এবং ১৮৪৫ সালে ‘জার্নাল অব রিসার্চেস’, ১৮৪৬ সালে ‘দক্ষিণ আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা’ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬ সালের অক্টোবর থেকে আমি ‘সিরিপিডা’ সম্পর্কিত মনোগ্রন্থ রচনা শুরু করি এবং দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত কাজটি অব্যাহত থাকে। আমার প্রিয় পিতার মৃত্যু হয় ১৮৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর। আমি তখন অসুস্থ। তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

‘১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে প্রজাতির রূপান্তর বিষয়ে গ্রন্থ-রচনার জন্য আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করি। এ সম্পর্কে আমি ১৮৩৭ সালের জুলাই মাসে নোট নিতে শুরু করেছিলাম। ১৮৪২ সালের জুন মাসে আমার তত্ত্বের একটি রূপরেখা রচনা সম্পূর্ণ হয়, পরিসর ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মে রচনার আয়তন দুশো ত্রিশ পৃষ্ঠায় পৌঁছয়। ১৮৫৬ সালে লায়েল আমার তত্ত্ব সম্পর্কে দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার তাগিদ দেন। আমার ইচ্ছা ছিল গ্রন্থটি হবে বর্তমান ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’-এর অন্তত চার-পাঁচগুণ। আমি যখন এ কাজে মগ্ন তখনই এল ওয়ালেসের নিবন্ধ (১৮৫৮)। অগত্যা সংক্ষিপ্ত আকারে ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ প্রকাশিত হল ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে। সন্দেহ নেই, এটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। স্পেনিস, বুহোমিয়ান, পোলিশ, রুশসহ সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় এবং জাপানিতেও গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

‘অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় : ফার্টিলাইজেশন অব অর্কিডস (১৮৬২), ভেরিয়েশনস অব অ্যানিমেলস্ অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডমেস্টিকেশন (১৮৬৮), ডিসেন্ট অব ম্যান (১৮৭১), এক্সপ্রেশনস অব এমোশনস্ ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমেলস্ (১৮৭২), ক্লাইমিং প্ল্যান্টস্ (১৮৭২) ইনসেক্টিভরাস্ প্ল্যান্টস্ (১৮৭৫), ইফেক্টস্ অব ক্রস অ্যান্ড সেক্স ফার্টিলাইজেশন ইন দ্যা ভেজিটেবল কিংডম (১৮৭৬), ডিফারেন্ট ফর্মস অব ফ্লাওয়ারস্ অব দ্য সেইম প্ল্যান্ট (১৮৭৭), ফরমেশন অব ভেজিটেবল মোল্ড থ্রু অ্যাকশন অব আর্থওয়ার্ম (১৮৮১)।

* বিবাহিত জীবনের সাংসারিক ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিজ্ঞান সাধনায় বাধা সৃষ্টি করে সেজন্য বিবাহে মনস্তির করা সহজ হয়নি। তিনি বিয়ের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেন। শেষে ‘নপুংসক মৌমাছি’র কর্মসর্বস্ব অর্থহীন জীবনের মোহ ত্যাগ করে বিয়ে করেন মাতুলকন্যা এমা উয়েজউডকে।—লেখক।

আমার প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের কথাই উল্লিখিত হল। এগুলিই আমার সাফল্যের স্তম্ভস্বরূপ। জ্ঞাতসারে আমার মনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। আমার পিতা তিরিশি বছর বেঁচেছিলেন এবং তাঁর মন সজীব ও কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। আমার ইচ্ছা কোন মানসিক বৈকল্যে অথর্ব হবার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।’

তিন

ডারউইন ‘আত্মজীবনী’ প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর অনেক বছর পরে পুত্র ফ্রান্সিস ডারউইনের সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীর পর ডারউইন আর উল্লেখ্য কিছু রচনা করেননি। এ সময় তাঁর শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কিন্তু তা ছিল গোপুলি আলোর শেষ উজ্বাস। তিনি জানতেন জীবন সায়াহ্নের যবনিকাপাত আসন্ন, তবু নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেননি। বিশাল ও জটিল একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেন। একদা গৃহপালনে জীবদেহের পরিবর্তন সংক্রান্ত যে-গ্রন্থ লিখেছিলেন তারই পরিপূরক : ‘ভ্যারিয়েশন অব প্ল্যান্টস্ অ্যান্ড অ্যানিমেলস্ ইন ন্যাচার’। কিন্তু শেষাবধি তা পরিত্যাগ করলেন। বুঝলেন এজন্য প্রয়োজনীয় শ্রম বিনিয়োগে তিনি অসমর্থ। এই শেষ পশ্চাদপসরণ।

অগ্রজ এরেস্মাস মারা গেলেন ১৮৮১ সালের ২৬ আগস্ট। এ মৃত্যু তাঁর উপর গভীর ছাপ ফেলল। এরেস্মাস ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়, সুহৃদ। বন্ধুকে লিখলেন, এরেস্মাসশূন্য লন্ডন তাঁর কাছে অদ্ভুত অজানা জায়গা।

এ বছর লেক-ডিস্ট্রিক্টে বেড়াতে গেলেন। উলস্ওয়াটার তাঁর প্রিয় স্থান। কাঁচস্বচ্ছ প্রসারিত জলরাশি, অনুচ্চ পাহাড়ের ঢেউ, শ্যামল বনানী, উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মর্মর বারবার ক্লাস্তি থেকে, অবসন্নতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে, প্রাণশক্তি আহরণ করে বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু এবার আর ভাল লাগল না। মনে হল প্রকৃতির উচ্ছ্রিত ঐশ্বর্য ভোগের পক্ষে তিনি বড়ই দুর্বল। প্রায়ই ক্লাস্তিতে ভেঙ্গে পড়েন। গোপুলির আলো এখন ম্লানতর। অস্তগামী সূর্যের আভা কেবল তরুশীর্ষে, নীচে অন্ধকার এবং ক্রমশ বর্ধমান। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন : জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে কী করব?

বাড়ি ফিরে উদ্ভিদদেহে ব্রণ তৈরির পরীক্ষা শুরু করলেন। নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গাছপালায় ইনজেকশন দেন। তাঁর ধারণা, এই ধরনের কৃত্রিম ব্রণের প্রভাব বীজমাধ্যমে বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হতে পারে। শেষে শরতে কাজটি ছেড়ে দিলেন। শরীর তখন অত্যন্ত অসুস্থ। সম্ভবত এসময়ই কার্ল মার্কস ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণটি ডারউইনকে উৎসর্গ করার অনুমতি চান। মার্কস বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ডারউইন রাজি হননি। জড়াতে চাননি নিজেকে নতুন কোন বিতর্কে।

শীতে মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এলেন লন্ডনে। একদিন গেলেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বাড়ি ছিলেন না। তখনই মৃদু স্ট্রোক হল। পরিচারক তাঁকে বসতে বলল। তিনি শুনলেন না। পথে এলেন। এমনটি আরো কয়েকবারই হয়েছে। নিজেই গাড়ি খোঁজার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ যেন সব অন্ধকার হয়ে এল। পড়তে পড়তে পথপাশের রেলিং আঁকড়ে ধরলেন। ছুটে এল সেই পরিচারক। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। কিন্তু একটু পরেই সুস্থ বোধ করলেন।

একমাস কেটে গেল কোনক্রমে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে একেবারে শয্যাশায়ী হলেন। হার্টের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে, অস্থিরতা বাড়ছে। দিনক'য় একটু ভাল ছিলেন। বেড়াতে গেলেন স্যাণ্ডওয়াকে। বসন্তের আভাসে তরুণী মুকুলিত। বিকেলের আলো জ্বলছে তরুণীর্ষে। হঠাৎ আবার স্ট্রোক। বাড়ি ফিরলেন অতিকষ্টে। এই তাঁর শেষ ভ্রমণ। মার্চের শেষে একটু উন্নতি হল। এপ্রিলের মধ্যভাগ অবধি ভাল থাকলেন। হাঙ্গলিকে তাঁর অবস্থা জনালেন। সেদিন পনেরো এপ্রিল, শনিবার। বিকেলে খাবার টেবিলে বসেছেন। হঠাৎ মাথা ঘুরতে শুরু করল। মূর্ছা গেলেন শেষে। পরে জ্ঞান হল। দুদিন একটু ভাল থাকলেন। আঠারো এপ্রিল মধ্যরাতে আবার আক্রমণ ও মূর্ছা। স্টাডিতে রাখা ওষুধের কৌটোটি স্ত্রী অজস্র শিশিবোতলের ভিড়ে খুঁজে পেলেন না। শেষে অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরল। ডাক্তারের ব্যবস্থামতো সামান্য ব্রান্ডি খেলেন। মনে হল মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ শুনতে পাচ্ছেন। সকলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ‘মরণে আমার কোন ভয় নেই।’

শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন ১৯ এপ্রিল। তখন বিকেল চারটা। ডাউন উজ্জ্বল রোদ, পাইনবনে বসন্তের সমারোহ, প্রকৃতি কল্লোলিত।

তাঁকে সমাহিত করা হল রাজকীয় সম্মানে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাভিতে, নিউটন ও লায়লের পাশে। শবাধার বহন করলেন ডাল্টন হুকার, রাসেল ওয়ালেস, টমাস হাঙ্গলি এবং রয়েল সোসাইটির সভাপতি স্পটিগউড প্রমুখ বন্ধু ও সুধীবৃন্দ। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞানের এক যুগের সমাপ্তি সূচিত হল। সেই যুগ ছিল বিপ্লবের, আলোড়নের, নব নব আবিষ্কারের অভিঘাতে পুরনো জীর্ণ মূল্যবোধ অপসারণের। ডারউইন ছিলেন সেই যুগের শেষ অধিনায়ক।

বিবর্তন তত্ত্বের দর্শন

শহিদুল ইসলাম*

সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা বা বিজ্ঞানের দর্শন এক নয়।^১ সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন : “Scientific results are entirely independent from religious or moral consideration.”^২ পাকিস্তানের আব্দুস সালাম, একমাত্র মুসলিম বিজ্ঞানী যিনি ১৯৭৯ সালে নাস্তিক স্টিভেন ওয়াইনবার্গের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : “it made no basic difference to our work whether I was an avowed believer and Weinberg an avowed atheist.” ১৩২৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

‘যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান, যে সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংল্যান্ডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারে না, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশ ভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা যুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।’^৩

কিন্তু বিজ্ঞানের উল্লসফন যেমন সমাজের মূল ধরে টান দেয়, তেমনি তা মানুষের মনের ওপর নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। টি.এস.কুনের ভাষায় এক একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার এক একটা প্যারাডাইমের জন্ম দেয় যা গ্রহণ করতে পুরানো জগতের মানুষের বড় কষ্ট হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সভ্যতা একদিন ‘স্বাভাবিক বিজ্ঞানে’ (Normal Science) পরিণত হয়। মানুষ ক্রমশ নবাবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে স্বীকার করে নেয়। তখন নতুন যুগের নতুন মানুষ তাকেই ‘স্বাভাবিক’ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তেমনি একটি আবিষ্কারের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক হওয়া সত্ত্বেও কপারনিকাস ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৪৩) সূর্যকেন্দ্রিক

* শহিদুল ইসলাম : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সমাজ-সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক ও ইহজাগতিক-বোধে উদ্দীপ্ত লেখক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলাম-প্রবন্ধ লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিজ্ঞানের দর্শন* (দুই খণ্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা), *দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা), *জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি* (শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা)।

সৌরজগতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সর্বমহলে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সে ইতিহাস আজ সবাই জানে। প্রায় চারশ বছর কপারনিকাসের সে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ধর্ম প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কপারনিকাসের সে সত্যের সামনে ‘ধর্মীয় সত্য’ দাঁড়াতে পারেনি। পরাজয় বরণ করে। আজ আর কেউ পৃথিবীর ‘সূর্য প্রদক্ষিণ’ নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে করে। কিন্তু এই ‘স্বাভাবিকতা’ অর্জনে বহু মানুষকে জীবন দিতে হয়েছিল। কাজেই এ সত্য অস্বীকার করা যায় না বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা আলাদা হলেও বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিজ্ঞানমনস্কতার সীমা নির্ধারণ করে দেয়। আজ আমাদের মন কপারনিকাসের সৌরজগতের ছবিটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। বিজ্ঞানমনস্কতা আজ এ ক্ষেত্রে আর কপারনিকাসপূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

প্রশ্ন ওঠে কেন মানুষ পুরানো বিশ্বাস, যত ভুলই প্রমাণ হোক না কেন, সহজে মেনে নিতে পারে না? মেনে নেয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানাটা বড় জরুরি। পুরানো চিন্তার পিছনে এমন শক্ত এক বিশ্বাসের ভিত কাজ করে যে তা না-মানার অর্থ সেই শক্ত ভিতকে অস্বীকার করার শামিল মনে হয়। মানুষের পুরানো বিশ্বাসের সে ভিত নড়ে গেলে, মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং পুরাতন বিশ্বাসের প্রতি, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ হলেও মানুষ তারপক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়। নতুন আবিষ্কার বা সত্যের বিরুদ্ধে অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিমরোলার নেমে আসে। বারবার ইতিহাসে তা প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ কপারনিকাসের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু সেই সাথে আর একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তা হল কে বা কারা সেই ‘পচা-পুরানো সত্য’কে মিথ্যা প্রমাণিত হবার পরও সমাজে সত্য বলে জারি রাখতে চায়? দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রতিষ্ঠানিক ধর্মই হচ্ছে সেই শক্তি, যা একটা মিথ্যাকে সত্য বলে জারি রাখতে চায়। ধর্মের নিজের তো কোনো হাত-পা-নাক-মুখ-কান নাই—মানুষই ধর্মের সমর্থক ও ধারক-বাহক, তাই ধর্মের নামে সেইসব ধর্মবেত্তা মানুষই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গোষ্ঠী-প্রধান সমাজে যখন ‘এনিমিজম’ বা সর্বপ্রাণবাদ ধর্ম প্রচলিত ছিল, সে সময় দেখা গেছে যখন যে গোত্র বিজয়ী হয়, তখন সে গোত্র পরাজিত গোত্রের ‘দেবতা’কেও হত্যা করে এবং নিজ ধর্মের দেবতাকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। সর্বশেষ ধর্ম ইসলামেও দেখা যায় বিজয়ী হবার পর কাবার ৩৬০ গোত্রের ৩৬০টি দেবতার মূর্তিকে ধ্বংস করে এক আল্লাহর শাসন কায়ম করা হয়। মহাজ্ঞানী-মহাপণ্ডিত এরিস্টটল ও টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদ দ্বারা সমর্থিত ও শক্ত ধর্মগ্রন্থীয় পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগতের পক্ষে সকল ধর্মের শক্ত অবস্থান। ‘পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সকল গ্রহ ঘুরছে’—এ মিথ্যাকে হাজার বছরেরও বেশি সময় কঠোরভাবে মানুষের মনের ওপর চাপিয়ে রেখেছিল। তাদের ভয় ছিল পৃথিবীর এই ‘মধ্যমণির’ অবস্থান টলে গেলে তাদের অর্থাৎ ধর্মবেত্তা ও তার সহযোগী শাসক শ্রেণীর ওপর থেকে জনসমর্থন উঠে যাবে। তাই কপারনিকাসের সত্য কথা তারা বিশ্বাস করেনি। অত্যাচার-নির্যাতন-হত্যার মাধ্যমে একটা মিথ্যাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা

করেছে। সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে মানুষকে প্রায় ৪০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে ধর্মবিশ্বাস সমাজের শাসকশ্রেণীর জন্য এক অতি জরুরি অস্ত্র।

কেন? কেন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে নিতে ধর্মবিশ্বাসীদের এত আতঙ্ক। প্রায় প্রতিটি ধর্মে মানুষই হচ্ছে ‘সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব’। মানুষের সুখভোগের জন্যই সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্রে রাখতেই হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীকেও। কারণ পৃথিবীই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবাসস্থল। কপারনিকাস ষোড়শ শতাব্দীতে সেই বিশ্বাসের ওপর খড়গ আঘাত করেছিলেন। পোপ বা চার্চ শত অত্যাচার করেও পৃথিবীর ‘মধ্যমণি’ অবস্থা ধরে রাখতে পারেনি। আজ চার্চ তার সে পুরানো অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। মেনে নিয়েছে যে পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রে নয়।

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে ধর্মবিশ্বাসীরা আবার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। একে মেনে নিলে ধর্মের আর কি অবশিষ্ট রইল? ঈশ্বরের নিষেধ অমান্য করে আদি-মানব স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ঠিক আজকের মানুষের মত চেহারা-আচার-আচরণ-সংস্কৃতিসহ। কিন্তু ডারউইন এ কী বলেন! মানুষ ক্রমবিকাশের ফসল! নিম্নতর প্রাণ থেকে ক্রমবিকাশের মহাসড়ক ধরে এক সময় মানুষ হয়ে ওঠে! এটা মানা সম্ভব নয়। তাহলে ধর্ম থাকে না। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব ‘আশরাফুল মাখলুকাৎ’ নিম্নতর কোন প্রাণীর ক্রমবিকাশের ফসল হতে পারে না। ধর্ম মানুষের মনের ওপর এই ধারণা চাপিয়ে রেখেছে। বিজ্ঞান, যা সত্যের সন্ধান আজকের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, তা মিথ্যে প্রমাণ করেছে। কপারনিকাসের আবিষ্কৃত ‘সত্য’ মানুষের মনে স্থান করে নিতে ৪০০ বছর সময় নিয়েছে। ডারউইনের এই সত্যের বয়স মাত্র ১৫০ বছর। এই ১৫০ বছরের বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব জয়যাত্রা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের বিশ্বছবিকে সরিয়ে আইনস্টাইনের বিশ্বছবি স্থান করে নিয়েছে। ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ প্রকাশের ঠিক একশ বছরের মাথায় মানুষ মহাকাশ বিজয়ে প্রথম স্পুটনিক ছোঁড়ে। মাত্র দশ বছরের মধ্যে মানুষ চাঁদের বুকে পা রাখে। মানুষ আজ সৌরজগতে স্থায়ী বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে। চাঁদে বসবাসের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞানও বসে নাই। ২০০০ সালে যে নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে, সে শতাব্দী প্রাণীবিদ্যার। ডারউইনের তত্ত্ব আজ আর চিন্তা-ভাবনার স্তরে নাই। জিন স্তরে মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশ মানুষ গবেষণাগারে ‘শুক্লাণু’ তৈরি করতে চলেছে। নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনই যে কেবল শিশুর জন্ম দেয়, এ বিশ্বাস এক পুরানো ঐতিহ্যিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন ছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে আজ হাজার হাজার মানুষ জন্ম নিয়ে আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ আর নারীকে ‘বাজা’ বলে স্বামী-পরিত্যক্তা হবার ভয় নাই। সন্তান জন্মদানে অক্ষম পুরুষেরও আজ আর সে অপবাদ

মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবার দিন শেষ হয়েছে। শুক্রাণু আবিষ্কার হলে বিজ্ঞান ‘মানুষ’ সৃষ্টির পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। প্রমাণ হবে মানুষের সৃষ্টির পিছনে সত্যিই কোন অতিপ্রকৃত ঈশ্বরের হাত নাই। মানুষ সত্যি ক্রমবিকাশের ফসল। এসবই সম্ভব করে তুলেছে ডারউইনের ‘ক্রমবিকাশ তত্ত্ব’। গায়ের জোরে এ সত্য আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মের কিছু মানুষ আজও ডারউইনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন। যেমনটি দাঁড়িয়ে ছিল কপারনিকাসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে। তারা হেরে গেছে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বও একদিন Normal বিজ্ঞানে পরিণত হবে। হবার পথে তা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যারা খুবই গোঁড়া কেবল তারাই ডারউইনের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। এদেরও পরাজয় অবধারিত। ডারউইনের জয় অবশ্যম্ভাবী। অনেক কিছু ছাড় দিতে দিতে ধর্ম আজ প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। আজকের পৃথিবীতে ধর্মের যে হুঙ্কার শোনা যায়, তা মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের শেষ চিৎকারের মত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ভূমিকা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে। ঈশ্বর ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সামনে। মানুষের মধ্যে পারলৌকিক কোনো বিশ্বাস থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ইহজাগতিক কোন সমস্যা সমাধানে তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে বলে মনে হয় না।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস আরো প্রমাণ করেছে যে একটি দর্শন বা বিজ্ঞানকে সরিয়ে একটি নতুন দর্শন ও বিজ্ঞান তার জায়গা করে নিয়েছে। পুরানো দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হলেও মানুষের জ্ঞানানুসন্ধানে তার ভূমিকাকে ছোট করে দেখার কোন কারণ নাই। হাজার হাজার বছরে মানুষের জ্ঞানের যে ভাঙার গড়ে উঠেছে, সেগুলি সেখানে জমা পড়ে। অতি সরলীকরণ হলেও বলা যায় যে একটি নতুন দর্শন বা বিজ্ঞানের জন্মের মধ্য দিয়ে একটি পুরনো দর্শন বা বিজ্ঞানের মৃত্যু হয়। যেমন মহাজ্ঞানী এরিস্টটলের দর্শন ও বিজ্ঞানের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম।^৪ কিন্তু নিউটনের বিজ্ঞানের মৃত্যু হয়নি। তার সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে আইনস্টাইনের বিজ্ঞানে। কিন্তু কপারনিকাসের আবিষ্কার একটি ধর্মগ্রন্থীয় ‘সত্য’-কে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তাই দেখা যায়, অতীতের কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা কিংবা নতুন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানে প্রাণচাঞ্চল্য আসে। এরিস্টটলকে মিথ্যা প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের শেষ নাগাদ যেমন বিজ্ঞানে নবজোয়ার এসেছিল, তেমনি ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে জীববিজ্ঞানে প্রাণচাঞ্চল্য চোখে পড়ে। কপারনিকাসের আবিষ্কার যেমন ধর্মগ্রন্থের একটি সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করেছে তেমনি ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বও ধর্মগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করেছে। একটি ধর্মীয়-দর্শনের জায়গা দখল করেছে একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রধান কৃতিত্ব হল পরিবর্তন বা আপেক্ষিকতার প্রতি মানুষের আস্থা স্থাপন। পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে সবকিছু যেমন ছিল তেমনি আছে, আজ আর

একথা কেউ বিশ্বাস করে না। পরিবর্তনের সে দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ডারউইন। আইনস্টাইনের হাতে তা পূর্ণতা পায়। সেই পথে প্রমাণ হয়েছে সবকিছুর সঙ্গে নিউটনও আপেক্ষিক সত্য; আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সও আপেক্ষিক। আপেক্ষিক ডারউইনও। বিবর্তন তত্ত্ব মানুষকে আজ ‘মানুষ’ সৃষ্টির দ্বার প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়। কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের ‘মুরারি’ পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু শহীদুল্লাহর ‘ভবিষ্যতের মানুষ’ স্কুল-পাঠ্যসূচী থেকে তিরোহিত হওয়া কম বড় স্বীকৃতি নয়। ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের সাথে সাথে শহীদুল্লাহর ‘ভবিষ্যতের মানুষ’ অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। শহীদুল্লাহর মাথা-সর্বশ্ব-মানুষ একদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দখল করবে।

তথ্য :

১. শহীদুল ইসলাম, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা*, ২৮.৬.২০০৯ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশে পঠিত। এবং মুক্তমনা ওয়েব সাইট (www.mukto-mona.com)-এ প্রকাশিত।
২. Albert Einstein, *Religion and Science: Irreconcilable? Ideas and Opinions*, Rupa Co. 20th Impression, 2005, p. 52.
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কলাবিদ্যা*, রবীন্দ্রচিনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃষ্ঠা ৮৭১।
৪. Herbert Batterfield, *The Origins of Modern Science: 1300-1800*, The Free Press, New York, 5th Printing 1966, p. 67-88.

সুদূর অতীতে গেলে আমরা একই পূর্বপুরুষ দেখবো

আসিফ*

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দক্ষ তार्কিক এবং বিবর্তন তত্ত্ব জনপ্রিয়করণের হোতা টমাস হার্বলি লিখেছিলেন : “ডারউইন ও ওয়ালেসের গবেষণা গ্রন্থ হলো—একটি আলোর ঝলক, সেইসব মানুষের কাছে যারা রাত্রির অন্ধকারে পথ হারিয়েছে, হঠাৎ করেই তাদের কাছে প্রকাশ করে একটি পথের দিশা যে পথটি তাঁকে নিয়ে যেতে পারে সরাসরি তার বাড়িতে অথবা নাও নিতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবে তার পথে যাবে...। অরিজিন অব স্পিসিজের মূল বক্তব্য আত্মস্থ করার পর প্রথমে আমার মনে হলো কত বড় বোকা হওয়ায় এ কথাটা আগে ভাবিনি! আমার মনে হয় কলম্বাসের সঙ্গীরাও প্রায় একই কথা বলেছিলেন...। জীবের পরিবর্তনশীলতা, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, শর্তাধীনে অভিযোজন এসবই ছিল যথেষ্ট কুখ্যাত; কিন্তু ডারউইন বা ওয়ালেসের এই অন্ধকার দূর করার আগে পর্যন্ত আমাদের কেউই অনুমান করেনি যে প্রজাতির বৈচিত্র্যময়তার সমস্যাটির কেন্দ্রের পথটি সেগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছে।”

বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন এই উভয় ধারণা সম্বন্ধে অনেক লোক তেমন কিছুই জানে না, তার উপর অনেকে কুৎসা বা অপপ্রচারে ব্যস্ত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীতে জীবনের সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল, প্রাণ গঠনের কার্যক্রমের নৈপুণ্য দেখে অবাক হয়েছিল এবং একজন মহান কারিগর অস্তিত্ব অনুভব করেছিল। সূক্ষ্মতম একটি পকেট ঘড়ি থেকেও সবচেয়ে সরল এককোষী প্রাণী অনেক বেশি জটিল। কিন্তু তবুও ধরি ‘গ্র্যান্ডফাদার ক্লক’ হতে কতগুলো পর্যায়ের মধ্যদিয়ে এই পকেট ঘড়ির উদ্ভব ঘটতে পারে না অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই একত্রিত হয়ে তৈরি হতে পারে না। একটি ঘড়ি ইঙ্গিত করে ঘড়ি প্রস্তুতকারকের। এমন কোনো দিকই গোচরিভূত হয়নি যার ভিতর পরমাণু ও অণুসমূহ কোনো উপায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হয়ে এমন আশ্চর্য জটিল ও সূক্ষ্ম কার্যকর মাহাত্ম্য নিয়ে প্রাণ গঠিত হতে পারে পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে। ‘প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী এমন বিশেষভাবে নক্সা করা, যে একটি প্রজাতি অন্যটিতে রূপান্তরিত হয় না’—এই ধারণাটি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধারণাটি এমন যে, মহান কারিগর (Great Designer) কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণী অতি সতর্কভাবে গঠিত হয়েছিল এমন এক তাৎপর্য ও প্রকৃতির প্রতি শৃঙ্খলা এবং

মানুষের প্রতি গুরুত্ব সরবরাহ করে যা আমরা এখনও কামনা করি। একজন কারিগরের ধর্মবাদীদের জীর্ণ ব্যাখ্যা, যা অপ্রাকৃত ও অলৌকিকতায়পূর্ণ। কিন্তু যেমন ডারউইন ও ওয়ালেস দেখিয়েছিলেন, আরেকটি উপায় আছে, যা সমানভাবে আবেদনপূর্ণ, সমানভাবে বিজ্ঞানসম্মত, এবং অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য : প্রাকৃতিক নির্বাচন, যা যুগে যুগে জীবনগীতি আরও বাঙময় করে তোলে।

হতে পারে জীবশা সাক্ষ্য মহান কারিগর বা স্রষ্টার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; সম্ভবত কিছু প্রজাতিকে ধ্বংস করে মহান কারিগর যাদের উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং উন্নততর নক্সার উপর ভিত্তিতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এই চিন্তাধারা হতাশাব্যঞ্জক। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সূক্ষ্মভাবে বা নিখুঁত চমৎকারিত্ব পূর্ণভাবে তৈরি; প্রারম্ভ হতে কারিগরের সামর্থ্য থাকা কি উচিত নয় যে চরম উপযুক্ত অতীর্ণিত প্রজাতি তৈরি করা? ফসিল চিহ্ন ইঙ্গিত দেয় শুদ্ধাশুদ্ধ প্রক্রিয়ার, ভবিষ্যতকে উপলব্ধি করার অক্ষমতা, একজন দক্ষ মহান স্রষ্টার ধারণার সাথে এই ঘটনাগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ (যদিও অধিক দূরবর্তী এবং পরোক্ষ অস্থির প্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ একজন কারিগরের সাথে নয়)।

বিবর্তনের মূলমন্ত্র মৃত্যু ও সময়; অসংখ্য প্রাণরূপের সেই মৃত্যু যারা পরিবেশের সাথে অসম্পূর্ণরূপে অভিযোজিত হয়েছিল; আর সেই সময় যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিব্যক্তির (মিউটেশন) দীর্ঘ পর্যায়ক্রমের জন্য ব্যয়িত হয়েছে যেগুলো ঘটনাক্রমে অভিযোজিত হয়েছিল, যা উপযুক্ত মিউটেশনের বিন্যাসগুলোর পুঞ্জিভবনের জন্যও ব্যয়িত হয়েছে। ইয়নের চেয়ে অনেক ছোট যে সহস্রাব্দ তাকে বোঝার ক্ষেত্রে আমরা যে দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন হই তার ফলে কিছু পরিমাণে ডারউইন ও ওয়ালেসের মতবাদের বিরোধিতা গড়ে ওঠে। যে জীবের আয়ুষ্কাল সাত কোটি বছরের এক নিয়ুতাংশ মাত্র তার কাছে এই সুদীর্ঘ সময়টি কিভাবে প্রতিভাত হয়? আমরা হলাম প্রজাপতির মতো, যে একটি দিনকে মহাকাল ভেবে বসে আছে।

এখানে এই পৃথিবীতে যা ঘটেছিল তা সম্ভবত অনেক জগতের বা গ্রহে প্রাণের বিবর্তনের সাধারণ ঘটনা হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি প্রোটিন রসায়ন অথবা নিউরোলজি অব ব্রেইন-এর মতো অনুপুঞ্জ ব্যাপারগুলো বিবেচনা করি তাহলে পৃথিবীর এই গল্পগুলো সমস্ত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অনন্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণা জমাট বেঁধে চারশত ষাট কোটি বছর আগে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা ফসিল রেকর্ড হতে জানি প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছিল এর পরপরই, সম্ভবত প্রায় ৪শত কোটি বছর আগে, আদিম পৃথিবীর জলাশয়ে অথবা মহাসাগরে। অবশ্য প্রথম জীবন এককোষী প্রাণের মতো এতটা জটিল অবস্থায় ছিল না—উদ্ভবের পর থেকেই এককোষী প্রাণ উচ্চস্তরের শৃঙ্খলাপূর্ণ গঠন কাঠামো অর্জন করেছিল। প্রথম স্পন্দন ছিল খুবই সরল মানের। ঐ প্রাচীন দিনগুলোতে, সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি

* আসিফ : বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান বক্তা। প্রতিষ্ঠাতা, ডিসকাশন প্রজেক্ট।

রশ্মি ও বিদ্যুৎ চমকানি আদিম আবহমণ্ডলে সরল হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ অণুগুলো ভেঙে পৃথক করেছিল, সেই টুকরো অংশগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযুক্ত বা মিলিত হয়ে আরো অধিক জটিল অণু তৈরি করলো। এই আদিম রাসায়নিক উপাদানগুলো মহাসাগরে দ্রবীভূত হয়েছিল, ক্রমশ জটিলতার দিকে অগ্রসর হওয়া এক প্রকারের জৈবসুপ তৈরি হচ্ছিল, যে পর্যন্ত না একদিন, আকস্মিকতার মাঝে, একটি অণু জৈবসুপের অন্যান্য অণুকে ‘বিল্ডিং ব্লক’ হিসেবে ব্যবহার করে নিজের প্রতিকরূপ তৈরিতে সামর্থ্য হয়েছিল স্থূলভাবে।

এটা ছিল ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড, ডিএনএ; সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বপুরুষ, পৃথিবীতে প্রাণ নিয়ন্ত্রণকারী অণু। জুর মতো প্যাচানো একটি মইয়ের আকারের এই অণুটি, মইয়ের ধাপ বা সিঁড়িগুলো ৪টি ভিন্ন আণবিক অংশের ভিতরেই পড়ে, যেগুলো গঠিত হয় জেনেটিক কোডের ৪টি অক্ষর দিয়ে। এই ধাপ বা সিঁড়িগুলো, ‘নিউক্লিটাইড’ বলে কথিত, নির্দিষ্ট প্রাণ তৈরির জন্য বংশগতির নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাণ কাঠামোর আছে ভিন্ন ভিন্ন একগুচ্ছ নির্দেশাবলী, লেখা হয় মূলগতভাবে একই ভাষায়। প্রাণীগুলো যে ভিন্ন তার কারণটি হলো তাদের নিউক্লিক এসিডের নির্দেশাবলীর পার্থক্য। পরিব্যক্তি বা মিউটেশন হলো নিউক্লিটাইডের পরিবর্তন, যা পরবর্তী প্রজন্মে বহমান, যা সত্যিকারভাবে বংশবিস্তারে অংশ নেয়। পরিব্যক্তি মানে হচ্ছে নিউক্লিটাইডের অনিয়ন্ত্রিত বা দৈবপরিবর্তন; তাই প্রায় সমস্ত পরিবর্তনের বেশির ভাগই নিরপেক্ষ[↓] (neutral), যেগুলোতে সুপ্ত এনজাইমের অস্তিত্ব কোডবদ্ধরত।

[↓] মিউটেশন বা পরিব্যক্তি নিয়ে একটি সাবেকী ধারণা হল—‘বেশিরভাগ মিউটেশন-ই ক্ষতিকর’। মিউটেশন নিয়ে আধুনিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, বেশিরভাগ মিউটেশন-ই নিরপেক্ষ (neutral)। প্রকৃতকোষী জীবে ডিএনএ থাকে ক্রোমোসোমের ভিতর, আর ক্রোমোসোম থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতর। আদিকোষী জীবে ডিএনএ নিরাবরণ থাকে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে শুধু আরএনএ। কোষ বিভাজনের সময় কোষের ভিতরকার উপাদানগুলোর রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণ হয়, ঐ সময় হুবহু প্রতিলিপিকরণ না হয়ে ‘যুগ্ম সর্পিলা’ ডিএনএ সিকোয়েন্সের কোন না কোন অংশে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো (random) পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে; তাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। যৌন-প্রজননশীল জীবের মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় জনন কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোসোমের মধ্যে যে রিকমিনেশন ঘটে তা থেকে এবং এই মিউটেশনের ফলে প্রজাতির মধ্যে প্রকারণ (Variation) তৈরি হয়; যা বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। মিউটেশন জীবের জন্য ক্ষতিকর না উপকারী, তা নির্ভর করে ঐ জীব যে পরিবেশে বাস করে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। পরিবেশ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। আজ যে পরিবেশকে বিবেচনা নিয়ে কোন মিউটেশনকে জীবের জন্য ‘উপকারী মিউটেশন’ মনে হতে পারে, কিছুদিন পরই এই পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে গেলে আগের মিউটেশনটাই প্রকৃতিতে জীবের টিকে থাকার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই মিউটেশনকে ‘সাধারণীকরণ’ করে বলা জটিল বটে। তারপরও কোন মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো (Variation) যদি জীবকে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত সুবিধা লাভে

কোনো প্রাণীর অধিকতর ভালো অবস্থার দিকে পরিবর্তন আনতে পরিব্যক্তির হয়তো দীর্ঘকাল লেগে যায়। কিন্তু তারপরেও এক সেন্টিমিটারের কোটি ভাগের একভাগ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিটাইডের ছোট্ট অথচ ভাল একটা পরিবর্তন অসম্ভাবনাময় বা বিরল কোন ঘটনা নয়, এবং এভাবেই বিবর্তন এগিয়ে চলেছে।

চারশত কোটি বছর আগে, পৃথিবী ছিল স্বর্গ-উদ্যানের অণু বাগান। তথাপি সেখানে কোনো ধ্বংসাত্মক জীবাণু ছিল না। কিছু অণু নিজেদেরকে পুনরুৎপাদন করতো অদক্ষভাবে, তারা বিল্ডিং ব্লকগুলোর জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো এবং নিজেদের স্থূল প্রতিকরূপগুলো পরিত্যক্ত হতো। পুনরুৎপাদন, পরিব্যক্তি ও স্বল্প দক্ষ প্রকারভেদের নির্বাচনমূলক বিলোপের মাধ্যমে বিবর্তন ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন কী অণু-পর্যায়েও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা পুনরুৎপাদনে ক্রমশ দক্ষ হয়ে উঠলো। ফলস্বরূপ বিশেষ এক ধরনের কাজের উপযোগী অণুগুলো গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে অণুগুচ্ছ তৈরি করলো; আর এরাই হলো প্রথম জীবকোষ। উদ্ভিদকোষের রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট নামের ক্ষুদ্র অণু কারখানা যেগুলো আছে সালোক সংশ্লেষণের দায়িত্বে; সূর্যালোক, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেড ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করা। রক্তকোষে রয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়ন নামের ভিন্ন ধরনের এক অণু কারখানা, যা খাদ্য ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে কার্য-উপযোগী শক্তি উৎপাদন করে। এই

সহায়তা করে, তাকে জীববিজ্ঞানীরা ‘উপকারী মিউটেশন’ নামে অভিহিত করে থাকেন আর বিপরীতটা যদি ঘটে (অর্থাৎ এই পরিবর্তনের ফলে এমন হয় যদি জীবদেহে রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে সহজে, কিংবা জীবের প্রকৃতিতে টিকে থাকা দায় হয়ে যায়), তাকে ‘ক্ষতিকর মিউটেশন’ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে : নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ মিউটেশনের উদাহরণ হচ্ছে : ধরা যাক, কোন শিশুর জন্মের সময় (বাবা-মায়ের শুক্রাণু-ডিম্বাণুর মিলনকালে) মিউটেশনের ফলে বাবা-মার বাদামী বা গাঢ় খয়েরী রঙের চোখ থেকে অনেক হালকা রঙের চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। যদি ঐ শিশু তার জীবনে এই মিউটেশনের ফলে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত কোন সুবিধা (দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি) পায় না বা কোন ক্ষতির সম্মুখীন (দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ) হয় না, তাহলে বলতে হবে, ওটা নিরপেক্ষ মিউটেশন ছিল; যা একটি প্রকারণ বা Variation তৈরি করেছে। ইতিবাচক বা উপকারী মিউটেশনের খুব সাধারণ উদাহরণ ‘এইচআইভি ভাইরাস’। এইডস রোগীদের জন্য কোন কার্যকরী ঔষধ এখনও তৈরি করা যাচ্ছে না, কারণ ঔষুধ প্রয়োগ করার সাথে সাথে ঐ এইচআইভি ভাইরাসগুলো দ্রুত মিউটেশন ঘটিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঔষধ আর কার্যকরী হতে পারে না। মানুষের জন্য এটা ক্ষতিকর মনে হলেও এই মিউটেশন ভাইরাসগুলোর জন্য ‘উপকারী’ বলা যায়, কারণ এর ফলে ভাইরাসগুলো প্রকৃতিতে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। আবার কোন মিউটেশনের ফলে অনেক সময় দেহকোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি শুরু হয়, যাকে আমরা ‘ক্যান্সার’ বলে থাকি, মানুষের মৃত্যুর কারণ, তাকে স্বাভাবিকভাবেই ‘ক্ষতিকর মিউটেশন’ বলা হয়। মিউটেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে : The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2003). “Are Mutations Harmful?” by Richard Harter, from <http://www.talkorigins.org/faq/mutations.html> | — সম্পাদক।

কারখানাগুলো আজ যদিও প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষে ঠাঁই নিয়েছে অথচ কোনো একসময় তারাই হয়তো মুক্ত-স্বাধীন জীবকোষ হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

তিনশত কোটি বছর আগে, কতোগুলো এককোষী জীব একত্রিত হয়েছিল, সম্ভবত একটি একক জীবকোষের একবার বিভাজনের পর এক মিউটেশন ঐ কোষটিকে পৃথক হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। এভাবেই প্রথম বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটলো। আমাদের শরীরের প্রত্যেক কোষই স্ব-নিয়ন্ত্রিত, এই মুক্ত অংশগুলো নিয়ে সবাই সাধারণ মঙ্গলের জন্য একবার একত্রিত হয়েছিল; এবং আমরা এক কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে তৈরি। আমরা, প্রত্যেকে, বহুকোষী প্রাণের একীভূতরূপ।

মোটামুটিভাবে দুশ কোটি বছর আগে যৌন-প্রজননের উদ্ভব ঘটেছিল বলে মনে হয়। তার আগ পর্যন্ত বংশগতির নির্দেশাবলীতে পরিব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিকতায়— অক্ষরের পর অক্ষরের পরিবর্তনের নির্বাচন ঘটিয়ে নতুন প্রকারের জীবের আবির্ভাব ঘটতো। বিবর্তন অবশ্যই বিরক্তিকর রকমের ধীরগতির একটি প্রক্রিয়া। যৌনপ্রজননের ফলে দুটো জীব তাদের ডিএনএ সংকেত লিপির প্যারাফ্রাফ, পৃষ্ঠা ও বই বিনিময় করে নতুন প্রকারের উদ্ভব ঘটায় যা নির্বাচনের ছাঁকনিতৈ যাচাইয়ের অপেক্ষা করে। যৌনপ্রজননে নির্বাচিত জীবেরা—যারা এতে নিরুৎসাহী, তারা দ্রুত বিলুপ্ত হয়। তবে এটি শুধু দুশ কোটি বছর আগের অণুজীবের বেলায় সত্য নয়। আজকের আমরা মানুষেরাও ডিএনএ'র অংশ বিনিময়ের জন্য উদগ্রীব।

প্রায় একশ কোটি বছর আগে, উদ্ভিদরা সমবেত কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে এক চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটায়। সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন করে অক্সিজেন অণু। যেহেতু সে সময় পৃথিবীর আবহমণ্ডল ছিল হাইড্রোজেন সমৃদ্ধ আর সাগর-মহাসাগর ছিল সবুজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। ফলে আবহমণ্ডলের হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ চরিত্রকে একমুখী পরিবর্তন ঘটিয়ে অক্সিজেন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। আর সেই সঙ্গে শেষ হতে থাকে অজৈব প্রক্রিয়ায় জীবের উপাদান সৃষ্টির অধ্যায়। কিন্তু অক্সিজেনের প্রবণতা হলো জৈব-অণুকে ভেঙে ফেলা। এর প্রতি আমাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও, অরক্ষিত জৈবিক বস্তুর জন্য মৌলিকভাবে এটা বিষ। অক্সিজেন যৌগসম্পন্ন আবহমণ্ডলের রূপান্তর প্রাণের ইতিহাসে মহাসংকটময় অবস্থা তৈরি করেছিল এবং বিপুল সংখ্যক প্রাণী অক্সিজেনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসামর্থ্য হয়, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অল্পকিছু সংখ্যক আদিমজীব, যেমন বোটালিজম ও টিটেনাস বেসিলি টিকে থাকতে সামর্থ্য হয়েছে এমন কী আজকের মুক্ত অক্সিজেনসম্পন্ন আবহমণ্ডলেও। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেন হলো অনেকটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং সেই কারণে অক্সিজেন অপেক্ষা অধিক সহনীয়। কিন্তু এটাও জৈব-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। এইভাবে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগই জৈব উৎসের। “আকাশ” প্রাণগোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি। প্রাণের ৪০০ কোটি বছরের ইতিহাসে বেশিরভাগ সময় রাজত্ব করেছে নীলাভ-সবুজ শৈবালের মতো অণুজীবেরা, যেগুলো সাগর-মহাসাগর আবৃত ও পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তারপর ৬০ কোটি বছর পূর্বে, শৈবালের একচেটিয়া রাজত্ব বা প্রভাব ভেঙে

পড়ে এবং সদ্য উদ্ভাবিত নতুন প্রাণের বিপুল বৃদ্ধি ঘটে, এই ঘটনাকে ‘ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ’ (Cambrian Explosion) বলে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় পরপরই জীবনের বিকাশ ঘটেছিল, তাই বলা যায় পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলোতে জীবনের উৎপত্তি হলো অবশ্যম্ভাবী রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তিনশ কোটি বছরে জীব-জগৎ নীলাভ-সবুজ শৈবাল থেকে খুব বেশিদূর এগুতে পারেনি, তাতে মনে হয়, বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন প্রাণের উদ্ভব ঘটা কঠিন, এমনকি প্রাণের উৎপত্তি থেকেও। সম্ভবত অনেক গ্রহ আছে অণুজীবের পরিপূর্ণ কিন্তু বড় কোনো পশু ও শাকসজি নেই।

ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডকালে সাগর-মহাসাগর নানা কাঠামোর বিভিন্ন প্রাণে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে, ট্রাইলোবাইটরা বিপুল সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের গঠন ছিল খুবই সুন্দর, বড় বড় পোকাকার মতো চোখ; সমুদ্র সমতলে তারা শিকার করে বেড়াতে। তারা তাদের চোখে পোলারাইজড আলোকে চিহ্নিত করার জন্য ক্রিস্ট্যাল পুঞ্জীভূত করেছিল। কিন্তু বর্তমানে কোনো জীবন্ত ট্রাইলোবাইট নেই; তারা ২০ কোটি বছর ধরে নেই। যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা পৃথিবী বসবাসের উপযোগী হয়েছিল তাদের কারোরই আজ প্রাণময় চিহ্ন নেই; এবং অবশ্যই বর্তমানে বিচরণশীল কোনো প্রাণীরই এক সময় কোনো অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন শিলাতে আমাদের মতো প্রাণীদের কোনো চিহ্ন নেই। প্রজাতির পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে উদ্ভব ঘটে, মোটামুটি একটা সময় বসবাস করে আবার সময়ের অস্থিরতায় হারিয়ে যায়।

ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের আগে, প্রজাতি থেকে প্রজাতির উদ্ভবের গতি যথেষ্ট মন্থর ছিল বলে মনে হয়। অংশত ক্রমশ সুদূর অতীতে যাওয়ার সাথে ভীষণভাবে আমাদের তথ্য ঘাটতি দেখা দেয়। আর এই কারণে এটা হয়তো হতে পারে, ফলে আমরা তাকাই আধবোজা চোখে; আমাদের গ্রহের প্রাচীন ইতিহাসে কম প্রাণীরই শক্ত প্রত্যঙ্গ ছিল এবং নরম জীবগুলো স্বল্পকিছু ফসিল অবশেষ রেখে গেছে। তবে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের পূর্বে নাটকীয়ভাবে নতুন কাঠামোর জীব উৎপত্তির অতি ধীর গতিই হলো বাস্তব; জীবকোষ গঠন ও প্রাণরসায়নের কষ্টসহিষ্ণু জটিল বিবর্তন বহিঃঅবয়ব গঠনে এমন কোনো তৎক্ষণাৎ ছাপ ফেলেনি যা জীবাশ্ম রেকর্ডের মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব। ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে আশ্চর্য সব নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে থাকে শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে। প্রথম মৎসকূল এবং প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর দ্রুত পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাব ঘটে। এরপর, যে উদ্ভিদ আগে সমুদ্রে সীমাবদ্ধ ছিল সেগুলো স্থলভাগে উপনিবেশ গড়তে শুরু করে; প্রথম প্রতঙ্গের উদ্ভব ঘটলে, এর বংশধরেরা স্থলভাগের প্রাণীকূলের উপনিবেশ তৈরির পথ-প্রদর্শকে পরিণত হয়েছিল; উভচর প্রাণীর সাথে পাখাবিশিষ্ট পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটলো, জীবগুলো ছিল অনেকটা ফুসফুস সম্পন্ন মাছের মতো, যারা স্থলে ও জলে টিকে থাকার উপযোগী ছিল; প্রথম গাছ ও প্রথম সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো; এল ডায়নোসরদের; স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব ঘটলো, তারপর প্রথম পাখিরা আসলো; ফুলের আগমন ঘটলো; ডায়নোসরদের বিলুপ্ত হয়ে গেলো; ডলফিন ও তিমিদের পূর্বপুরুষ সবচেয়ে আদিম দস্তুর তিমিবর্গীয় প্রাণীর আগমন ঘটেছিল এবং একই কালপর্বে

প্রাইমেটদের আবির্ভাব ঘটেছিল; বানর, নরবানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ। এক কোটিরও কম সময়ের আগে মগজের লক্ষণীয় বর্ধিত আয়তনসহ এমন এক ধরনের জীবের উদ্ভব ঘটলো যা অনেকাংশে মানুষের মতো; এবং তারপর ২০/৩০ লক্ষ বছর পূর্বে প্রথম সত্যিকারের মানুষের উদ্ভব ঘটলো।

মানুষেরা বনে-জঙ্গলে বেড়ে উঠেছিল; এগুলোর জন্য আজও আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। কতো মনোমুগ্ধকর একটি গাছ, টান টান করে আকাশের দিকে ডালাপালা মেলে থাকে। পাতাগুলো সালোক সংশ্লেষণের জন্য সূর্যরশ্মিকে সঞ্চিত করে, সুতরাং গাছেরা পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে ছায়া বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামে। একটু ভালোভাবে তাকালে প্রায় লক্ষ্য করা যায় দুটো গাছ পরস্পরকে ঠেলেছে এবং অবসাদগ্রস্তের মতো হালকাভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। গাছগুলো হলো বিশাল ও সুন্দর যন্ত্র, সূর্যরশ্মির শক্তিপ্রাপ্ত, ভূমি হতে পানি এবং বায়ু হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিচ্ছে, এই পদার্থগুলোকে খাদ্যে রূপান্তরিত করছে তাদের জন্য এবং সেই সাথে আমাদেরও। উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট ব্যবহারের মাধ্যমে একে শক্তি-উৎস হিসেবে তৈরি করে এর উদ্ভিদীয় কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করা উদ্দেশ্যে; এবং আমরা প্রাণীরা, যারা মূলত উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল পরজীবী, তারা ছিনিয়ে নেই সেই কার্বোহাইড্রেট যাতে আমাদের কর্মকাণ্ড চালাতে পারি।

আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় প্রাপ্ত অক্সিজেন রক্তে দ্রবীভূত করি। আর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করে রক্তে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঙ্গে অসচেতনভাবেই যুক্ত করি। এর ফলে সেই শক্তি তৈরি হয় যা আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই প্রক্রিয়ায় আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেই, যাকে উদ্ভিদ আবার নবায়নের (রিসাইকেল) মাধ্যমে আরও অধিক কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। কী চমৎকার পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা; উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রত্যেকেই একে অন্যের নিঃসৃত উপাদান শ্বসনরত। বিস্তৃত চক্রটি চালিত হয় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্য নামক নক্ষত্র থেকে শক্তি আহরণের মাধ্যমে।

জানা মতে এক হাজার কোটি প্রকারের জৈব-অণু থাকলেও সেগুলোর মাত্র পঞ্চাশটি জীবনের মূল কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়। একই রকমের বিন্যাস বারংবার যুক্ত হয়, বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিমিতভাবে, দক্ষভাবে। পৃথিবীর প্রাণের একেবারে মূলে তাকালে আমরা দেখবো প্রোটিন অণু যা নিয়ন্ত্রণ করে কোষ-রসায়নকে, এবং নিউক্লিক এসিড অণু যা বহন করে বংশগতির নির্দেশাবলী আর আমরা সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে ঐ অণুগুলো মূলগতভাবে অভিন্ন হওয়াকে লক্ষ্য করি। একটি ওক গাছ ও আমি একই উপাদানে তৈরি। যদি আপনি অনেক পিছনে যান, তাহলে দেখবেন আমাদের আছে একটি একই সাধারণ পূর্বপুরুষ।

বিবর্তনের সহজ পাঠ

অভিজিৎ রায়*

বিবর্তন (Evolution) বিষয়টি অনেকের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে সহজ-সরল একটি লেখার ইচ্ছে দীর্ঘদিনের। আমাদের দেশে বিবর্তন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার চেয়ে ভুল-প্রোপাগান্ডার প্রচারণা অনেক-অনেক বেশি; ফলে প্রোপাগান্ডাকেই ‘সত্য’ বলে ধরে নেন বেশিরভাগ মানুষ। এর কারণ কি? মূল ও প্রধান কারণ বোধহয় ডারউইনের এই যুগান্তকারী তত্ত্বটি সম্বন্ধে অনেকেরই সঠিক ধারণা না থাকা। দ্বিতীয় কারণ—ছোটবেলা থেকে আমাদের মগজে যেভাবে ‘ধর্মীয় সৃষ্টিবাদ’ ঝাঁকিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়, বড় হবার পরে আমরা বুঝি ডারউইনের তত্ত্বটির অবস্থান আসলে সে সমস্ত রূপকথা-উপকথাগুলোর একশাশি ডিগ্রী বিপরীতে। পরিণত বয়সে এসে কেউ যখন দেখে বিজ্ঞান যা বলতে চাচ্ছে তার সাথে ছোটবেলায় শোনা গল্পগুলোর সাথে বিস্তর রকমের ফারাক তখন অনেকেই লাগে এক বিরটি রকমের ধাক্কা। কিন্তু ধাক্কা খেলে কী হবে, নিজেকে ‘আপডেট’ করার কাজটি অনেকেই আর করতে চান না। ছোটবেলায় বাবা-মা কিংবা গুরুজনদের কাছ থেকে শোনা ‘আদম-হাওয়া-গন্ধমফল-শয়তানের’ গল্প থেকে অনেকেই আর বেরতে চান না, মুখ তুলে তাকাতে চান না জগতের বাস্তবতার দিকে। আর অন্ধবিশ্বাসীর দল তো ঘোঁট পাকাতে বসে থাকে অহর্নিশি। তারা ছড়াতে থাকে ডারউইন-ওয়ালেস প্রদত্ত এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা কিসিমের কুৎসা। উল্টো দিকও আছে। যারা বিবর্তন বিষয়ে জানেন-বোঝেন, তারা আবার একে জনপ্রিয়করণে কোনো আলাদা ভূমিকা রাখেন না বা রাখতে চান না। তারা ভাবেন—‘কালের পরিক্রমায় এমনিতেই বুঝি মানুষের কুসংস্কার একসময় দূর হয়ে যাবে; এতো ‘প্রিচিং’ করার কি দরকার? বিজ্ঞান তো আর ধর্ম নয় যে পয়গম্বর দিয়ে নসিহত করতে হবে!’

কিন্তু কুসংস্কার দূর হয় না আপনা-আপনি। দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের অচলায়তন ভাঙা আসলে বড় কঠিন। মনীষী রাহুল সাংকৃত্যায়ন একবার বলেছিলেন : “মানুষ জেলে

* অভিজিৎ রায় : গবেষক ও বিজ্ঞান লেখক। মুক্তমনা ওয়েব সাইট (www.mukto-mona.com)-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী* (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫), *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে* (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭)। সম্পাদনা : *স্বতন্ত্র ভাবনা* (চারিদিক প্রকাশনী, ২০০৮)।

যাওয়া বা ফাঁসির মধ্যে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গৌড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মধ্যে ওঠার চেয়ে ঢের বেশি সাহসের কাজ।”

কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় বলেই সংস্কারমুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। মিথ্যে নয় বলেই অনেকেই বাজির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতেই সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন; হাজারো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হলেও ছোটবেলায় শোনা ‘রূপকথা’ থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকানোর সাহস রাখেন খুব কম লোকজনই।

বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করে প্রথমেই অভিযোগ আসে ধর্মবাদীদের কাছ থেকে। বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে ধর্মবাদীদের মূল আর্তি অনেকটা এরকম : ‘এটি চমকপ্রদ ও কল্পকাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়; বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। এই তত্ত্ব জীবজগতে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ভাব প্রকাশ করে সবসময়; মানুষকে নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত করে ধীরে ধীরে।’

অপার্থিব-অলৌকিক ‘ঈশ্বর’ নামক সত্তার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে, ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে না। বিজ্ঞানের কাজ, পদ্ধতি, কর্মপ্রক্রিয়া সবই পার্থিব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী। জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ‘জৈববিবর্তন’ তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হল প্রজাতির উদ্ভব, বিকাশ, প্রকারণ, অভিযোজন ইত্যাদি। এ পৃথিবীতে যেভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, এরপর সেটি কী করে পদে পদে বিকশিত হল, বিবর্তিত হল, উদ্ভব ঘটল নতুন নতুন প্রজাতির, এগুলোই জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলোচনার বিষয়বস্তু। আর পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে কাজ করে জৈব-রসায়ন (Bio-Chemistry), ভূ-রসায়ন (Geo-Chemistry)। বিবর্তনবিরোধীরা সামান্য জৈববিবর্তন তত্ত্বের গণ্ডি সম্পর্কে অবগত নন বলে বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার বিরুদ্ধে অযথাই কালিমা লেপন করে থাকেন। তাই ধর্মবাদীদের অভিযোগের জবাব দিতে হলে অবশ্যই প্রথমে ছোট করে হলেও ‘বিবর্তন’ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। নয়তো আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিবর্তন কি?

বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ বলতে একেবারে সহজ ভাষায় বোঝায় ‘ধীরে ধীরে পরিবর্তন’কে। আমরা নানারকম পরিবর্তনের সাথে এমনিতেই পরিচিত। প্রকৃতির নানা রকম পরিবর্তন আমরা হরহামেশাই দেখি। ভূত্বকের পরিবর্তন হয়, নদী-নালা-খাল-বিল গুঁকিয়ে যায়, দাবানল বা অগ্ন্যুৎপাতে শহর ধ্বংস হয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে এন্টার্কটিকার বরফ গলে যাচ্ছে, কিংবা সুপারনোভা বিস্ফোরণে গ্রহাণুপুঞ্জ ধ্বংস হয়। এগুলো সবই জড়জগতে পরিবর্তনের উদাহরণ। কিন্তু

জীবজগৎ সম্পর্কে অনেকদিন ধরে মানুষের ধারণা ছিল সমস্ত পরিবর্তনের উর্ধ্ব। কারণ হিসেবে মনে করা হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবজগৎ সর্বাসীন সুন্দর, আর নিখুঁত। তাই এদের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সকল জীব, সকল প্রজাতি সুস্থির, আবহমান কাল ধরে অপরিবর্তিত আছে এবং থাকবে। চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের যৌথভাবে প্রস্তাবিত ‘বিবর্তন তত্ত্ব’ মূলত জীবজগতের অপরিবর্তনীয়তার দীর্ঘদিনের ‘মিথ’কে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাদের তত্ত্ব প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছে জীবজগতও আসলে স্থির নয়, জড়জগতের মত জীবেরও পরিবর্তন হয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের হার খুবই ধীর। ডগলাস ফুতুইয়ামা (Douglas J. Futuyma) তাঁর ‘*Evolutionary Biology*’ বইয়ে ‘বিবর্তন’কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : “In the broadest sense, evolution is merely change, and so is all-pervasive; galaxies, languages, and political systems all evolve. Biological evolution... is change in the properties of populations of organisms that transcend the lifetime of a single individual. The ontogeny of an individual is not considered evolution; individual organisms do not evolve. The changes in populations that are considered evolutionary are those that are inheritable via the genetic material from one generation to the next. Biological evolution may be slight or substantial; it embraces everything from slight changes in the proportion of different alleles within a population (such as those determining blood types) to the successive alterations that led from the earliest protoorganism to snails, bees, giraffes, and dandelions.”

এই প্রবন্ধে আলোচনা কেবল জীবজগতের বিবর্তনেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। জীববিজ্ঞানে একে অভিহিত করা হয় জৈববিবর্তন নামে। এ লেখায় বিবর্তন বলতে মূলত জৈববিবর্তনই বোঝানো হচ্ছে। বিবর্তনের ধারণাটি মোটেই জটিল কিছু নয়। ডারউইন যখন তাঁর এই বিখ্যাত তত্ত্বটি বন্ধু টি.এইচ.হাক্সলিকে বোঝাতে শুরু করেছিলেন, হাক্সলি মাথা চাপড়িয়ে বলেছিলেন : “এমনি স্টুপিড আমি যে এই সোজা ব্যাপারটা আপনি বলার আগে কখনোই মাথায় আসেনি।” বিজ্ঞানীদের মতে আমরা আমাদের চারপাশের যত রকমের জীবজগতের সাথে পরিচিত, তাদের সবার পূর্বপুরুষ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সদৃশ সরল এককোষী জীব, যাদের উদ্ভব পৃথিবীতে হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। প্রায় ষাট কোটি বছর আগে বাস করত এমন এক প্রকার কৃমি জাতীয় জীব যা থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়েছে মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহ। প্রায় এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগেকার ছুঁচো-সদৃশ একধরনের প্রাণী থেকে এসেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মানুষের পূর্বপুরুষেরা। মূল কথা হল, আমাদের পৃথিবীতে দেখা জীবজগতের মধ্যে উৎপত্তিগতভাবে, বংশধারার উত্তরাধিকারসূত্রে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে থেকে শুরু করে বর্তমানকালের সকল জীবই আসলে একে অন্যের আত্মীয়!

কিভাবে বিবর্তন কাজ করে?

১৯৫৯ সালে চার্লস ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিসিজ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি প্রথমবারের মত ব্যাখ্যা করেন বিবর্তনের পিছনে চালিকা শক্তি হল 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection)। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বিষয়টি ভারি মজার। রোমান্টিক ব্যক্তির হাত এতে রোমান্সের গন্ধ পাবেন। জীবজগতে স্ত্রী হোক আর পুরুষই হোক কেউ হেলাফেলা করে মেশে না। মন-মানসিকতায় না বনলে, প্রকৃতি পাত্তা দেবে না মোটেই। প্রকৃতির চোখে আসলে লড়াকু স্ত্রী-পুরুষের কদর বেশি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতি যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয় আর অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাতিল করে দেয়, ফলে একটি বিশেষ পথে ধীর গতিতে জীবজন্তুর পরিবর্তন ঘটে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মাস্তরে। কিভাবে সেটা ঘটে? খুব বেশি জটিলতার মধ্যে না ঢুকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' টার্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য নীচের তিনটি ধাপে প্রকাশ করা যায় :

- ১) জনপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে (জীববিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'Replication')।
- ২) প্রতিলিপি করতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিলিপিগুলো পুরোপুরি নিখুঁত হয় না, অনেক সময় ভুল হয়ে যায় (জীববিজ্ঞানীরা একে বলেন 'Mutation' বা পরিব্যক্তি)।
- ৩) এই ভুলের কারণে প্রজন্ম পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে (জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'Variation' বা প্রকারগ)।

এই রেপ্লিকেশন, মিউটেশন এবং ভ্যারিয়েশনের সমন্বয়ে সিলেকশন প্রক্রিয়া জীবজগতের জনপুঞ্জে যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) নামে অভিহিত করা হয়। চার্লস ডারউইনের মতে জীবন সংগ্রামে যে সকল মিউটেশন-ভ্যারিয়েশন জীবকে সুবিধা করে দেয়, সেগুলো জীবকে টিকে থাকতে আর অধিকহারে বংশধর রেখে যেতে সাহায্য করে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, যে পরিব্যক্তিগুলো অধিক অভিযোজনক্ষম, সেগুলোর বাহক জীবেরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে উদ্বর্তিত হয়। ডারউইন একে বলেছিলেন 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' (Descent with Modification)। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবে চলতে থাকলে একসময় 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' থেকে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয়। ব্যাপারটা আরো ভালভাবে বোঝা গেছে 'আণবিক জীববিদ্যা' এবং 'জেনেটিক্স'-এর আবির্ভাবের পর। এর ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি বিবর্তনের জন্য খুঁজে পাওয়া গেছে আরো কিছু ফ্যাক্টর, যথা জিন মিউটেশন, ক্রোমোসোম মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, জেনেটিক ড্রিফট এবং অন্তরণ বা আইসোলেশন। জীবন-সংগ্রামে যে সব প্রকারগ জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশি সুবিধা করে দেয় সেইসব জিনের অধিকারী জীবই বড়

হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে এবং যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশি সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হয়। ডারউইন বিবর্তনকে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং প্রজাতির স্তরে, আর আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তনকে দেখেন জিন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং জনপুঞ্জে। একটি প্রজাতির কতগুলো জীব যখন নিজেদের মধ্যে যৌন-প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তখন তাদের জনপুঞ্জের সবার জিনের সমষ্টিকে একসঙ্গে বলে 'জিন সম্ভার' (gene pool)। একদিকে যৌন-প্রজননের মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বাবা-মার জিনের যে জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয় তার ফলে পরবর্তী প্রজন্মে জিনের অদলবদল ঘটে, আবার অন্য দিকে জিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটান ফলে কখনও কখনও তার ডিএনএ'র গঠন বা সংখ্যায়ও পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা হয় পরিব্যক্তি (মিউটেশন)। মিউটেশনের মাধ্যমেই প্রকারগের সৃষ্টি হচ্ছে আর তারপর যৌন প্রজননের মাধ্যমে তা সমগ্র 'জিন সম্ভার'-এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই আধুনিক বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন জনপুঞ্জে জিন সম্ভারের পরিবর্তনের নিরিখে। সে হিসেবে বিবর্তনের আধুনিক সংজ্ঞাটি হবে অনেকটা এরকম : Evolution is a change in the gene pool of a population over time.

এখন কথা হচ্ছে, ধর্মবাদের বক্তব্য মতো : **বিবর্তন কি কেবল এক চমকপ্রদ কল্পকাহিনী?**

বিবর্তন চমকপ্রদ, তাতে সন্দেহ নেই, তবে মোটেই কল্পকাহিনী নয়। কেন নয়? জটিল তত্ত্বকথায় না গিয়ে একটু খোলা মন নিয়ে বিষয়টা পর্যালোচনা করলেই হয়। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে বিজ্ঞানী-গবেষকদের একটা বিরাট অংশ ছিলেন সৃষ্টিবাদী; এমন কী চার্লস ডারউইন নিজেও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ধর্মবিদ্যা শিখে যাজক হওয়ার জন্য। সে সময়ের বেশিরভাগ গবেষক প্রাণ কিভাবে সৃষ্টি হল, কিংবা বৈচিত্র্যময় এতো প্রজাতি কিভাবে সৃষ্টি হল এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য খুঁজতেন, বিশ্বাস করতেন বাইবেলে বলা 'ছয় দিনে বিশ্ব তৈরি' কাহিনীতে কিংবা 'নুহ নবীর আমলে ঘটা মহাপ্লাবনের' কাহিনীতে। কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে এগুলো বানিয়েছেন তা খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। তারা নিজেরাই বুঝলেন যে পৃথিবীর বয়স বাইবেলে বর্ণিত ছয় হাজার বছরের চেয়ে চের বেশি; নুহের প্লাবনের সাথে মাটি খুঁড়ে পাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলো মিলছে না। শুধু তাই না, পাওয়া যাচ্ছে কিছুতকিমাকার বিলুপ্ত প্রজাতির হাড়গোড় আর বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম। এমনকি পাওয়া যাচ্ছে 'মিসিং লিঙ্ক' হিসেবে পরিচিত দুই ট্যাক্সার বৈশিষ্ট্যযুক্ত নানা ফসিল। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এবং পরবর্তীতে বিংশ শতকে 'কোষবংশগতিবিদ্যা' এবং 'আণবিক জীববিজ্ঞান' নামক জীববিজ্ঞানের নবশাখা আবির্ভাবের পর প্রজাতির উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কিত অনেক জটিল প্রশ্নই বিজ্ঞানীদের কাছে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বলা বাহুল্য আজকের দিনে

জীববিজ্ঞানীদের সকলেই বিবর্তনবাদী। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই বিবর্তনকে অস্বীকার বা বিরোধিতা করা হয় না; সেখানে হয়তো বিবর্তন কিভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্ফন আকারে ঘটছে) মতামত হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক, স্যালটেশন নাকি কোয়ান্টাম-এ নিয়ে; কিন্তু বিবর্তন যে ঘটছেই সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী এবং প্রাণরসায়নবিদদের মধ্যে এখন কোনো সংশয় নেই। সেজন্যই বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং আধুনিক বিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা থিওডসিয়াস ডাবল্যানস্কি বলেছেন : ‘Nothing in Biology makes any sense except in the light of Evolution.’

অর্থাৎ বিবর্তনের আলোকে না দেখতে পারলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুই অর্থ হয় না। এ কথা খুবই সত্যি। বস্তুতঃ বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ আজ এতাই বেশি যে সেগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ অনেকটা পৃথিবীর গোলত্ব বা অভিকর্ষ বলকে অস্বীকার করার মতই।

বিবর্তনের সাক্ষ্য

বিবর্তন বা জৈব অভিযুক্তির পক্ষে সাক্ষ্য এতাই বেশি যে কম কথায় লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তারপরও এই প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তা হল : প্রাণ-রাসায়নিক প্রমাণ, কোষবিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ, শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ, সংযোগকারী জীবের (connecting link) প্রমাণ, ভৌগলিক বিস্তারের (Geographical distribution) প্রমাণ, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের (Comparative Anatomy) প্রমাণ, শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত প্রমাণ, নিষ্ক্রিয় বা বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গের (Vestigial organs) প্রমাণ ইত্যাদি। আর ফসিলের সাক্ষ্য তো আছেই। তবে ১৯৫০ সালের পর থেকে বিবর্তনের স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেছে ‘আণবিক জীববিদ্যা’ (molecular biology) এবং কোষবংশগতিবিদ্যা (cytogenetics) থেকে। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক ডিএনএ’র আণবিক গঠন উদ্ঘাটন করেন। তাঁরা ডিএনএ অণুর যে মডেল প্রস্তাব করেন তা ‘ওয়াটসন-ক্রিক যুগ্ম সর্পিলা মডেল’ নামে পরিচিত। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে দুই বিলিয়ন ডলার বাজেট নিয়ে ২০ বছরব্যাপী মানব-জিনোম প্রকল্প শুরু হয়, যা ২০০৪ সালে শেষ হয়েছে। এই জিনোম প্রকল্প থেকে জানা গেছে আমাদের ডিএনএ শিম্পাঞ্জির ডিএনএ’র সাথে প্রায় ৯৮.৬%, ওরাং ওটাং-এর সাথে ৯৭% এবং হুঁদুরের সাথে ৮৫% মিলে যাচ্ছে। এর উত্তর কি? উত্তর খুব সোজা। বিবর্তন তত্ত্ব বলেছে প্রজাতিগুলো যত কাছাকাছি সম্পর্কিত, তাদের জেনেটিক গঠনও থাকবে কাছাকাছি। শিম্পাঞ্জিকুলের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠনে এতো মিল কারণ, আমরা ৫০-৮০ লক্ষ বছর আগে এক ধরনের শিম্পাঞ্জি থেকে বিবর্তিত হয়েছি। সে তুলনায় হুঁদুরের ডিএনএ’র সাথে আমাদের ডিএনএ’র মিল কম, কারণ সেই প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছিল শিম্পাঞ্জি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনেক অনেক আগে।

বিভিন্ন জীবের বংশানুসৃত দ্রব্য ডিএনএ এবং আরএনএ এবং প্রোটিনের অণুগুলোর আণবিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের আণবিক গঠনও একই রকমের; যেমন প্রকৃতিতে ৩৯০ রকমের এমাইনো এসিড পাওয়া গেলেও দেখা গেছে প্রতিটি জীব গঠিত হয়েছে মাত্র ২২টি এমাইনো এসিডের রকমফেরে। অর্থাৎ একই রকমের (২২টি) এমাইনো এসিড দিয়ে সকল জীবের প্রোটিন গঠিত। প্রোটিন অণুতে এমাইনো এসিডের অবশেষগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে এমাইনো এসিড অনুক্রম। ঠিক একই রকমভাবে দেখা গেছে যে, সকল জীবের ডিএনএ অণুর গঠন একক বেসও একই ধরনের; মাত্র চার প্রকার বেস, যথা এডেনিন (A), গুয়ানিন (G), থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C) দিয়ে সকল জীবের ডিএনএ গঠিত। প্রতি বছরই প্রকৃতিতে প্রায় হাজার খানেক করে নতুন প্রজাতির সন্ধান পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিনই নতুন নতুন ডিএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করছেন তারা ল্যাবরেটরিতে বসে। একটি ক্ষেত্রেও তারা ব্যতিক্রম পাননি। জীবজগতের প্রজাতি যদি কোনো ‘অতিপ্রাকৃত মহাপরাক্রমশালী’ স্রষ্টার হাতের কারসাজিতে সৃষ্ট হতো, তবে ইচ্ছে করলেই তিনি অজানা অচেনা জেনেটিক পদার্থ দিয়ে কোন প্রজাতি বা জীব তৈরি করতে পারতেন। সেরকম কোনো জীবই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আসলে সকল জীবের উৎপত্তি যদি একই উৎস থেকে বিবর্তিত না হয়ে থাকে তবে আধুনিক জীববিদ্যার এ সমস্ত তথ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, জীবের উৎপত্তি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তা সে মানুষই হোক অথবা বিশাল বপু হিপোপটেমাসই হোক। সকলেই একই উৎসের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল।

শুধু তাই নয়, আণবিক জীববিদ্যা খুব ভালভাবে দেখিয়েছে যে প্রোটিনে এমাইনো এসিডের অনুক্রমে পরিবর্তনের কারণ ডিএনএ জেনেটিক কোডে মিউটেশন। মিউটেশনের হারও নানাভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন প্রোটিনের এমাইনো এসিড অনুক্রম ও নিউক্লিয়িক এসিডে পলিনিউক্লিয়িড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে যথাক্রমে এমাইনো এসিড আর বেসের প্রতিস্থাপন হিসেব করে মিউটেশনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে সমগ্র জীবজগতে গড়ে ১৭.৬ মিলিয়ন বছরে একটি এমাইনো এসিড প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৭৯২ মিলিয়ন বছর আগে। এ হিসেবটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসেবের সাথে অবিকল মিলে যায়। সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের ‘সাইটোক্রোম সি’ অণুর মধ্যে এমাইনো এসিডের গড় পার্থক্য থেকে হিসেব করে বের করা হয়েছে যে এ দুটি গ্রুপের পৃথক হতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর। ঠিক একইভাবে শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং ও মানুষ বিবর্তনের ধারায় কখন একে-অন্য থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে তাও খুব নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমস্ত সাক্ষ্যই বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে গেছে, এমন কোনো কিছু পাওয়া যায়নি যাতে মনে হতে পারে বিবর্তন তত্ত্ব অথৈ সমুদ্রে পড়েছে। কোষবংশগতিবিদ্যা এবং আণবিক জীববিদ্যা

বর্তমানে বিবর্তনের স্বপক্ষে এক অফুরন্ত তথ্য ভাণ্ডার। শুধু এগুলোর সাহায্যেই প্রমাণ করা যায় প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সাথে নির্ভরযোগ্যভাবে রচনা করা যায় পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে ফসিলগুলো যদি নাও পাওয়া যেত, তবু শুধু জেনেটিক তথ্য বিশ্লেষণ করেই বিবর্তন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ড. রিচার্ড ডকিন্স তাঁর ‘*The Ancestor’s Tale*’ বইয়ে বলেছেন : “In spite of the fascination of fossils, it is surprising how much we would still know about our evolutionary past without them. If every fossil were magicked away, the comparative study of modern organisms, of how their patterns of resemblances, especially of their genetic sequences, are distributed among species, and of how species are distributed among continents and islands, would still demonstrate, beyond all sane doubt, that our history is evolutionary, and that all living creatures are cousins. Fossils are a bonus. A welcome bonus, to be sure, but not an essential one.”

ম্যাক্রোবিবর্তনের পক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে রক্তরস বিজ্ঞান থেকে। রক্তকে জমাটবদ্ধ হতে দিলে যে তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে তার নাম সিরাম। এতে থাকে এন্টিজেন। এ সিরাম এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে প্রবেশ করলে উৎপন্ন হয় এন্টিবডি; যেমন মানুষের সিরাম খরগোশের দেহে প্রবেশ করলে উৎপন্ন হয় এন্টি হিউম্যান সিরাম। এতে থাকে এন্টিহিউম্যান এন্টিজেন। এ এন্টিহিউম্যান সিরাম অন্য মানুষের সিরামের সাথে মেশালে এন্টিজেন এবং এন্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হয়। এই অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম মানুষ, নরবানর, ‘পুরানো পৃথিবীর’ বানর, লেমুর প্রভৃতির সিরামের সাথে বিক্রিয়া করলে দেখা যায় যে প্রাণীগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কের নৈকট্য যত বেশি, তলানির পরিমাণ তত বেশি হয়। প্রাণীগুলোর মধ্যে বিক্রিয়ার অনুক্রম হল : মানুষ-> নরবানর->পুরানো পৃথিবীর বানর-> লেমুর

অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লেমুর, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লেমুরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের ‘এন্টিজেন এন্টিবডি’ বিক্রিয়াও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।

এই প্রবন্ধে বিবর্তনের সব সাক্ষ্যের আলামত লিপিবদ্ধ করতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই মহাভারত হয়ে যাবে। তারপরও পাঠকদের জন্য সামান্য আরো কিছু ‘প্রমাণ’ উল্লেখ না করলে অন্যায্যই হবে :

- ❖ জীবজগৎ রেপ্লিকেশন, হেরিটাবিলিটি, ক্যাটালাইসিস এবং মেটাবলিজম নামক সার্বজনীন মৌলিক প্রক্রিয়ার অধীন, যা জীবন প্রক্রিয়ার এক অভিন্ন উৎসের দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করে।
- ❖ সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি উদ্ভূত হলে প্রজাতিগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবে, এক গ্রুপ থেকে সাব গ্রুপ তৈরি হবে, এবং এ সমস্ত কিছুকে ‘জাতিজনি বৃক্ষ’ (Phylogenetic tree) আকারে সাজানো যাবে। ঠিক তাই পাওয়া যাচ্ছে।
- ❖ বিবর্তন তত্ত্ব থেকে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত টানছি তা প্রত্নতত্ত্ব, জৈবরসায়ন, আণবিক জীববিদ্যা, কোষবংশগতিবিদ্যা কিংবা জেনেটিক ট্রেইটের থেকে পাওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যাচ্ছে।
- ❖ প্রাণীর ফসিলগুলো এই জাতিজনি বৃক্ষের ঠিক ঠিক জায়গায় খাপ খেয়ে যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রে আমরা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল বা ‘মিসিং লিঙ্ক’ খুঁজে পেয়েছি।
- ❖ বহু প্রাণীর মধ্যে অসম্পূর্ণ ডানা, চোখ কিংবা নিষ্ক্রিয় অঙ্গাদির অস্তিত্ব রয়েছে।
- ❖ আতাভিজম (Atavism) মাঝে মাঝে ঘটতে দেখা যায়। তিমির পেছনের পা, ডলফিনের পেছনের ফিন, ঘোড়ার অতিরিক্ত আঙুল বিশিষ্ট পা কিংবা লেজবিশিষ্ট মানব শিশু প্রকৃতিতে মাঝে মাঝেই জন্ম নিতে দেখা যায়। এটা বিবর্তনের কারণেই ঘটে। কারণ কোনো অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেলেও জনপুঞ্জের জিনে ফেনোটাইপ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ডিএনএ সেই তথ্য রেখে দেয়। তার পুনঃপ্রকাশ ঘটতে পারে বিরল কিছু ক্ষেত্রে। লেজবিশিষ্ট মানবশিশুর কিছু সচিত্র বাস্তব উদাহরণ দেখা যাবে পাশের ওয়েব সাইট থেকে : http://www.dimaggio.org/Eye-Openers/tails_in_humans.htm
- ❖ জীবজগতে প্রজাতির বিন্যাস বিবর্তনের ইতিহাসের ক্রমধারার সাথে সঙ্গতি বিধান করে; যেমন মার্সুপিয়ালেরা শুধু অফ্রেলিয়াতে সীমাবদ্ধ। যা কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তাকে ‘কন্টিনেন্টাল ড্রিফট’ বা ‘মহাদেশীয় সঞ্চারণ’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অন্তরিত দ্বীপে এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণী পাওয়া যাচ্ছে যা মূল ভূখণ্ডে অনুপস্থিত। ডারউইনও গ্যালাপাগোস দ্বীপে গিয়ে নানা রকমের তৌঁটের আকারসম্পন্ন ফিঙ্গে, বিরাট গলাবিশিষ্ট কচ্ছপ পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন সাঁতার কাটা ইগুয়ানা, যেগুলো আর কোথাও দেখা যায় না। তেমনি কোকাস দ্বীপে এমন এক ধরনের কাঁকড়া দেখেন যারা গাছের নীচে পড়া নারকেল ভেঙ্গে খায়। এক ধরনের কুকুর দেখেন যারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের পানি থেকে মাছ শিকার করে আনে, কিছু মাছ আছে যারা আবার কোরাল খেয়ে জীবন ধারণ করে। ঐ দ্বীপে বিরাট বিরাট আকারের ঝিনুক আছে যা মানুষের পা কামড়ে ধরে আর ডুবিয়ে মেরে ফেলে। ওখানকার ইঁদুরেরা তালগাছের আগায় গিয়ে বাসা বাঁধে। কাজেই অন্তরণের ফলে জীবজগতে নানা ধরনের অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটে এবং তা থেকে নতুন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে তা বহুভাবেই প্রমাণিত।

- ❖ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ববিকশিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই নতুন অঙ্গের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে তাই লক্ষণীয় মিল দেখা যায়। ব্যাঙ, কুমির, পাখি, বাদুর, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম। বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের হাড়ের মধ্যকার সাদৃশ্যের ছবি পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটি অব বিট্রিশ কলম্বিয়ার ওয়েব সাইট থেকে : <http://www.zoology.ubc.ca/~bio336/Bio336/Lecture5/Overheads.html>। এখন আমরা জানি, আধুনিক জেনেটিক্স-এর গবেষণাও সেই একই দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করছে।
- ❖ একই ব্যাপার খাটে আণবিক স্তরেও। ফুটফ্লাই বা ফলের মাছি আর মানুষের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, এরা শতকরা সত্তরভাগেরও বেশি 'কমন জিন' শেয়ার করে। আগেই বলা হয়েছে, যে পূর্বপুরুষের সাথে কাছাকাছি সময়ে কোনো প্রজাতি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের জিনগত নৈকট্যও তত বেশি থাকে। সেজন্যই মানুষের সাথে ওরাংওটাং-এর ডিএনএ অণুর বেইস জোড়ের মধ্যে পার্থক্য প্রায় ২.৪%, গরিলার সাথে ১.৬%, আর শিম্পাঞ্জির সাথে ১.৪%। বিবর্তন তত্ত্ব সঠিক না হলে এই ব্যাপারটি কখনোই ঘটতো না।
- ❖ অনেক সময় একই ধরনের কাজ করলেও বিবর্তন ঘটে স্বতন্ত্রভাবে কিংবা সমান্তরাল পথে; যেমন পাখি, বাদুর কিংবা পতঙ্গের পাখা উড়তে সহায়তা করলেও এদের গঠন ভিন্ন।
- ❖ প্রজাতি গঠনের বিভিন্ন উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশের ওয়েব লিঙ্ক থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন : <http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB910.html>
- ❖ আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো শাখা থেকে পাওয়া তথ্য বিবর্তনের বিপক্ষে যাচ্ছে না।

লুপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গাদি

বিবর্তনের পক্ষে প্রচুর প্রমাণ হাজির করা যায়। এর মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল মানবদেহে থেকে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গের প্রমাণ; যেমন আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অ্যাপেন্ডিক্স কিংবা পুরুষের স্তনবৃত্ত। এগুলো তো দেহের কোনো কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে এপেন্ডিসাইটিস রোগের বড় উৎসই হল এই এপেন্ডিক্স। তাহলে এগুলো দেহে থাকার কি ব্যাখ্যা? 'ঈশ্বর' নামক বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি এতো 'আনইন্টেলিজেন্ট' হবে কেন যে ত্রুটিগুলো ছাপোষা সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়বে?

এছাড়া আমাদের দেহে রয়ে গিয়েছে চোখের নিষ্টিটেটিং ঝিল্লি, কান নাড়াবার কিছু পেশি, ছেদক, পেষক এবং আক্কেল দাঁত, মেরুদণ্ডের একদম নীচে থেকে যাওয়া

লেজের হাড় (Coccyx), সিকামসহ শতাধিক নিষ্ক্রিয়, অবাস্তুর এবং বিলুপ্ত অঙ্গাদি। নীচে মানবদেহের কিছু বিলুপ্ত প্রত্যঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল :

- ❖ **পুরুষের স্তনবৃত্ত** : স্তন এবং স্তনবৃত্ত মূলত দরকার মেয়েদের। পুরুষদের এটা কোনো কাজে আসে না। অথচ সকল পুরুষের দেহে বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে রয়ে গেছে স্তনবৃত্তের চিহ্ন।
- ❖ **পুরুষের ইউটেরাস** : পুরুষের দেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত এবং অব্যবহার্য অবস্থায় স্ত্রী-জননতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে।
- ❖ **ত্রয়োদশ হাড়** : আধুনিক মানুষদের পাজরে বারো সেট করে হাড় থাকে। কিন্তু মানব-জনপঞ্জের শতকরা ৮ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে তেরতম হাড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ত্রয়োদশ হাড় দেহের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায় গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে। মানুষ যে এক সময় প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছে এই আলামতগুলো দেখে বোঝা যায়।
- ❖ **লেজের হাড়** : মানবদেহের মেরুদণ্ডের একদম নীচে থেকে যাওয়া লেজের হাড় (Coccyx) আমাদের কোনো কাজেই আসে না। আমাদের আদি প্রাইমেট পূর্বপুরুষেরা গাছের ডালে ঝুলে ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে একে ব্যবহার করত।
- ❖ **আক্কেল দাঁত** : পাথুরে অস্ত্রপাতি আর আগুনের ব্যবহার জানার আগে মানুষ মূলত নিরামিষাশী ছিলো। আক্কেল দাঁত তখন কিছুটা কাজে লাগলেও এখন আর লাগে না।
- ❖ **এপেন্ডিক্স** : এপেন্ডিক্স মানুষের কোন কাজে আসে না, বরং এপেন্ডিসাইটিস নামের রোগের উৎস এটি।
- ❖ **গায়ের লোম** : মানুষকে অনেক সময় 'নগ্ন বাঁদর' বা 'নেকেড এপ' নামে সম্বোধন করা হয়। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে লোমশ শরীরের অস্তিত্ব দেখা যায় এখনো। আমরা লোমশ প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই আলামত এখনো রয়ে গেছে।
- ❖ **গুজ বাম্প** : শীতে বা ভয়ে আমাদের শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন আমাদের দেহের লোমকূপ ফুলে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের গায়ের কেশর, লোম বা পালক ফুলিয়ে বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় খুঁজত। এই আলামত বিবর্তনের কারণেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে।
- ❖ **কান নাড়ানোর পেশি** : আমাদের দেশের বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা রবিউল তাঁর কান নাড়াতে পারতেন। অনেকেই কান নাড়াতে পেরে অন্যদের মজা দেন। আপনি যদি আপনার কান আপনার ইচ্ছায় নাড়াতে পারেন, তবে আপনার উচিৎ হবে আপনার প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের একটা ধন্যবাদ দেয়া।

❖ **আঁখি আবরণী** : আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ালে আপনার চোখের কোনায় যে উঁচু মাংসপিণ্ড দেখেন তা হচ্ছে আপনার চক্ষু আবরণী বা 'আই লিড'। এটাও আপনার আছে বিবর্তনের প্রত্যক্ষ আলামত হিসেবে।

কোনো মহান 'সৃষ্টিবাদ' কিংবা 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। এ মুহূর্তে এগুলোকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কেবল বিবর্তন তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এপেভিক্স নামের প্রত্যঙ্গটি না থাকলে মানুষের কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এপেভিক্স থাকলে সারা জীবনে অন্তত ৭% সম্ভাবনা থেকে যায় এপেভিসাইটিসে আক্রান্ত হবার। আবার এপেভিক্স এবং সিকাম মানুষের কাজে না লাগলেও তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হজম করার জন্য অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ। প্রাচীন নরবানর যেমন 'অস্ট্রালোপিথেকাস রবাস্টাস'রা তৃণসহ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করত। এখনো শিম্পাঞ্জিরা মাংসভোজী নয়। কিন্তু মানুষ খাদ্যাভাস বদল করে লতাপাতার পাশাপাশি একসময় মাংসভোজী হয়ে পড়ায় দেহস্থিত এই অঙ্গটি ধীরে ধীরে অকেজো এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এখন এপেভিক্স এবং সিকাম আমাদের কাজে না লাগলেও রেখে দিয়ে গেছে আমার এ প্রবন্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'বিবর্তনের সাক্ষ্য'! ঠিক একইভাবে তিমির বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ হচ্ছে পেছনের পায়ের হাড়গুলো, যেগুলো খুব পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দেয় যে এরা একসময় 'আর্টিওডাক্টিলা' (হিপোপটেমাসের মত এক ধরনের স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী) হতে বিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের জননতন্ত্র প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে অনেক সময়ই নিষিক্ত স্পার্ম ইউটেরাসের বদলে অবাঞ্ছিতভাবে ফ্যালোপিয়ান টিউব, সার্ভিক্স বা ওভারিতে গর্ভসঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাপারটিকে বলে 'একটোপিক প্রেগন্যান্সি'। ওভারি এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অতিরিক্ত একটি গহ্বর থাকার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এটি মানবদেহে 'ব্যাড ডিজাইনের' চমৎকার একটি উদাহরণ। আগেকার দিনে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিশুসহ মায়ের জীবন সংশয় দেখা দিত। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগেই গর্ভপাত ঘটিয়ে মায়ের জীবনহানির আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে তোলা গেছে। মানুষের ডিএনএ'তে 'জাস্ক ডিএনএ' নামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা আমাদের আসলে কোন কাজেই লাগে না। ডিস্টফিন জিনগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, সময় সময় মানবদেহে ক্ষতিকর 'মিউটেশন' ঘটায়। ডিএনএ'র বিশৃঙ্খলা 'হান্টিংটন ডিজিজের'-এর মত বংশগত রোগের সৃষ্টি করে। আমাদের গলায় খাদ্যনালী বা ফ্যারিংস এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে একটু অসাবধান হলেই শ্বাসনালীতে খাবার আটকে আমরা 'চোক' করি। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তাঁর সাম্প্রতিক '*Greatest Show on Earth*' এবং জেরি কয়েন তাঁর '*Why Evolution is True*' বইয়ে এ ধরনের 'ব্যাড ডিজাইনের' বহু দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন। বিবর্তন তত্ত্ব ছাড়া এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই, কারণ ডিজাইন মানতে গেলে বলতেই হবে যে ওগুলো ভুল ডিজাইন। কারণ কোনো অঙ্গ বা উপাঙ্গের উপযোগিতা আছে কি নেই এটা বের করার সহজ পদ্ধতি হল

এই অঙ্গ বা উপাঙ্গটি ছাড়া কারো বেঁচে থাকতে বা চলতে-ফিরতে বা স্বাভাবিক জীবন কাটাতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে কী-না, কিংবা অঙ্গ-উপাঙ্গটির অনুপস্থিতিতে কারো 'সারভাইভাল ভ্যালু' হ্রাস পাচ্ছে কী-না। যদি না পায়, তা হলে বুঝতে হবে এই অঙ্গ বা উপাঙ্গটির কোনো বাড়তি উপযোগিতা নেই। জেনে রাখা ভাল, এপেভিক্স নামক উপাঙ্গটি মানুষের হাত-পায়ের সাথে তুলনীয় নয়। কারণ মানুষের দুটি হাত বা পা কাটা গেলেও অনেক সময় মানুষ বেঁচে থাকে। কিন্তু হাত-পায়ের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। মারা যদি নাও যায়, হাত-পা কাটা পড়লে স্বাভাবিক চলৎশক্তি অনেকাংশেই ব্যাহত হয়। আবার হাত-পা থাকার ফলে কারো এপেভিসাইটিসের মত প্রদাহ তৈরি হয় না কিংবা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয় না। তাই হাত বা পায়ের সাথে এপেভিক্সের তুলনা হয় না।

মধ্যবর্তী বা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল নিয়ে টানাটানি

ধর্মবাদীরা প্রায়ই বিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, বিবর্তন তত্ত্ব এখনো কোনো জীবের ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের অস্তিত্ব উপস্থাপন করতে পারেনি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণই অসাড় এবং মিথ্যা। যদিও ফসিল সংখ্যায় পাওয়া গেছে তুলনামূলকভাবে কম; এবং এটি প্রত্যাশিতই, কারণ পাললিক শিলা ছাড়া আর কোনো শিলায় ফসিল তৈরি হতে পারে না, আর যাওবা পাললিক শিলার মধ্যে কোনো ফসিল তৈরি হয়, অধিকাংশ সময়ই তা থেকে যায় মানুষের অগোচরে। আবার পাললিক শিলার মধ্যে সংরক্ষিত ফসিল এমনভাবে বেশিরভাগ সময় মিশে যায় (চাপ, তাপ ইত্যাদি কারণে) যে সেখান থেকে জীবাশ্মের অংশবিশেষও উদ্ধার করা ফসিল-বিজ্ঞানীদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপরও যা পাওয়া গেছে, তা দু-একটিও নয়, তুচ্ছও নয়। ঘোড়া, হাতি এবং উটের বিবর্তনের পুঞ্জানুপুঞ্জ ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, পাওয়া গেছে 'মিসিং লিঙ্ক' বলে কথিত দুটি ফাইলা বা অন্যান্য ট্যাক্সার বৈশিষ্টসমৃদ্ধ মধ্যবর্তী বা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল; যেমন সেরীস্প থেকে স্তন্যপায়ী জীবে বিবর্তনের সম্পূর্ণ ধাপগুলো এখন খুব ভালোভাবে ডকুমেন্টেড। (দেখুন : Doglas J. Futuyma, *Evolution*, pp 76)। Synapsids, Therapsida, Cynodonta থেকে শুরু করে আদি স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত সবগুলো ধাপের একাধিক ফসিল পাওয়া গেছে। এমনকি তাদের চোয়াল কিভাবে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়েছে সেগুলোও ফসিল থেকে উদ্ধার করা গেছে। ড. ফুতুয়ামা (যিনি মূলত স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের উপরেই সারাজীবন গবেষণা করেছেন) তাঁর বইয়ে বলেন : "The fossil record thus shows that most mammalian characters (e.g. posture, tooth differentiation, skull changes associated with jaw musculature secondary palate, reduction of elements that became middle ear bones) evolved gradually. Evolution was mosaic, with different characters advancing at different rates. No new bones were evolved: all the bones of mammals are modified from those of the stem group of "reptiles" (and in turn from those of amphibians and even lobe-finned fishes). Some major changes in the form of structures are associated with changes in their function. The most striking example is the articular and quadrate bones,

which serves for jaw articulation in all other terapods, but became the sound-transmitting middle ear bones of mammals.”

ঠিক তেমনিভাবে সরীসৃপ থেকে কিভাবে পাখি বিবর্তিত হয়েছে তারও প্রায় সম্পূর্ণ ধাপগুলো পাওয়া গেছে; যেমন Eoraptor, Herrerasaurus, Ceratosaurus, Allosaurus, Compsognathus, Sinosauropteryx, Protarchaeopteryx, Caudipteryx, Velociraptor, Sinovenator, Beipiaosaurus, Sinornithosaurus, Microraptor, Archaeopteryx, Rahonavis, Confuciusornis, Sinornis, Patagopteryx, Hesperornis, Apsaravis, Ichthyornis, Columba ইত্যাদির ফসিল। এর মধ্যে আর্কিওপটেরিক্সের (Archaeopteryx) পাওয়া গেছে গুপ্তখানেক ফসিল। এ প্রাণীটির ফসিলের মধ্যে পাখির মত পাখা, পালক, নখর ও দাঁত কিন্তু গিরগিটির মত কংকাল দেখে ফসিল-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটি সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী প্রাণী। ১৮৬১ সালে জার্মানির ল্যাংগেনালথিমে (পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত; The London Specimen), ১৮৭৭ সালে ব্লুমেনবার্গে (Berlin Specimen), ১৯৫৮ সালে ল্যাংগেনালথিমে, ১৮৫৫ সালে রিডিনবার্গে, ১৯৫১ সালে ওয়াকারসজেলে, ১৯৬০ সালে জার্মানির ইৎসচাটে, ১৯৯১ সালে ল্যাংগেনালথিমে, ২০০৫ এবং ২০০৬ এ জার্মানিতে আর্কিওপটেরিক্সের বিভিন্ন ফসিল উদ্ধার করা

চিত্র : চীনে পাওয়া 'ডানা বিশিষ্ট ডায়নোসরের' (Feathered Dinosaur) ফসিল :
মাইক্রোর্যাপটর গুই। উৎস : http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaurs

হয়েছে। চীনে (লিয়াওনিং) গত কয়েক বছরে এ ধরনের 'ডানা বিশিষ্ট ডায়নোসরের' ফসিল পাওয়া গেছে প্রচুর। এর অনেকেগুলোই একেবারে সম্পূর্ণ ফসিল; যেমন আর্কিওপটেরিক্সের (বার্লিন স্পেসিমেন) কিংবা চীনে সম্প্রতি পাওয়া চার ডানা বিশিষ্ট মাইক্রোর্যাপটর গুইয়ের ফসিল দেখলেই বোঝা যায় যে এগুলোতে হাড়গোড়ের ছাঁচ থেকে শুরু করে পালক-বিশিষ্ট পাখা সবকিছুই এত স্পষ্ট যে এ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় অজ্ঞ মানুষজনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যেও মধ্যবর্তী পর্যায়ের বহু নির্দর্শন রয়েছে; যেমন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায় প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও 'সরীসৃপের মত' ডিম পাড়ে। আবার মাছ এবং উভচর প্রাণীর 'মধ্যবর্তী ফসিলের' উদাহরণ তো আছেই সিলাকাছ এবং লাং ফিশ। সিলাকাছের একটি প্রজাতি জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে মাদাগাস্কার উপকূল এলাকায় ১৯৩৮ সালে। এর মধ্যে মাছ এবং উভচর প্রাণীর বিবর্তনের



এতগুলো মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যে একে 'জীবন্ত ফসিল'ই বলা চলে। এছাড়া সম্প্রতি

পাওয়া গেছে মাছ থেকে চতুষ্পদী প্রাণীতে বিবর্তনের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী টিষ্টালিকের ফসিল। পাওয়া গেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে তিমির বিবর্তনের মাঝামাঝি ধাপগুলোর (Pakicetus inachus, Ambulocetus natans, Indocetus ramani, Dorudon, Basilosaurus) অসংখ্য ফসিল। সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের মাঝামাঝি জায়গার এত ফসিল এত অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গেছে যে বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়ে যান যে এগুলোকে 'ম্যামেলরুপী রেপ্টাইল' বলবেন না-কী 'রেপ্টাইলরুপী ম্যামেল' বলবেন?

নরবানর (এপ) এবং মানুষের মধ্যবর্তী হারানো সূত্রের জীবাশ্মও কয়েক দশক আগে খুব ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত জার্মান জীববিজ্ঞানী ও বিবর্তনবাদী আর্নেস্ট হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯) ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই 'সৃষ্টির ইতিহাস' (The History of Creation)-এ মন্তব্য করেছিলেন যে মানব বিবর্তনের ধারা যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল শীর্ষগিরই পাওয়া যাবে। প্রাণ ফসিল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আজ বলা যায়, Australopithecus এবং Homo-এর কয়েকটি প্রজাতিক (যেমন Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus) 'মানুষের বিবর্তন'-এর হারানো সূত্র বলা যেতেই পারে। আমাদের জনপ্রিয় ফসিল 'লুসি' Australopithecus afarensis প্রজাতির অন্তর্গত। শোণিত্রক ও উরুর হাড়ের গঠন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, লুসি সোজা হয়ে দাঁড়াতে আর দৌড়াতে পারত। আর লুসির তো কেবল এই দুই জায়গার হাড় নয়, সেই সাথে পাওয়া গেছে চোয়াল, উরু, হাত, বাহু, বক্ষপিঞ্জরসহ পুরো করোটি। লুসির জীবাশ্মটি আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডোনাল্ড জোহানসন ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ার হাড়ার এলাকা থেকে। পরে এ ধরনের আরো অনেক 'লুসির' সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে তাঞ্জানিয়ার লাটেওলি এবং ১৯৯৫ সালে চাদের করোটোরো থেকে। এমনকি লুসির চেয়েও পুরানো 'দ্বিপদী মানুষের' ফসিল পাওয়া গেছে ২০০৫ সালে। এদের সবাইকেই 'নরবানর' আর মানুষের মধ্যবর্তী 'হারানো যোগসূত্র' হিসেবে ধরা হয় কারণ, এদের করোটির গঠন ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জির মত (৪০০-৫০০ ঘন সি. সি.), কিন্তু তাদের দাঁতের গঠন ছিল আধুনিক মানুষের মত। আর তাছাড়া এরা যে দুই পায়ের উপর ভর করে খাড়া হয়ে চলতে পারত তা তো আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া এদের শরীরের সাথে বাহুর অনুপাত মেপে দেখা গেছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭১.৮, শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে ৯৭.৮, আর লুসির ক্ষেত্রে ৮৪.৬, অর্থাৎ লুসির অবস্থান এ দুই প্রজাতির মাঝামাঝি।

লুসির বয়স ছিল ৩৩ লক্ষ বছর। এই বছরের (২০০৯) ১লা অক্টোবর ৪৪ লক্ষ বছর বয়সী আর্ডিপথেকাস র্যামিডাস (আর্ডি)-এর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ফসিল বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, আর্ডি দুই পায়ের উপর ভর করে খুব কম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, আবার গাছে-গাছে আনাড়িভাবে ঝোলাঝুলি করতে পারে। আর্ডির এ ধরনের আরো অনেক বৈশিষ্ট্যই মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি। এদের ইচ্ছে

করলেই ‘শিম্পানুস’ নামে অভিহিত করা যায়; যেমন মানুষের উপরের চোয়ালে দুটি এবং নীচের চোয়ালে দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত আছে যেগুলোকে শ্বদন্ত বলে। শ্বদন্ত আছে শিম্পাঞ্জিরও। কিন্তু শিম্পাঞ্জির শ্বদন্তটা মানুষের চেয়েও তীক্ষ্ণ ও ধারালো। সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর যত দিন গেছে, মানুষের শ্বদন্ত দিন-দিন ভোঁতা হয়েছে, কারণ মানুষের আর তো এখন শিম্পাঞ্জির মত নারী-খাদ্য-জমি নিয়ে অযথা ‘কামড়া-কামড়ি’ করতে হয় না। আর কামড়া-কামড়ি যদি কখনো বা করতেই হয়, মানুষ করে তার তৈরি অস্ত্রের সাহায্যে, শ্বদন্ত দিয়ে নয়। কাজেই শ্বদন্তের আদি প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। এখন আর্ডির শ্বদন্ত কেমন? শ্বদন্ত ছিলো শিম্পাঞ্জি আর মানুষের একেবারে মাঝামাঝি। এছাড়া আর্ডির পায়ের সাথে মানুষের পায়ের বেশি মিল থাকলেও আর্ডির হাত ছিলো শিম্পাঞ্জির মতো। লুসির পর আর্ডি আমাদের পূর্বপুরুষদের ‘মিসিং লিঙ্ক’ উদ্ঘাটনে এক বিশাল মাইল ফলক। তবে এ নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, আর্ডির ফসিল কিন্তু ‘মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত’ পূর্বের দুইটি হাইপোথিসিস মোটামুটি বাতিল করে দিচ্ছে বলা যায়। একটি হল ‘সভানা হাইপোথিসিস’, যেটা থেকে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন এক সময় বনজঙ্গল কমে সমভূমিতে পরিণত হওয়ায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে নিজেদের দ্বিপদী বা বাইপেডাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আর্ডির ফসিলের সাথে সে সময়কার উদ্ভিদের যেসব ফসিল পাওয়া গেছে তা ‘সভানা হাইপোথিসিসের’ বিপরীতে যায় বলে মনে হচ্ছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, আমরা এতদিন ভাবতাম আমাদের পূর্বপুরুষের সাথে শিম্পাঞ্জিদের মিল আছে, ওরাই আমাদের ‘কমন এল্গেস্টর’। কিন্তু আর্ডির ফসিল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যদিও তার অনেক বৈশিষ্ট্যই শিম্পাঞ্জি আর মানুষের, কিন্তু তারপরেও আর্ডির পূর্বপুরুষ সম্ভবত (সরাসরি) শিম্পাঞ্জি জাতীয় কিছু নয়, বরং তার বৈশিষ্ট্য পুরানো পৃথিবীর বানরের অনেক বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলে।

আর্ডির চেয়েও পুরানো একটি ফসিলের সন্ধান অনেক আগেই পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা যার নামকরণ করা হয়েছে ‘আর্ডিপিথিকাস কাডাব্বা’। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ফসিলের কেবল দাঁত আর কঙ্কালের কিছু হাড় পাওয়া গেছে। তাই বিজ্ঞানীরা আরো তথ্য প্রমাণের অপেক্ষায় আছেন, এখনো একে ‘আর্লিয়েস্ট হোমিনিড’ বলছেন না। যদি আমার অনুমান ভুল না হয়, তবে ‘আর্ডিপিথিকাস কাডাব্বা’র থেকেই আমরা জানতে পারবো আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস, কারণ এই ফসিলটি হচ্ছে সেই ‘মানুষের’ যার বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছিল শিম্পাঞ্জির Common Ancestor থেকে (যদি আসলেই তা হয়ে থাকে) আলাদা হয়ে যাবার ঠিক পরে (প্রায় ৬ মিলিয়ন)। আশা করা যাচ্ছে এখন থেকেই বেরিয়ে আসবে বহু আলামত। আর্ডি সম্ভবত আরো পরের একটি ধাপ (যখন আমরা অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ মানুষের দিকে), আর লুসি তারও পরের।

মানুষের অন্য প্রজাতিরও ফসিল পাওয়া গেছে অনেক; যেমন নিয়াভার্থাল। ১৮৬৬ সালে ফুলরট যখন প্রথম নিয়াভার্থাল মানুষের ফসিল খুঁজে পেলেন ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে চুনের এক খনি থেকে, তখন অনেকেই তা যে মানুষের জীবাশ্ম তা মানতে রাজি ছিলেন না। যেমন ড. ওয়াগনার বলেছিলেন, এটি কোনো জীবাশ্ম নয়, বরং এক বৃদ্ধ ওলন্দাজের করোটি। বন নগরের ড. মেয়র বলেছিলেন এটি নেপোলিয়নের পেছনে ধাওয়া করা এক কসাক সৈন্যের করোটি। প্রনার-বে বলেছিলেন এটি সেন্টদের একটি খুলি। এমনকি রুডল্ফ ফিরকোর (Rudolf Virchow) মত খ্যাতিমান বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন এটি কোনো রিকেট রোগাক্রান্ত লোকের বিকৃত মাথার খুলি হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে এই জীবাশ্মটি মানুষেরই এক অন্য প্রজাতি, এবং এর নামকরণ করা হয় : Homo sapiens neanderthalensis বা চলতি ভাষায় নিয়াভার্থাল মানব। পরে এই নিয়াভার্থাল প্রজাতির আরো ফসিল পাওয়া যায় ফ্রান্সের লি মোস্টিয়া, লা ফেড়াসি, লা কুইনা, জিব্রাল্টারে; ইতালির মন্তে সিরসিয়ো ও সাগোপেস্তারে; ইরাকের শানিদারে, ইউক্রেনের কিইক-কোবাতে, ক্রোয়েশিয়ার ক্রাপিনাতে, জার্মানির এহরেনডারফে, ইসরাইলের তাবুন, আমুদ এবং কেবারা’তে। এছাড়া ইউরোপ এবং এশিয়ার বাইরে আরো অনেক স্থানেই এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সময় পাওয়া গেছে জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ, রামাপিথেকাস, টাউং শিশু (Australopithecus africanus), ওমানো মানুষ, নগালোবা মানুষ, জেবেল কাফজেহ, ভেরটেচজলেসচাস মানুষ, পেটালোনা মানুষ, টাউটাভেল মানুষ, সোয়ানকম মানুষ, স্টেইনহেম মানুষসহ অসংখ্য ফসিল।

উইকিপিডিয়ার পেইজেও ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল বা মর্ধ্যবর্তী ফসিলের একটি ভালো তালিকা আছে; দেখুন: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transitional_fossils। কোন প্রজাতির কয়টি ফসিল পাওয়া গেল এটি আজ কোনো প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন হল একটি ফসিলও কী এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা বিবর্তনের ধারাকে লংঘন করে? এর সোজা উত্তর না, এখন পর্যন্ত একটিও এরকম ফসিল পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হ্যালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিভাবে বিবর্তন তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হ্যালডেন বলেছিলেন : I will give up my belief in evolution if someone finds a fossil rabbit in the Precambrian.

বলা বাহুল্য এ ধরনের কোনো ফসিলই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হল : মাছ-> উভচর-> সরীসৃপ-> স্তন্যপায়ী প্রাণী।

খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এতে সময় লেগেছে বিস্তর। প্রিক্যাম্বিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ সময়

(প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরম প্রাণ; যেমন নীলাভ-সবুজ শৈবাল, সায়নোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে। আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে ট্রায়োসিক যুগে (প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রিক্যাম্বরিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে-সাথেই বিবর্তন তত্ত্বকে নস্যাত্য করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সৃষ্টিবাদীদের জন্য দুর্ভাগ্য এখনও তেমন কোনো ফসিল পাওয়া যায়নি।

শুধু খরগোশ নয়, বিবর্তনের ধারাটি সকল জীবের জন্যই একইভাবে প্রযোজ্য; যেমন বিবর্তন-তাত্ত্বিকদের মতে বিবর্তনের ধারায় মানুষ যেহেতু এসেছে অনেক পরে (সিনোয়োসিক যুগের আগে নয়), তাই তার আগে যেমন ডায়নোসরের ফসিলের সাথে একই বয়সী কোনো মানুষের ফসিল পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। সবচেয়ে পুরানো খাড়া হয়ে হাঁটা মানুষের ফসিল ইথিওপিয়ায় পাওয়া গেছে যা ৪০ লক্ষ বছরের পুরানো। আর ডায়নোসরেরা প্রবল প্রতাপে এ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে সেই জুরাসিক যুগে (১৪ কোটি থেকে ২০ কোটি বছর আগে)। ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে ক্রেটাসিয়াস যুগে (এখন থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে)। সৃষ্টিবাদীরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি করে ডায়নোসরের আমলে ‘মানুষের ফসিল’ খুঁজে পাওয়ার রব তুললেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা (রেডিও আইসোটোপ টেস্ট, ডিএনএ টেস্ট ইত্যাদি) পর সেগুলোর একটিও ধোপে টিকেনি। তাই প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন : “And - far more telling—not a single authentic fossil has ever been found in the “wrong” place in the evolutionary sequence. Such an anachronistic fossil, if one were ever unearthed, would blow evolution out of the water.” (One side can be wrong, Richard Dawkins and Jerry Coyne, The Guardian, Thursday 1, September 2005)।

শুধু ফসিল নয়, জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোনো সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

অর্ধবিকশিত বা অসম্পূর্ণ অঙ্গ

বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পর থেকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবজগতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অভিযোজন ঘটে চলছে। পৃথিবীর কোনো প্রজাতির প্রাণীই স্থির নয়, ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে ধর্মবাদীরা বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে বলে থাকেন, ‘তাহলে তো পৃথিবীতে বহু প্রজাতির প্রাণী পাওয়ার কথা যারা অর্ধবিকশিত, কিংবা প্রাণীদের কিছুকিছু শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্ধবিকশিত বা অসম্পূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিতে কোন জীবের এরকম অর্ধবিকশিত, ক্রটিপূর্ণ অঙ্গ-উপাঙ্গ দেখা যায় না।’

বিবর্তনবিরোধীদের এ রকম ধারণা ভ্রান্ত। চোখের কথাই ধরি। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকম এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আসলে বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী, জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশিত হতে হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীণতার বা দূরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দূরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিমকালের মত বন্যজীবন যাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী বা শিকারি পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে বনে বাঘ নেই, সে বনে যেমন শিয়াল রাজা, তেমনি যে জায়গায় সবাই কানা সেখানে একচোখা রাতকানা বর্ণাঙ্করাও রাজা হয়ে বাড়তি সুবিধা ভোগ করবে। কাজেই যে জনসমষ্টির মধ্যে কোনো দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের উদ্ভব বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রাণীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছুটা হলেও তার শিকারির গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণীটির বেঁচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভূমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রাণী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যাঙ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রাণীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রাণীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত এক ধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায়, যা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনো গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাঁচাতে পারবে যা কী-না তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে। বিবর্তনের ওপর ইন্টারনেট জগতের বিখ্যাত ওয়েব সাইট ‘টক অরিজিন’-এর দুটি লিঙ্কে (১.

http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB921_1.html ২.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB921_2.html) — অর্ধবিকশিত বা
অসম্পূর্ণ অঙ্গ নিয়ে কিছু ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

জিরাফের লম্বা গলা কেন?

অনেকের ভিতর এই ধরনের প্রশ্ন উদিত হয়, জিরাফের গলাটা এত লম্বা হলো, আমারটা কি দোষ করল? পাখির এত সুন্দর ডানা আছে, আমার পিঠে ডানা নেই কেন? কুকুর এত দূর থেকে গন্ধ শুঁকে খাবার খুঁজে পায়, ঈগল এত উপর থেকেও দেখতে পায় কোনো জায়গায় খাবার আছে আর আমাদের চোখের দৃষ্টিসীমা এত কম কেন?

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমাদের চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে ফরাসি প্রকৃতিবিজ্ঞানী জঁয়া ব্যাপতিস্তে ল্যামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) বিবর্তন সম্পর্কিত বক্তব্যের পার্থক্য বোঝাতে হবে।

ডারউইনের সময় পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কিভাবে কাজ করে কিংবা কিভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিলো না। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ল্যামার্ক বিবর্তন সম্পর্কিত চারটি অনুকল্প প্রদান করেন; এর মধ্যে একটি অনুকল্পকে সংক্ষিপ্তরূপে এভাবে বলা যায়, প্রাণীর অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো শ্রেফ পরিবেশের ফল। জীবের যে অঙ্গগুলো তার জীবনে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আরও উন্নত হতে থাকে, আর যেগুলোর বেশি ব্যবহার হয় না সেগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় বা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ল্যামার্ক জিরাফের লম্বা গলা হওয়ার পিছনে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন; সেটি হল : “লম্বা লম্বা গাছের ডগা থেকে কাঁচি পাতা খাওয়ার জন্য কসরত করতে করতে বহু প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গিয়েছে।” অর্থাৎ ল্যামার্কের বক্তব্যের মূল কথা ছিল অভিযোজনের কারণ হল পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেহের অঙ্গসমূহের পরিবর্তন ঘটা। ল্যামার্ক আরও বললেন যে, একটি জীব তার জীবদ্দশায় ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে সেগুলো তার পরবর্তী প্রজন্মে বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। ল্যামার্কের এই বক্তব্যটি বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বরং ডারউইন ঠিকই বলেছেন : “কোন অঙ্গের ব্যবহার-অব্যবহারের উপর নির্ভর করে জীবের বিবর্তন ঘটে না, প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বংশগতভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায় তারাই দায়ী।” অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আপনার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার দেহে পাননি, তার উপর বিবর্তন কাজ করতে পারে না। সেজন্যই মানুষ যতই চেষ্টা করুক কিংবা হাজার কসরত করুক তার পিঠের হাড় পরিবর্তিত হয়ে পাখায় রূপান্তরিত হয়ে যায় না। আমার পায়ে জুতা পড়তে পড়তে ঠুঁসা গজালে, আমার বাচ্চার পায়েও ঠুঁসা গজায় না। উনিশ শতকের শেষ দিকেই বিবর্তন সম্পর্কিত ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে জার্মান বিজ্ঞানী ভাইজম্যানের পরীক্ষায়। জীববিদ আগস্ট ভাইজম্যান একবার জন্মের সাথে সাথে সাদা রঙের ছোট

জাতের ইঁদুর ছানার লেজ কেটে দিয়ে বাইশটি প্রজন্মে সদ্য-ভূমিষ্ট ছানার লেজের দৈর্ঘ্য ছোট হয় কি-না তা মেপে দেখলেন। দেখা গেল সদ্যভূমিষ্ট ছানার লেজের দৈর্ঘ্য কমেনি বা বাড়েনি। এ পরীক্ষা থেকে ভাইজম্যান পরিষ্কারভাবে দেখালেন, জীবদেহে পরিবেশ দ্বারা উৎপন্ন প্রভাব বংশানুসৃত হয় না। এভাবে তিনি ল্যামার্কবাদের মূল-ভিত্তিটি ধ্বংস করে দেন। ভাইজম্যানের পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন বিজ্ঞানী বস এবং শেফার্ডস। তারাও যথাক্রমে ইঁদুর এবং কুকুরের কান কেটে পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন। বস ও শেফার্ডস বিজ্ঞানীদ্বয়ও একই রকম ফলাফল পেয়েছিলেন। এরকম পরীক্ষা কিন্তু মানুষ বহুকাল ধরেই করে এসেছে; যেমন ডোবারম্যান কুকুরের লেজ কেটে ফেলা, ইহুদি এবং মুসলমান বালকদের খৎনা করা, চীনদেশে একসময় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের পা ছোট রাখার জন্য লোহার জুতো পড়ানো, অনেক আফ্রিকান দেশে মেয়েদের খৎনা করা ফেলা, উপমহাদেশে মেয়েদের নাকে এবং কানে ছিদ্র করা ইত্যাদি। কিন্তু এর ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আকাজক্ষিত লক্ষণটির আবির্ভাব হয়নি। ল্যামার্কের অনুকল্প ঠিক হলে তাই ঘটার কথা ছিলো। আসলে বিবর্তন হয় ডারউইন বর্ণিত প্রক্রিয়ায়, ল্যামার্ক যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেভাবে কখনো নয়।

উঁচু ডাল থেকে পাতা খেতে গিয়ে গলা লম্বা হয়ে যায়নি, কিংবা কোটি বছরব্যাপী ক্রমাগত প্রচেষ্টার পর হরিণদের গলা লম্বা হয়ে জিরাফ হয়নি; মেডেলীয় বংশগতিবিদ্যা এবং ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী মিউটেশন এবং জেনেটিক রিকম্বিনেশনের কারণে কোনো জনপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণ প্রকারণ (variation) থাকে। অর্থাৎ লম্বা-মাঝারি-বেঁটে গলার প্রকারণসমৃদ্ধ জেনেটিক ট্রেইট হয়তো আদি জিরাফ-সদৃশ জনপুঞ্জে ছিল। পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে বা অন্য কোনো কারণে এই লম্বা গলার ট্রেইটওয়ালারা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে (যেমন খাদ্যাভাবের সময় উঁচু গাছের লতাপাতার নাগাল পাওয়া), এবং তারা অধিকহারে বংশবৃদ্ধি করে লম্বা গলার বৈশিষ্ট্যকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে টিকিয়ে রেখেছে; সেই সুবিধা ছোট বা মাঝারি গলার ট্রেইটওয়ালারা আদি জিরাফ-সদৃশরা পায়নি, ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এরা টিকে থাকতে পারেনি, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন-চাহিদা-ক্রমাগত প্রচেষ্টা-অর্জিত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই। বলা যায় বিবর্তন কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে না, কাজ করে অনেকটা ‘ব্লাইন্ড ওয়াচমেকারের’ মত।

সাগর বাহুরদের পানির নীচের মাছগুলো অত অপরূপ রঙিন কেন?

আমরা সবাই ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকোভারি কিংবা এ্যানিমেল প্লেনেট টিভি চ্যানেলে সাগর তলের বাহুরদের নীচের মনপাগল করা রঙিন মাছ কমবেশি দেখেছি। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কোন কাজে লাগে এমন রং? বরং এ রঙ তো মাছের জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ানোর কথা, কারণ অপেক্ষাকৃত বড় রান্নুসে মাছগুলো এই রঙিন

মাছদের সহজেই সনাক্ত করে শিকার করে ফেলবে। তাতে রঙিন মাছদের বংশ পরম্পরায় টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিবর্তন কোনো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে না। কাজেই কোনো কিছু 'জন্য' বা কোন 'উদ্দেশ্য' সামনে রেখে মাছদের এমন মন মাতাল করা রং হয়নি। বিবর্তনের দৃষ্টিতে এভাবে 'উদ্দেশ্য' সামনে রেখে ভাবটাই আসলে ভুল। সঠিক প্রশ্নটি হতে পারে, মাছের গায়ের রঙ কি তাদের টিকে থাকার পেছনে কোন বাড়তি উপযোগিতা দিয়েছিলো? উত্তর হচ্ছে, বিবর্তনের সবকিছুই যে অভিযোজন কিংবা 'বাড়তি উপযোগিতা' নির্ভর তা কিন্তু নয়। বহু কিছু উদ্ভূত হয়েছে অন্য অনেক কিছুর অভিযোজনের 'বাই প্রোডাক্ট' হিসেবে, কিংবা 'র্যান্ডম ড্রিফট'-এর ফসল হিসেবে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের হাড়ের যে সাদা রঙ এটাকে অভিযোজন বা এডাপ্টেশন দিয়ে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। কারণ অভিযোজনের দিক দিয়ে হাড়ের সাদা রঙের কোন বাড়তি মূল্য নেই। আমাদের হাড় যে ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি তার ফলে 'বাই প্রোডাক্ট' হিসেবে এই সাদা রং তৈরি হয়েছে। আমাদের মানুষদের গায়ের রং-ও কিন্তু ভিন্ন হয়। চুলের রঙ কারো সাদা, কারো কালো, কারো বা বাদামি। চোখের মণি কারো, কারো নীল, কারো কটা, কারো সবুজ। হয়ত এগুলো কোনটারই অভিযোজিত সুবিধার জন্য হয়নি। হয়েছে অন্য কোন কারণের উপজাত হিসেবে। মানুষের শরীরের সাদা হাড় কিংবা চোখের মণির বিভিন্ন রঙের মত মাছের রঙও 'বাই প্রোডাক্ট' হিসেবে তৈরি হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়।

এখন কথা হচ্ছে এই রঙ-বেরঙের ব্যাপারটা তো মাছদের ক্ষেত্রে হুমকি হবার কথা। শিকারি মাছের চোখে পড়ে যাওয়ার কথা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো হয়ই। কিন্তু তারপরও কেন রঙ-বেরঙের মাছগুলো টিকে থাকল এর ভাল ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে আছে; যেমন উগান্ডা, কেনিয়া এবং তাজ্জিনিয়ার চারিদিকে পরিবেষ্টিত ভিক্টোরিয়ান হ্রদে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন লাল-কমলা ইত্যাদি গাঢ় রঙের মাছগুলো মূলত থাকে হ্রদের নীচের দিকে কারণ লাল রঙের আলো নীলচে আলোর চেয়ে হ্রদের অনেক বেশি গভীরে যায়। সাদা, সবুজ আর হালকা রঙের মাছগুলো থাকে পানির উপর দিকে। এভাবেই রঙের তারতম্য এবং পানির গভীরতাকে কাজে লাগিয়ে তারা শিকারীদের চোখ এড়িয়ে টিকে থাকে। ভিক্টোরিয়ান হ্রদে রঙের এই তারতম্যকে পুঞ্জি করে পৃথক প্রজাতিই তৈরি করে ফেলেছে মাছেরা। দেখুন :

<http://www.newsdesk.umd.edu/scitech/release.cfm?ArticleID=1752>



ছবি : ক্লাউন মাছ আর এনিমোনের সহবিবর্তন

আবার অনেক মাছই কিন্তু গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে সামুদ্রিক গাছপালা আর পরিবেশ বাছাই করে সহ-বিবর্তন বা Coevolution গড়ে তুলে নিজেদের টিকিয়ে রাখে। এমনি একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে 'রঙিন ক্লাউন' মাছের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন। এ ধরনের মাছ তার গাঢ় রঙের কারণে সহজেই অন্যের শিকারে পরিণত হতে পারে, তাই আত্মরক্ষার জন্য গাঢ় রঙের সামুদ্রিক এনিমোনের শূঁড়ের ভিতর প্রায়ই আত্মগোপন করে। এভাবে ক্লাউন মাছগুলো শিকারি মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে এনিমোনগুলোও ক্লাউন মাছের কারণে উপকৃত হয়। কারণ ক্লাউন মাছগুলো এনিমোনভোগী ছোট মাছকে তাড়িয়ে দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই ক্লাউন মাছগুলো গায়ের রঙকে কাজে লাগিয়েই সহবিবর্তনের মাধ্যমে শিকারি মাছদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলেছে।

বিবর্তন মানে কি কেবল মারামারি-কাটাকাটি?

বিবর্তনবিরোধী বা বিবর্তন সম্পর্কে অজ্ঞ বেশিরভাগই মনে করেন : “বিবর্তন মানে হচ্ছে প্রতিটি জীব তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। প্রকৃতিতে 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। প্রকৃতির রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে না বরং সর্বত্র অনেকটা শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা রয়েছে।”

এক কথায় বলে নেওয়া যায়, বিবর্তন মানে কেবল মারামারি-কাটাকাটি বোঝায় না কিংবা বোঝায় না দুর্বলের ওপর সবলের অবস্থান। বিবর্তন সম্পর্কে পড়াশোনার অভাবের কারণে অনেকেই বিবর্তনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যটুকু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। প্রকৃতিতে অবশ্যই প্রতিযোগিতা আছে, ভালোমতই আছে। কিন্তু একে স্রেফ মারামারি-কাটাকাটি বা 'জোর যার মুল্লুক তার' দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা একেবারেই বালখিল্য। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ে প্রজাতিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা

দুয়েকটি উদাহরণের আলোকে তুলে ধরছি : আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে তার বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একটা পুরোপুরি বড় হওয়া কড মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটা মেপল বা আম বা জাম গাছে হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে কিন্তু এর বেশিরভাগই পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে। আমাদের দেশের ইলিশ মাছের কথাই ধরা যাক। সমুদ্র থেকে নদীগুলোতে এসে তারা কি হারে ডিম পারে আর তাদের মধ্যে কত সংখ্যকই শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়ে টিকে থাকতে পারে? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একটা কড মাছের ডিমের ৯৯%-ই প্রথম মাসেই কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যায়; বাকি ১% যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুবরণ করে। ডারউইনও তাঁর বইয়ে এই একই বিষয় দেখিয়েছেন হাতির বংশবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হাতির বংশবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে খুবই কম; কিন্তু তারপরও একটা হাতি তার জীবনে যে কটি বাচ্চার জন্ম দেয় তার মধ্যে সবগুলি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। ডারউইন হিসেব করে দেখিয়েছেন হাতি অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে; অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতি থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লক্ষ হাতির জন্ম হবে। প্রকৃতিতে প্রায় সব জীবই এরকম বাড়তি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়, হিসেব করে দেখা গেছে এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বংশবৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী আড়াই ফুট উঁচু করে ঢেকে দিতে পারতো। একটা ঝিনুক কিংবা কাছিম একবারে লাখ লাখ ডিম ছাড়ে, একটা অর্কিড প্রায় ১০ লাখ বীজ তৈরি করতে পারে। তবে বর্তমান যুগে প্রকৃতিতে মানুষের টিকে ক্ষেত্রটা একটু ব্যতিক্রম। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ইতিমধ্যে মানুষ প্রকৃতির উপর ছড়ি ঘুরাতে শুরু করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি ঘটান আগে অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র এক-দেড়শো বছর আগেও শিশু মৃত্যুর হার ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে আমরা এখন একদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি এবং অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে শিশু মৃত্যুর হারও কমিয়ে আনতে পেরেছি। তারপরও সীমিত সম্পদের উপর প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা কারো অগোচরে থাকে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে এভাবে সব জীব যদি বংশবৃদ্ধি করতে থাকতো, অর্থাৎ একেকটা জীব তার সারা জীবনে যতগুলো ডিম বা বাচ্চার জন্ম দিতে সক্ষম তার সবগুলো যদি টিকে থাকতো, তাহলে এতদিনে পৃথিবীতে আর কারোরই থাকার ঠাই হতো না। সংখ্যার দিক থেকে যত উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয় বা বেঁচে থাকে তার তুলনায় তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বহু গুণ বেশি। যে কোনো প্রজাতি হঠাৎ করে অনেক বেশি হারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতিও প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্ধ হতে হবে। কারণ তাদের সবার বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের বা অন্যান্য সম্পদের প্রয়োজন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডারউইন এই

বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন, তাহলে প্রকৃতিতে প্রাণের এই বিশাল অপচয় এবং বাড়তি বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটার অবশ্যই কোনো ব্যাখ্যা থাকতে হবে? ডারউইন প্রথমবারের মত বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে এর একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেঁচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয়, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে এক ধরনের নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। তিনি এর নাম দেন 'জীবন-সংগ্রাম' (struggle for survival)। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলতে থাকে একই ধরনের প্রজাতির ভিতরের প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির মধ্যে। আবার প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা প্রকারণের কারণে এই অনন্ত প্রাকৃতিক সংগ্রামে কেউ বা সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়, আর অন্যরা আগেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। সোজা কথায় একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সংগ্রাম করে যারা টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তারাই শুধু পরবর্তী প্রজন্মে বংশধর রেখে যেতে পারে; এবং তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোরই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশি প্রকটভাবে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ যে প্রকারণগুলো তাদের পরিবেশের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযোজনের ক্ষমতা রাখে তাদের বাহক জীবরাই বেশিদিন টিকে থাকে এবং বেশি পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রকৃতি প্রতিটা জীবের মধ্যে পরিবেশগতভাবে অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করতে থাকে এবং ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, আসলে বিবর্তন তত্ত্ব সঠিক বলেই আমরা সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি, এর উল্টোটি নয়।

প্রকৃতির এই প্রতিযোগিতাকে এত খারাপ চোখে দেখারও কিছু নেই। প্রতিযোগিতামূলক জীবন-সংগ্রাম থেকেই তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবিতা কিংবা সহবিবর্তন। শিকারি মাছদের থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউন মাছদের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেহেও বাস করে অনেক উপকারী ব্যাকটেরিয়া। আমাদের দেহে বাস করার ফলে আমরা যেমন এদের দিয়ে উপকৃত হচ্ছি, তেমনি সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোও উপযুক্ত পোষক দেহ পেয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছে। চার্লস ডারউইন নিজেও সহবিবর্তনের অনেক উদাহরণ হাজির করেছিলেন, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি লন্ডনের এক গ্রিনহাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিডে দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা। তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন, 'মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ (প্রজাপতির মত দেখতে হলেও এক রকম নিশাচর পতঙ্গ) জাতীয় কোনো পোকা থাকতেই হবে যাদের গুঁড়ু বা ছল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর গুঁড়ু ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরাগায়ন ঘটাবে।' এবং তাইই হলো; কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ

(*Xanthopan morgani praedicta*)। আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা নিরন্তর প্রতিযোগিতার কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ অনেক সময়ই নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। একে বলে সহ-বিবর্তন। এ ধরনের উদাহরণ আছে বহু; হামিংবার্ডের সাথে অর্নিথোফিলাস (*Ornithophilous*) ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোয়িড অর্কিডের (*Angracoid orchids*) সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন ইত্যাদি। উইকিপিডিয়ার <http://en.wikipedia.org/wiki/Coevolution> পেইজ থেকেও বিভিন্ন ধরনের প্রাণী-উদ্ভিদের সহবিবর্তনের বেশ কিছু উদাহরণ জানা যাবে। কোনো সেবামূলক কাজে উৎসাহিত হয়ে নয় কিংবা উপকারি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশের ফলে নয় বরং কঠিন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজনেই মূলত তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় যেতে বাধ্য হয়। আসলে প্রকৃতিতে এমন কোনো জীব নেই যে শুধু নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রজাতির সেবা করার জন্য বেঁচে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। চার্লস ডারউইন তাঁর ‘*অরিজিন অব স্পিসিজ*’ বইতে পাঠকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ ধরনের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা একটা প্রজাতি খুঁজে বের করার জন্য, এবং আজ পর্যন্ত কোথাও সে ধরনের প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অনেককেই বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক পড়াশোনার অভাবে আর ধর্মীয় রক্ষণশীলগোষ্ঠীর বিবর্তনবিরোধী প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে চটকদার অর্ধসত্য বা মিথ্যাকেই ‘সত্য’ বলে মনে করেন। অথচ বিবর্তনের ওপর দু’তিনটি অথেন্টিক বই পাঠ করলে এ সমস্যা হওয়ার কথা না। জীবন-জগৎ-জীবের বিকাশ সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর মিতে যেত। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখারই কিছু অপূর্ণতা রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সব শাখাতেই নিত্যনতুন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, সংগৃহীত তত্ত্বের পরিবর্তন-পরিমার্জন হচ্ছে, গবেষণা কাজে চলমান (এর মানে এটি বোঝানো হচ্ছে না যে, বিজ্ঞান ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত করে জানতে পেরেছে তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে)। বিবর্তন তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এখানেও এই অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক; ৩৮০ কোটি বছর পূর্বের এ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির পর থেকে তার বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই বিবর্তন তত্ত্বেরও সেইসব অপূর্ণতা বা ফাঁক আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাই পূর্ণ করতে হবে। কোনো ধরনের রক্ষণশীল আবেগ-আদর্শ কিংবা অহমিকা দ্বারা তাড়িত হয়ে সেই ফাঁকটুকু পূরণ করা সম্ভব নয়।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি :

১. *বিবর্তনের পথ ধরে*, বন্যা আহমেদ, অবসর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
২. *বিবর্তনবিদ্যা*, ড. ম আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

৩. *Only a Theory: Evolution and the Battle for America's Soul*, Viking Adult, 2008.
৪. *The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution*, Richard Dawkins, Mariner Books, 2005.
৫. *Evolution*, Mark Ridley, Wiley-Blackwell, 2003.
৬. *Evolution*, Douglas J. Futuyma, Sinauer Associates, 2005.
৭. *The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design*, W. W. Norton, 1996.
৮. *The Science of Evolution and the Myth of Creationism: Knowing What's Real and Why It Matters*, Ardea Skybreak, Insight Press; illustrated edition, 2006.
৯. The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy). (2005). “Index to Creationist Claims” edited by Mark Isaak, <http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html>.
১০. The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy). “29+ Evidences for Macroevolution”, <http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc>.

ডিএনএ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ডারউইন সঠিক ছিলেন

—সন বি. ক্যারল

আমেরিকার Wisconsin বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Sean B. Carroll আণবিক জীববিজ্ঞান এবং বংশগতিবিদ্যার জগতে এক সুপরিচিত মুখ। হাওয়ার্ড হগ্‌স মেডিকেল ইনস্টিটিউটের গবেষক Sean B. Carroll-এর গবেষণার মূল বিষয় ‘প্রাণীর দৈহিক বিন্যাসের জন্য দায়ী জিনগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং বৈচিত্র্যময় প্রাণীর উদ্ভবের পিছনে বিবর্তনের ভূমিকা’ নির্ধারণ। ক্যারলের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলো নানা সময়ে *TIME*, *US News & The New York Natural History*-প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজসহ জার্নালে প্রকাশিত

একজন জিন-অধ্যাপক ক্যারলের জগতে রয়েছে দৃষ্ট বিজ্ঞানের (বিশেষ জীববিজ্ঞান) মত বিষয়কে অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থিতিতে পাঠকের কাছে



World Report, *Times*, *Discover*, এর মত বিশ্বের দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হয়েছে।

বিজ্ঞানী হিসেবে যেমন বিজ্ঞান-পদচারণা তেমনি করে আণবিক নিরস-কাটখোটা সাবলীল ভঙ্গিতে সাহিত্যের সরস একেবারে সাধারণ উপস্থাপনে তিনি

সিদ্ধহস্ত। বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর লেখা চমৎকার বইগুলি হচ্ছে : *The Making of the Fittest: DNA and the ultimate forensic record of Evolution* (2006, W.W. Norton) এবং *Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo* (2005, W.W. Norton)। আবার জেন গ্রেনিয়ার (Jen Grenier) ও স্কট ওয়েদারবী (Scott Weatherbee) এর সাথে যৌথভাবে লিখেছেন *From DNA to Diversity: Molecular Genetics and the Evolution of Animal Design* (2nd ed, 2005; Blackwell Scientific) এবং অধ্যাপক ক্যারল, এন্টনি গ্রিফিথিস (Anthony Griffiths), রিচার্ড লিওয়েনটিন (Richard Lewontin), সুসান ওয়েসলার (Susan

Wessler)-এর সাথে রচনা করেছেন *Introduction to Genetic Analysis* (2007, W.H. Freeman and Co.) বইটি। লেখক এবং সহযোগী লেখক হিসেবে ইতিমধ্যে তাঁর শতাধিক গবেষণাপত্র বিভিন্ন বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আমেরিকার *National Academy of Sciences*-এর সদস্য এবং *American Association for the Advancement of Science*-এর একজন সম্মানিত ফেলো। অধ্যাপক ক্যারলের গবেষণা সম্পর্কে জানা যাবে পাশের ওয়েব এড্রেস থেকে : <http://www.molbio.wisc.edu/carroll/index.html>।

সন ক্যারলের আলোচ্য সাক্ষাৎকারটি খ্যাতনামা বিজ্ঞান পত্রিকা *Discover*-এর মার্চ, ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ডিসকোভার ম্যাগাজিনের Pamela Weintraub। পাঠকের সুবিধার্থে সাক্ষাৎকারটির ইন্টারনেট এড্রেস তুলে দেওয়া হল : <http://discovermagazine.com/2009/mar/19-dna-agrees-with-all-the-other-science-darwin-was-right>। যুক্তির জন্য আলোচ্য সাক্ষাৎকারটি অধ্যাপক সন ক্যারলের অনুমতিক্রমে অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ কুমার ধর*।

ডিসকোভার : চার্লস ডারউইন তাঁর ‘*On the Origin of Species*’ গ্রন্থে ‘বিবর্তন তত্ত্ব’ প্রস্তাবনার পর দেড়শ বছর পেরিয়ে গেল; কিন্তু আজও বিবর্তনের ধারণা কিছু ক্ষেত্রে অধিক বিতর্কিত হয়ে উঠছে। এরকমটা কেন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সন বি. ক্যারল : বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করা একটা সাংস্কৃতিক প্রচারণা, বিজ্ঞানের কোন বিষয় নয়। বিবর্তন নিয়ে আমরা (বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন ফসিলবিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, আণবিক জীববিদ্যা ইত্যাদি) আলাদা আলাদা স্বাধীন প্রমাণের এক কেন্দ্রাভিমুখী প্রবাহ দেখতে পাই; যা থেকে বিবর্তনের প্রতি আমাদের ভরসা প্রতি বছরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসিল রেকর্ড থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি তা আবার ডিএনএ রেকর্ড এবং ভ্রূণতত্ত্ব থেকে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ বিবর্তনকে অস্বীকার করতে উচ্চকণ্ঠ এবং বিবর্তনের জ্ঞান থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করছে। বর্তমান সময়ে আমরা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে কিংবা নির্দোষ প্রমাণ করতে ডিএনএ পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। জন্মপরিচয় নির্ণয়ে আমরা ডিএনএ প্রযুক্তির দ্বারস্থ হচ্ছি। ক্লিনিকে রোগীর রোগাক্রান্তের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে, এমন কী দেহে ক্যানসারের ঝুঁকি নির্ণয়ে ডিএনএ’র উপর নির্ভর করছি। ডিএনএ-বিজ্ঞান আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। অথচ শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে (বিবর্তন সম্পর্কে ডিএনএ’র প্রমাণ) আমরা বাস্তবতাকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করি। ডিএনএ’র প্রকারণের (Variation) উপর নির্ভর করেই বিচারক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডদেশ দিতে পারছেন কিন্তু জনসাধারণ এই ‘প্রকারণ বা ভ্যারিয়েশন সৃষ্টির জন্য

* সিদ্ধার্থ কুমার ধর : শিক্ষার্থী, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য, *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*।

ডিএনএ'র মেকানিজম' এবং 'ডিএনএ'র কোন সুনির্দিষ্ট গঠনের কারণে অন্য জীব থেকে মানুষ স্বতন্ত্র'—সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নয়। এটা সংস্কার মাত্র। আমি মনে করি, আমরা এই অবস্থা অতিক্রম করে যেতে পারব। তবে আমি জানি না, এর জন্য আমাদেরকে কয় দশক বা শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে।

ডিসকোভার : আপনার সদ্য প্রকাশিত '*Remarkable Creatures*' বইয়ে ডারউইন কিভাবে বিবর্তন তত্ত্বে উপনীত হলেন, তা বর্ণনা করেছেন। আপনি কি এখানে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন?

সন বি. ক্যারল : কলেজ জীবনে ডারউইন প্রায়ই গোবরে পোকা সংগ্রহ করতেন। তিনি আরো বেশি সংগ্রহের সুযোগ খুঁজছিলেন। বিট্রিশ জাহাজ এইচ.এম.বিগলে 'প্রকৃতি-বিজ্ঞানী' হিসেবে যোগদানকে তিনি সেই সুযোগ পূরণের উপায় হিসেবে পেলেন। ডারউইনের জন্য এটি ছিল খুবই লোভনীয় ব্যাপার। তিনি বিগলে জাহাজে করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল, ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডা-ধূসর-স্যাঁতস্যাঁতে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। যা ছিল জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু ঐ ভ্রমণের জন্য মাত্র ২২ বছর বয়সে পিতাকে রাজি করাতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। পাঁচ বছরের দীর্ঘ ভ্রমণে দুইবার বিরতি পেয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ের বিরতিতে তিনি আর্জেন্টিনার উপকূলে নামেন; সেখানে বিলুপ্ত অনেক প্রজাতির ফসিল উদ্ধার করেন, যেমন বিশালাকার বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল। দক্ষিণ আমেরিকার বনাঞ্চলে জীবন্ত স্তন্যপায়ীদের সাথে ঐ প্রাণীর ফসিলের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এ আবিষ্কারের ফলে তার মনে 'জীবনের পরিবর্তন ঘটছে'—ধারণাটি জন্ম লাভ করে।

এরপর ডারউইন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ পৌঁছালেন। সেখানে তিনি একের পর এক দ্বীপ ঘুরে ঘুরে মকিংবার্ড (আমেরিকার এক ধরনের পাখি, যারা অন্য পাখির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে) এবং ফিঙ্গে পাখি সংগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, পাখিগুলো একই রকম হওয়া সত্ত্বেও দ্বীপভেদে তাদের মধ্যে কিছুকিছু পার্থক্য রয়েছে। গ্যালাপাগোস দ্বীপ ত্যাগ করার পর তার মনে নতুন চিন্তার উদয় হল। তিনি বুঝতে পারলেন, পাখিগুলো আপাত একই ধরনের দ্বীপে থাকার পর তাদের মধ্যকার পার্থক্যের পেছনে একটি ব্যাখ্যা রয়েছে; পাখিগুলো একই প্রজাতি থেকে উদ্ভূত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে আলাদা আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

ডিসকোভার : ডারউইনের এই অন্তর্দৃষ্টি ব্যাপকভাবে 'ধর্মবিরোধী' হিসেবে বিবেচিত হবার কারণ কি?

সন বি. ক্যারল : প্রচলিত সৃষ্টিবাদ অনুসারে, প্রতিটি জীব এক অলৌকিক শক্তি দ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছিল; এবং রহস্যময় প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। সৃষ্টিবাদের এই দাবি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

গবেষণার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ডারউইন বললেন, না, প্রজাতিসমূহ পরিবর্তনীয় এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে থাকে, যেমনটা পদার্থ বিজ্ঞানে দেখা যায়। মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, 'আমরা কিভাবে এলাম?' বিবর্তন, এই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় উত্তর। অবশ্য বিকল্প ধারণাগুলো বহু দিন ধরেই মানুষের মনে বিরাজ করছে; বিবর্তন তত্ত্ব মানুষের উৎপত্তির পেছনে 'অলৌকিক ব্যাখ্যা'র পরিবর্তে লৌকিক-প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা হাজির করেছে।

বহুরূপী বহির্ভাগের ভেতরে সকল প্রাণীরই এক সেট 'দেহ-নির্মাণকারী জিন'-এর অস্তিত্ব রয়েছে। আমি যদি পাঁচ মিনিটের জন্য ডারউইনের সাথে থাকতাম, তবে ঠিক এই জায়গা থেকেই তাঁর সাথে কথা বলা শুরু করতাম। এটা নিশ্চিত তাঁর মনে ঝড় তুলতো।

ডিসকোভার : ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব প্রকাশ করতে ২০ বছরের মত সময় নিলেন কেন?*

সন বি. ক্যারল : ২২ বছর বয়সে (প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে) বিগলে জাহাজে ভ্রমণের সময় ডারউইন কিছুটা দ্বিধাশ্রিত ছিলেন। পাঁচ বছর পর ২৭ বছরে ভ্রমণ শেষে তিনি যখন ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেন, তখন তার মনে এই চিন্তাগুলো (প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব) ঘোরপাক খাচ্ছিল। তিনি জানতেন এ তত্ত্ব প্রকাশ পেলে পরিণাম কি হতে পারে? কিন্তু তারপরও তিনি বৈজ্ঞানিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের মনে নিতে অসুবিধা নেই যে—ক্ষমতাসীনগোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করার মত সময় তখনো আসেনি। ডারউইনের সে সময়ের সত্য প্রকাশ করার ঘটনাটি আমাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত।

ডিসকোভার : বিবর্তন নিয়ে আপনার আগ্রহের পেছনে কোন বিষয়গুলো আপনাকে প্রেরণা জুগিয়েছে?

সন বি. ক্যারল : ছোটবেলায় আমি জেব্রা, জিরাফ, চিতাবাঘ দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমি একসময় সাপ পোষতাম, তাদের শরীরের রঙের বিন্যাস আমার ভাল লাগত। যখন বড় হচ্ছি, তখন মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগত—বিশেষ করে প্রাণীর শরীরে এ ধরনের বিন্যাস ও আকার কিভাবে তৈরি হল? একটি উর্বর ডিম থেকে জটিল প্রাণীর জন্ম হওয়া

* 'ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব প্রকাশ করতে বিশ বছরের অধিক সময় দেরি করেছেন'—এরকম একটি ধারণা সর্বমহলেই প্রচলিত আছে। সত্যিই কি তাই? এ বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে : John Van Wyhe. (2007). "Mind the Gap: did Darwin avoid publishing his theory for many years" *Notes & Records of the Royal Society*, 2007, 61: 177-205. <http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/61/2/177.full.html>. —সম্পাদক।

পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব প্রদর্শনী। সন্তান জন্মানকারী প্রাণী মাত্রই এই প্রক্রিয়া নিয়ে আশ্চর্যন্বিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় আমরা এগুলো দেখতে পেতাম কিন্তু ভেতরকার কলাকৌশল বুঝতে পারতাম না। দেহের ভেতরে ঠিক কোন ঘটনার কারণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চোখ সঠিক জায়গায় প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, এবং রক্তসংবহনতন্ত্র ও মেরুদণ্ড খণ্ডিত হয়েছে? একটি সাপের সাথে একটি টিকটিকির পার্থক্য, কিংবা একটি জেব্রার সাথে জিরাফের দৈহিক বিকাশের পার্থক্যের দুর্নিবার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের আরো বেশি অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। দৈহিক বিকাশ বোঝার সাথে সাথে আমার মধ্যে দুটি মৌলিক প্রশ্নের উদয় হয় : একটি ডিম থেকে কিভাবে জটিল প্রাণীর জন্ম হয়, এবং বিভিন্ন প্রাণীরই-বা বিবর্তন হলো কিভাবে?

ডিসকোভার : মনে হচ্ছে একটি জ্ঞানের জ্ঞাতাত্ত্বিক বিকাশ এবং একটি সমগ্র প্রজাতির বিবর্তন—দুটি আলাদা ঘটনা। এরা কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?

সন বি. ক্যারল : প্রথম দিকে ফসিল-বিজ্ঞানীরা (বিবর্তন বিষয়ে জানতে) বহু প্রাচীন ফসিল নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এরপর বংশগতিবিদ্যার উন্মেষ হল। বংশগতিবিদ্যার গবেষকরা জিনের মিউটেশন উপর ভিত্তি করে প্রজাতির অভ্যন্তরের ছোট ছোট পার্থক্যগুলো (প্রকারণ বা Variation) নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। চল্লিশের দশকে এ দুটি ক্ষেত্রে (জ্ঞাতাত্ত্বিক বিকাশ ও সমগ্র প্রজাতির বিবর্তন) ‘সংশ্লেষণী তত্ত্ব’র মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। আজ আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের জনসমষ্টির মধ্যে যে জিনগত পার্থক্য দেখতে পাই তা বিশাল সময় জুড়ে ‘যৌগিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ’র মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং এই তথ্য ফসিল রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্বের মাধ্যমে দুটির ক্রমের (জ্ঞাতাত্ত্বিক বিকাশ ও সমগ্র প্রজাতির বিবর্তন) মাঝে ঐক্যতান স্থাপিত হয়েছে।

অবশ্য ‘সংশ্লেষণী তত্ত্ব’ বিবর্তনকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাহলে বিবর্তনের অকাট্য প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাবে? ডারউইনের ‘প্রজাতির উদ্ভব’ তত্ত্বটি একটি ‘ব্ল্যাক বক্স’। কোন সে পরিবর্তনের কারণে প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তনগুলো হচ্ছে (প্রকারণ বা Variation তৈরি হচ্ছে) ঐ সময়ে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বংশগতিবিদ্যার বিকাশের সাথে সাথে আমরা প্রাণীর উৎপত্তির কলাকৌশলের গভীরে যেতে পারছি। আমরা এখন ডিএনএ-তে সংরক্ষিত তথ্য এবং বিকাশমান জ্ঞান পর্যালোচনা করি, ঠিক কোথায় এই পরিবর্তনগুলোর (প্রকারণ বা Variation) সূচনা হয়? এ থেকে আমরা বিবর্তনের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাই। হয়তো একটি পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর মাঝে পরিবর্তনগুলো দেখা যাবে না, কিন্তু যদি একটি প্রাণীর জ্ঞানের বিকাশকালীন পর্যায়ে (রঙের জন্য দায়ী) জিনের নিউক্লিক এসিডের বেস পরিবর্তন করে ফেলা যায়, তখন দেখা যায় প্রাণীটি কালো হয়ে জন্মাচ্ছে। আবার যদি জিনের নিউক্লিক এসিডের তিনটি বেসের পরিবর্তন ঘটান হয়, তবে দেখা যাবে প্রাণীটির বাহু

লম্বা হয়ে যাবে। এই ডিএনএ-তে পরিবর্তনই বিবর্তনের মূল ভিত্তি। পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ এবং প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি।

ডিসকোভার : আপনি বিবর্তনকে ‘চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ’ (Compounding interest)-এর সাথে তুলনা করেছেন। কেমন করে?

সন বি. ক্যারল : একটি ‘ভাল মুদ্রা বাজারের হিসাব ব্যবস্থা’র মত বিবর্তন ক্রমবিকাশময় পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে। একটি প্রজাতির মধ্যকার প্রকারণ যদি সুবিধা প্রদান করে, তবে তা যতই সামান্যতমই হোক না কেন, সেটাই প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য নির্বাচিত হবে। যদি কোন প্রাণীর (যেমন প্রজাপতি) ডানায থাকা দাগগুলো আকর্ষণীয় করে তোলে তার সঙ্গীর নিকট, কিংবা শিকারীর নিকট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, তবে এই প্রাণীই প্রকৃতিতে টিকে থাকবে। এই প্রকারণগুলো বেশি সন্তানের জন্ম দেবে। বিগত কয়েক শতাব্দী, সহস্রাব্দ এবং তারও বেশি সময় জুড়ে প্রকারণসমূহের মাঝে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ নামক প্রতিযোগিতার কারণে পৃথিবীর বুকে এত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

ডিসকোভার : অধিকাংশ মানুষের কাছেই এই বিশাল সময়সীমার ব্যাপারটি সহজবোধ্য নয়।

সন বি. ক্যারল : এক শতাব্দী আগে যখন টেডি রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন মোটর গাড়ি ব্যবহারের প্রচলন খুবই কম ছিল। আজকে এই এক শতাব্দীকে এমনিতে বিশাল সময়কাল মনে হলেও জীববিজ্ঞান বা ভৌগোলিক দিক থেকে এটি কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা মাত্র। তেমনি কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে হোমিনিডদের (Hominids) উৎপত্তি হওয়াটি শুধুই এক মুহূর্তের ঘটনা। সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে, কিংবা নদীর গতিপথ পরিবর্তনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। আবার তাপমাত্রার পরিবর্তন, রেইন ফরেস্ট বিলুপ্ত হওয়া কিংবা মরণকরণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের প্রাণীকূল পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে।

ডিসকোভার : আপনি বিবর্তন ও জ্ঞাতাত্ত্বিক বিকাশের সংমিশ্রণকে একত্রে ‘Evo-Devo’ নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এটা আসলে কি?

সন বি. ক্যারল : এটা ‘বিবর্তনীয় বিকাশমান জীববিজ্ঞান’ (Evolutionary Developmental Biology) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিকাশমান বিবর্তনের একটি ক্ষুদ্র পাঠ্যক্রমের এটি। ডেভু শব্দটি আশির দশকের প্রথম ভাগের ব্যাড দল ‘ডেভু’ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। ৮০’ দশকের আগে ‘বিবর্তনকে সময়ের সাথে পরিবর্তনময়’ হিসেবে

সংজ্ঞায়িত করার জন্য খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে ছিল না।

ডিসকোভার : ঠিক এসময় দৃশ্যপটে আপনার উদয় হল।

সন বি. ক্যারল : হ্যাঁ। আমি ঐ সময় বোস্টনের টার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগ-প্রতিরোধ বিজ্ঞানের (Immunology) গবেষক ছিলাম। প্রায় সময় আমি সাবওয়েতে ভ্রমণ করতাম এবং তিন-চারটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতাম। এগুলো আমাকে উদ্দীপিত করত। কিন্তু সবগুলো সূত্রের মিল জানা ছিল খুবই কষ্টকর। আমি সবসময়ই শুনতে পেতাম বিবর্তন এবং দৈহিক বিকাশ ও প্রকারণ উদ্ভবের বিষয়গুলো সহজবোধ্য নয়। তাই ভাবতাম কিভাবে আমি মূল লক্ষ্যে পৌঁছব। একসময় আমি ফলের মাছির (*Drosophila melanogaster*) শরীরের গঠন সৃষ্টিকারী জিন এবং অসাধারণ কিছু মিউট্যান্টদের সম্পর্কে জানতে পারলাম। এই মিউট্যান্টদের মাঝে শুধুমাত্র একটি জিনের কারণে মাছির মাথার শূঁড়ের জায়গায় পা গজাতে পারে। একটি মিউটেশন এসব প্রাণীকে একসেট অতিরিক্ত ডানা দিয়েছে অথবা চোখ ও অতিরিক্ত পাখাগুলো বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অভাবনীয় পরিবর্তন সৃষ্টিকারী এই স্বতন্ত্র মিউটেশন জিন সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে : এই জিনগুলো আদতে কি, এবং এগুলোর কার্যকারণের ব্যাখ্যা-ই বা কি? প্রশ্ন ছিল এই জিনগুলো কিভাবে ফলের মাছির শরীরকে গঠন করেছে?

ডিসকোভার : আপনি ফলের মাছিকে (*Drosophila melanogaster*) বিবর্তন ও (ক্রমের) বিকাশের 'জানালা' হিসেবে দেখেছিলেন। কিভাবে এর সমন্বয় করলেন?

সন বি. ক্যারল : এই বিষয়ে প্রথম দিকে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কারণ ধারণা ছিল যে লোমশ প্রাণীর বিবর্তনে সম্পর্কে জানতে হয়তো ফলের মাছির গবেষণা থেকে কিছু জানা যাবে না। কিন্তু ১৯৮৩ সালে কলরোডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণাগারে মেরি স্কটের সাথে কাজ করার সুযোগ পাই; যখন থেকে আমরা কাজ শুরু করলাম, তখন আমাদের ও অন্যান্যদের গবেষণায় এটি স্পষ্ট হলো যে, এসব 'শরীরবৃদ্ধিকারী জিন' শুধুমাত্র ফলের মাছির (*Drosophila*) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা সমস্ত প্রাণীকূলের মাঝে বিদ্যমান—এটা আমাদের জন্য একটি বড় বিস্ময় ছিল। হঠাৎ করেই আমরা বিবর্তনের সবচেয়ে মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করলাম, যা আমাদের 'প্রাণীর শরীরের আকৃতিগত বিবর্তন' বুঝতে সাহায্য করেছিল।

ডিসকোভার : তাহলে বিজ্ঞানীরা এই মৌলিক জিনকে বিভিন্ন প্রজাতির মাঝে খোঁজে পাচ্ছেন?

সন বি. ক্যারল : হ্যাঁ। মানুষের চোখ ও পোকাকার চোখের মাঝে মিল খোঁজে পাওয়া ছিল আমাদের জন্য অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। আপনি নিশ্চয়ই চিন্তা করতে পারেননি, এই দুই প্রজাতির মাঝে সাধারণ কোনো মিল থাকতে পারে? পোকাকার চোখ যা ৮০০ পার্শ্ববিশিষ্ট, একটি মানুষের চোখের চেয়ে ভিন্ন দর্শনভূত্বিতে কাজ করে। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে

বিজ্ঞানীরা ভাবতেন সবকিছুই স্বকীয়ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, বিভিন্ন আকৃতির এসব চোখ আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে, সবগুলোই বিভিন্ন প্রজাতির নিজের প্রয়োজনে। আমরা এখন আবিষ্কার করেছি যে, সব প্রাণীর চোখের গঠনের জন্য একটি 'সাধারণ জিন' বিদ্যমান। যদিও এসব প্রাণীরা ৫০০ মিলিয়ন বছর ধরে আলাদাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। যদি আমরা হাঁদুর থেকে এই জিনের প্রতিলিপি নেই, সেই প্রতিলিপি মানুষের চোখেও খুঁজে পাব এবং এটা যদি মাছির মধ্যে প্রবিষ্ট করি তবে মাছির চোখের টিস্যুও তৈরি করতে পারবো।

আমাদের গবেষকেরা দেখেছেন যে, একটি সাধারণ জিন মানুষ ও মাছির দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বেরিয়ে আসলো যে, দেহের বাইরে বেরিয়ে আসা শূঁড়, পা, শিং-এর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরির জন্য ঐ জিনগুলিই দায়ী। এই পরীক্ষাগুলো আমাদের পূর্বের ধ্যান-ধারণাকে নাড়িয়ে দিল। এবং মানুষকে নতুন চিন্তা করতে বাধ্য করলো; ভিন্নরূপী বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের বর্হিভাগের পেছনে একই সাধারণ জিনের জেনোটিক গঠন দায়ী। ডারউইনের দেখা পেলে এই বিষয়টাই তাকে জানাতাম, যা তাকে নিশ্চিতভাবে নাড়া দিত।

ডিসকোভার : নিঃসন্দেহে আমরা 'পরীক্ষানির্ভর ডারউইনিজম'-এর যুগে চলে এসেছি। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই পরীক্ষাগুলো কি রকম?

সন বি. ক্যারল : আমরা একটি নির্দিষ্ট অঙ্গাণুর প্রাথমিক আকার বের করার জন্য বিভিন্ন প্রাণীকে পর্যবেক্ষণ করছি; প্রাথমিক অঙ্গাণু পুনর্নির্মাণ করে পরবর্তীতে নতুন আকৃতি ও কর্মপদ্ধতি তৈরির ধাপগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি। দুটি প্রজাতির ভিন্নতা সৃষ্টির পেছনে নির্দিষ্ট জিনগুলোর পরিবর্তনই দায়ী, এবং এই জিনগুলি অদল-বদল করা সম্ভব। আমরা এই পরীক্ষাগুলি ধাপের পর ধাপে করে যাচ্ছি। পরীক্ষাগুলি চোখের সামনে ঘটা আরো অনেক পরীক্ষার মাঝে খুবই কার্যকরী পরীক্ষা। বিভিন্ন প্রাণী কোন আলোতে (বর্ণালী) ভালো দেখবে, তা নির্ধারিত হয়েছে ঐ প্রাণী কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে; যেমন তারা হয়তো সমুদ্রের তলে, অথবা গুহায় বসবাস করে, কিংবা দিনের বেলা বা রাতের বেলা বেশি চলাচল করে; অথবা তারা হয়তো শিকারের সময় ফুলের বা শিকারের রঞ্জিত বিন্যাসগুলি চিহ্নিত করতে চায়। দৃষ্টিশক্তি প্রাণীর জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাণীকূলের বসবাসের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে দৃষ্টির ধরন অনেকটাই বিবর্তিত হয়েছে। পরীক্ষাগারে এই পরিবর্তনগুলো দেখার জন্য যেসব পরীক্ষা করা হয়, সেগুলো খুবই কার্যকরী। দৃষ্টিশক্তির ভিন্নতার জন্য দায়ী এই জিনগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ জিনগুলি অদল-বদল করা যায়; ফলে আলোক-সংবেদী রেটিনার প্রোটিনগুলোকে পরিবর্তন করা যায়। খুবই কম সময়ে এই পরিবর্তনের ফলাফল বুঝতে ও পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে এর সম্পর্কে পূর্বানুমান করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ পরীক্ষাগারে গবেষণার জন্য হাঁদুরের দেহে বর্ণচিহ্নিতকারী এক সেট অতিরিক্ত জিন প্রবিষ্ট করানো হয়; এবং দেখা গেছে, এই জিনের দ্বারা শরীরে

যে প্রোটিন তৈরি হয়েছে তা মস্তিষ্কের ভিতরে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ইঁদুরকে অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে সক্ষম করে তুলে।

ডিসকোভার : আমরা কি এই আবিষ্কারগুলোকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি?

সন বি. ক্যারল : আমরা এখন জানি, মানুষের জিনোম এবং শিম্পাঞ্জিদের জিনোমের পার্থক্য বলতে গেলে মাত্র ১ শতাংশ। যদিও শিম্পাঞ্জিদের সাথে আমাদের দেহ ও মস্তিষ্কে পার্থক্য রয়েছে। মানুষ, শিম্পাঞ্জি এবং অন্যান্য প্রাইমেটদের জিনের মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা মানুষেরা কিভাবে ভিন্ন হলাম? আমরা কিভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জন করলাম? আমরা কিভাবে সোজা হয়ে হাঁটার ক্ষমতা অর্জন করেছি? আমরা কিভাবে ভাষার ব্যবহার শুরু করলাম? আমরা কিভাবে বড় মস্তিষ্কের অধিকারী হলাম? যদি মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে অর্থবোধক কার্যগত পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করা যায়, তখন বুঝা যায় সামান্য জিনগত ভিন্নতার কারণেই বড় ধরনের শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। ‘Evo-Devo’ আমাদেরকে এই রহস্য সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছে। একই ধরনের জিন বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত এবং ব্যবহৃত হয়েছে; কোন ক্ষেত্রে তা তাড়াতাড়ি ঘটেছে আবার কোন ক্ষেত্রে তা কিছুটা সময় নিয়ে ঘটেছে। এটা নির্ভর করে সময় এবং স্থানের ভিন্নতার উপর। জিনগুলির এই বিন্যাস ও ব্যবহৃত হওয়ার ধরন অনেকটা ‘ব্যালে নৃত্যের’ মত; যেখানে একই নর্তক-নর্তকী রয়েছে কিন্তু তাদের সময়ে সময়ে ভিন্ন অবস্থানের মাধ্যমে নৃত্যকলায় ভিন্নতা তৈরি হয়।

ডিসকোভার : আপনার নতুন বই ‘*Endless Froms Most Beautiful*’-এ ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে⁺ আকস্মিক বিশাল সংখ্যক প্রাণের উন্মেষের কথা বলেছেন; কিন্তু বিবর্তনের

⁺ যুক্তরাজ্যের ওয়েলস (wales) নামক স্থানকে প্রাচীনকালে রোমানরা ‘ক্যাম্ব্রিয়া’ নামে ডাকতো। অতীতে এ পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে (কম-বেশি ৫৪৪-৫০৫ মিলিয়ন বছর আগে) শিলাস্তর সৃষ্টি হয়েছিল সে ধরনের শিলা ফসিলবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিকরা প্রথম এই ওয়েলস থেকে সংগ্রহ করেন। তাই এর নাম রাখা হয় ‘ক্যাম্ব্রিয়ান’। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী এ পিরিয়ডে পৃথিবীর সমুদ্রে সমতলের (Sea Level) উচ্চতা থেকে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেশি ছিল ফলে অনেক নীচ স্থলভাগ নিমজ্জিত ছিল এবং পৃথিবীর মোট স্থলভাগের পরিমাণ কম ছিল। এ যুগে খুব কম সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পর্বের (Phyla) এবং শ্রেণীর (Class) বিবর্তন ঘটেছিল; যেমন এ পিরিয়ডে লোফোফেরেট (Lophorate) জাতীয় কর্শিকাবাহী অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আধিক্য ছিল এবং একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) পর্বের প্রাণীর আগমন ঘটেছিল। এনেলিডা (Annelida) ও অর্থোপোডা (Arthropoda) পর্ব দুটি এ পিরিয়ডে প্রোটোস্টোম (Protostome) জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। কর্ডাটা (Chordata) পর্বের নিম্ন ধাপের প্রাণীগুলো তখনও বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত হওয়ার পথে। ফলে অনেকে এ পিরিয়ডকে ‘ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ’ নামে অভিহিত করে থাকেন। প্রথম আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী, শেলযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী (যেমন

সমালোচকরা আকস্মিক বিশাল প্রাণের উন্মেষকে ‘অস্বাভাবিক’ বলে অঙ্কুলি নির্দেশ করে থাকেন। এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন কী আপনার বর্ণিত বিবর্তন প্রক্রিয়া ও বিশাল সময় জুড়ে ঘটে চলা ধীর গতির বিবর্তনকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় না?

সন বি. ক্যারল : ৫৪৩ মিলিয়ন বছর আগে (অর্থাৎ ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের পূর্বে) জেলি মাছ ও স্পঞ্জের মত অমেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যেত কিন্তু পোকামাকড় এবং ট্রাইলাবাইটদের মত দ্বিপাশ্বীয় প্রাণীর (মেরুদণ্ডী) অস্তিত্ব তখন ছিল না। ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ পিরিয়ডে বিশাল ও জটিলাকার প্রাণীদের উদ্ভব ঘটলো। আমরা আজকে প্রাণী জগতে যে বিশাল বিভাজন (প্রাণীজগতের বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণী) দেখতে পাই তা ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের সময়কালে উদ্ভূত। ফসিল রেকর্ডে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণকে অনেকটা আকস্মিক মনে হতে পারে, কিন্তু ‘Evo-Devo’-এর চমকপ্রদ তথ্য হল, বড় ও জটিল প্রাণীদেহ গঠনের জন্য দায়ী জিনগুলো ঐ প্রাণীদেহ আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এই জিনগুলো ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বের সরল-নরম দেহের অধিকারী প্রাণীদের মধ্যে ছিল; কিন্তু তাদের বিকশিত হওয়ার মত উপযুক্ত বাস্তুগত পরিবেশ ছিল না। অর্থাৎ ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে প্রচুর পরিমাণে সম্পূর্ণ নতুন জিনের উদ্ভব ঘটেছিল, বরঞ্চ পূর্ব থেকে বিদ্যমান জিনগুলির বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে জটিল প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে।

ডিসকোভার : এটা নিশ্চিতভাবে আপনাকে বর্তমানের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্ময়াভূত করে।

সন বি. ক্যারল : বলা যায় ডায়নোসর বিলুপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এটি প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রাণী ছিল। অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতো। পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন বছরে ডায়নোসর বিলুপ্ত হবার পর স্তন্যপায়ীরা বিশালাকার দৈহিক আকৃতিতে বিকাশ লাভ করে এবং ভৌগলিক বাস্তুসংস্থানে প্রাধান্য বিস্তার করে।

যখন জেনেটিক সম্ভাবনা বাস্তুতাত্ত্বিক সূযোগের সাথে মিলিত হয়, তখন হাতি, জিরাফ ও বাইসনের উদ্ভব ঘটল। বাস্তুসংস্থানকে একটি ছিপিবদ্ধ বোতলের সাথে তুলনা করা যায়; যেন ছিপি খুললেই ভেতরের জিনিসগুলো বিস্ফোরণের সহিত বেরিয়ে আসবে।

ডিসকোভার : ‘*The Making of The Fittest*’ বইয়ে আপনি সকল প্রাণীতেই ‘ফসিল জিন’ (Fossil Gene) থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। ‘ফসিল জিন’ বলতে আপনি কি

Anomalocarids) ও শৈবালের বিকাশ ঘটেছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। বিবর্তন-বিরোধী এরকম একটি প্রচারণা রয়েছে : “ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের সময়কালে আকস্মিক উদ্ভূত প্রাণীর ‘ancestral fossils’ নেই বা পাওয়া যায়নি।” এ ধরনের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন। ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2005). “Index to Creationist Claims” edited by Mark Isaak, from <http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC300.html>। — সম্পাদক।

বুঝিয়েছেন?

সন বি. ক্যারল : ফসিল জিন হচ্ছে এগুলোই, প্রাণীদের বিদ্যমান যেসব জিন ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে বর্তমানে আর ব্যবহৃত হচ্ছে না, এবং এদের মৌলিকতা বিনষ্ট হয়েছে। বোভেট (Bouvet) দ্বীপের ‘বরফ মাছ’-এর উদাহরণটি আমার খুব প্রিয়। এই প্রাণীগুলো অ্যান্টার্কটিকার শীতল পানিতে বসবাস করতো। এরা একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা ‘লোহিত রক্তকণিকা’ ছাড়াই তাদের টিস্যুগুলোকে কর্মক্ষম রাখার জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করত। এই মাছের রক্তে অক্সিজেন পরিবহনকারী হিমোগ্লোবিনের জিনগুলোর একটি (রক্তে অক্সিজেন পরিবহনকারী প্রোটিন) সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অন্যটি ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ থেকে বুঝা যায়, এই মাছদের পূর্বপুরুষদের দেহে লাল রক্ত বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এই মাছগুলো বর্তমানে লাল রক্ত নিয়ে তাদের জীবন-যাপন বাদ দিয়েছে।

কিভাবে এমনটা হল? এর ব্যাখ্যা বাস্তবতান্ত্রিক। এ প্রাণীগুলো হিমশীতল পানিতে বসবাস করে। ফলে হতে পারে যে, লাল রক্তকণিকাকে সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে দেহের মধ্যে হিমশীতল পানিতে উঠানো করা না খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বরঞ্চ এসব মাছের বড় ফুলকা ও প্রায় আঁশহীন দেহ রয়েছে। ফলে তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন চারপাশের পানি থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এভাবে তারা ৫০০ মিলিয়ন বছর ধরে মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবন প্রণালীকে ত্যাগ করেছে। আমরা মানুষেরা আমাদের পূর্বপুরুষ স্তন্যপায়ী ও তারও আগের মিলিয়ন বছর আগের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হবার পথে ৮০০ জিনকে ত্যাগ করেছি। কে জানে, এই হারিয়ে যাওয়া জিনগুলি আজ থেকে এক হাজার পরে হয়তো কোনো কাজে লাগত। কিন্তু এগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি, এই জিনগুলির মাঝে কিছু জিন ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কাজ করা উচিত।

ডিসকোভার : আবার আপনি কিছু জিনের অমরত্বের (Immortal Gene) কথা বলেছেন?

সন বি. ক্যারল : Immortal Gene হচ্ছে সেগুলোই, যে জিনগুলি পৃথিবীতে প্রাণের প্রারম্ভকাল থেকেই বর্তমান ছিল; এবং এরা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এদের জেনেটিক তথ্য গত ৩ বিলিয়ন বছর ধরে এখন পর্যন্ত সব প্রাণীর দেহের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। Immortal জিনগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল খুবই মৌলিক উপায়ে, জৈবিক অণুগুলোর জেনেটিক কৌশলের উন্মেষের মাধ্যমে। এ জিনগুলি ছাড়া জেনেটিক তথ্য ব্যাখ্যা করা যায় না এবং প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক প্রোটিন উৎপাদনও সম্ভব হয় না।

ডিসকোভার : আপনি বিবর্তনের ‘হিমবাহ’ সদৃশ অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

কিন্তু বিবর্তনবিরোধীরা এর সবকিছুকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। এর জবাবে আপনি কি বলবেন?

সন বি. ক্যারল : এই ধরনের বিরোধিতা ভিত্তিহীন; ন্যায়সঙ্গত নয়, এমন কী যৌক্তিকও নয়। যতই দিন যাচ্ছে, এগুলো ততই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ হয়ে পড়ছে। তারপরও বিরোধিতাকারীরা বন্দুক তাক করে রয়েছে।

ডিসকোভার : আমরা এই বিরোধী মানুষগুলোকে জৈববিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর জন্য কি করতে পারি?

সন বি. ক্যারল : শিক্ষাদানের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই বিবর্তনকে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পড়ানো উচিত। কোন কিছুই স্থির নয়। মহাবিশ্বের পরিবর্তন ঘটছে, পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটছে এবং প্রাণের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবজগতেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এই বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায়।

ডিসকোভার : আপনার চোখে ‘বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান’ কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সন বি. ক্যারল : আমরা এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্বর্ণযুগে রয়েছি। আমরা ডারউইনের মত এখন আর পোষ্য জীবজন্তু সংগ্রহ করছি না কিংবা মিউজিয়ামের দ্বারস্থ হচ্ছি না। এর পরিবর্তে আমরা পৃথিবী জুড়ে প্রাণীদের জেনেটিক রেসিপগুলো সংগ্রহ করছি এবং বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা বিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করতেছি, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী যেমন ম্যামথদের সাথে হাতির এবং নিয়ান্ডারথালদের সাথে আমাদের মিল-অমিল খুঁজতেছি।

এক তৃতীয় স্বর্ণযুগ আসবে যখন আমরা প্রাণকে বুঝতে পৃথিবীকেও ছাড়িয়ে যাব। প্রাণের বিবর্তন কতবার ঘটেছে, এবং এর উৎস কতগুলি ছিল। প্রাণ কি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পৌঁছেছে? ভিনগ্রহে প্রাণের রসায়ন পৃথিবীতে প্রাণের রসায়ন থেকে কি আলাদা? এগুলি জানা যদিও কঠিন কাজ তবে আমাদেরকে অবশ্যই সামনের দিকে এগুতে হবে। মহাবিশ্বের বাইরে অন্য কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া—আমাদের দেখা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসেবে পরিগণিত হবে।

বিবর্তন নিয়ে চারটি ভ্রান্ত ধারণা*

মূল : চার্লস সুল্লিভান ও ক্যামেরন ম্যাকফেরসন স্মিথ*

অনুবাদ : অভীক দাস*

চার্লস ডারউইনের ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ প্রকাশিত হবার ১৫০ বছর পরেও বিবর্তন তত্ত্ব জনসাধারণের কাছে ব্যাপক পরিসরে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু বিবর্তন কোনো কম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নয় কিংবা বোঝার জন্য জটিল কোনো বিষয়ও নয়। অথচ সদ্য পরিচালিত জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, অর্ধেকের বেশি আমেরিকানরা মনে করেন, মানুষ তার বর্তমান কাঠামো নিয়ে আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে। (Brooks 2001, CBS 2004)। একই সংখ্যার জনসাধারণ মানুষের অন্য প্রজাতির প্রাণী থেকে বিবর্তিত হওয়ার তত্ত্বটিকে ভুল বলে মনে করেন। (National Science Board 2000)।

* আমেরিকার *Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal* প্রতিষ্ঠানটি সংক্ষেপে CSICOP নামেই বেশি পরিচিত। অতিপ্রাকৃত-অলৌকিক দাবিকৃত বিভিন্ন ঘটনা-বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনা করার জন্য CSICOP-এর রয়েছে জগতজোড়া খ্যাতি। প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্র *Skeptical Inquirer*-এরও দীর্ঘদিন ধরে জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদিতা প্রচার-প্রসারে রয়েছে ভূয়সী ভূমিকা। Charles Sullivan and Cameron McPherson Smith-এর লেখা *Getting the Monkey off Darwin's Back: Four Common Myths About Evolution* শিরোনামের আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকদ্বয়ের অনুমতিক্রমে *Skeptical Inquirer*-এর মে-জুন, ২০০৫ (ভলিউম ২৯, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৮) থেকে অনূদিত।

লেখকটির ওয়েব ঠিকানা : http://www.csicop.org/si/show/getting_the_monkey_off_darwins_back। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত ‘বিবর্তন নিয়ে চারটি ভ্রান্ত ধারণা’র সাথে আরও ছয়টি ভ্রান্ত-ধারণা যোগ করে পরবর্তীতে বিস্তৃত পরিসরে লেখকদ্বয় *The Top Ten Myths About Evolution* (Prometheus Books, 2006) নামের বই রচনা করেছেন। বইটির ওয়েব এড্রেস : <http://www.toptenmyths.com>।

* Charles Sullivan ইংরেজি এবং দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং আমেরিকার Portland Community College-এর শিক্ষক। প্রত্নতত্ত্বে (archaeology) ডক্টরেট Cameron McPherson Smith পোর্টল্যান্ড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

* অভীক দাস : শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য, *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*।

সাম্প্র-প্রমাণ থেকে স্পষ্ট, শুধু মনুষ্য প্রজাতিই নয়, কোনো প্রজাতিই হঠাৎ করে আসেনি। প্রতিটি জীবেরই বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে এবং এই ইতিহাসগুলো প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে জটিলভাবে বিন্যস্ত। আমরা যদি এই জটিল বিবর্তনের ধারা বুঝতে না পারি, তাহলে আমাদের নিজেদের এবং অন্য প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হব। আমরা কি জিনগতভাবেই ‘বিশেষায়িত’ মানুষ? আমাদের খাদ্যশস্য কেমন হওয়া উচিত? কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মানব জীবনে কি রকম প্রভাব ফেলবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এবং অনেক মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তও সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে না, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি যদি আমরা ভালো করে অনুধাবন করতে না পারি।

গণমাধ্যমগুলোতে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে যেভাবে তুলে ধরা হয়, তা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এতে প্রচুর গলদ রয়েছে; যেমন বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যার অভাব। এই প্রবন্ধে আমরা সাধারণভাবে ব্যবহৃত এরকম কয়েকটি ‘শব্দগুচ্ছ’ চিহ্নিত করেছি, যথা : ‘বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ শুধুই একটি থিওরি’, ‘উন্নতির সোপান’, ‘মিসিং লিঙ্ক’, ‘শুধু শক্তিমানেই টিকে থাকে’। এই শব্দগুচ্ছগুলো আসলে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শীর্ষে এবং সাধারণ দৃষ্টিতে তুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভুল। শব্দগুচ্ছগুলো অনেক পুরনো অর্থ ধারণ করে, শতাব্দী প্রাচীন ধারায় জীববিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে; যা অনেকটা অপরিপক্বভাবে চিত্রণের চেষ্টা করে বিবর্তন কী এবং কীভাবে কাজ করে।

বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ শুধুই একটি থিওরি

আপনি হয়তো শুনেছেন, বিবর্তন সম্পর্কে কেউ এই বলে চ্যালেঞ্জ করছে ‘এটি শুধুই একটি থিওরি’? জর্জিয়ার The Cobb County School District ঠিক এই কাজটিই করেছে। তারা স্কুলের জীববিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে ‘জীবনের উৎসের আলোকে বিবর্তন শুধু একটি থিওরি, সত্য নয়’ এমন অতিরিক্ত বক্তব্য জুড়ে দিয়েছে।^১ এমন ধরনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ‘থিওরি’ শব্দটি নিয়ে দুটি ভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সাধারণের বহুল ব্যবহারে ‘থিওরি’ হচ্ছে ‘অপ্রমাণিত অনুমানমাত্র’; যেমন রাতের আকাশে আলোর রেখা থেকে যেনতেনভাবে ভিনগ্রহের প্রাণীর মহাকাশযান বলে বোঝাবার চেষ্টা। কিন্তু যখন বিজ্ঞানীরা ‘থিওরি’ শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তারা অবশ্যই থিওরি শব্দের মাধ্যমে যৌক্তিক, পরীক্ষিত, সর্বসমর্থিত কোন ব্যাখ্যার সহিত কোনো ফ্যাক্টকে উপস্থাপন করেন।^২ এ আলোকে বলা যায়, বিবর্তন হল অভিকর্ষ তত্ত্ব বা পদার্থ-রসায়ন বিজ্ঞানের এই ধরনের আরো পরীক্ষিত-বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ন্যায় একটি যথেষ্ট ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ তত্ত্ব। যদিও এ কথা সত্য বিবর্তনের অনেক সাম্প্র্যই পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের মতো গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি, যেমনটা হয়নি মহাকাশ-বিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

একজন ভূতাত্ত্বিক কখনোই সময়ের পিছন দিকে গিয়ে পৃথিবীর প্রথম দিককার বহিরাবরণের গঠন দেখে আসতে পারবেন না, বা মহাকাশ-বিজ্ঞানী যেমন পারবেন না একটি নক্ষত্রের কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করতে। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক থিওরি বা ‘অপ্রমাণিত অনুমান’। কিছু যেগুলো ফ্যান্টিকে খুব করতে পারে। জীববিজ্ঞানে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও বেশি ভাল ব্যাখ্যা করতে থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি (Theodosius Dobzhansky) এই উপস্থাপন করেছেন : *‘জীববিজ্ঞানে কোন কিছুই অর্থবোধক নয়।’*



গহ্বরে পরিণত হওয়া অর্থ এই নয় যে এই তত্ত্বগুলো একেবারে বৈজ্ঞানিক থিওরি রয়েছে, স্পষ্টভাবে উপস্থাপন ‘বিবর্তন তত্ত্ব’ ব্যতীত নেই যা বিবর্তনের চেয়ে পারে। জীববিজ্ঞানী (Theodosius Dobzhansky) বিষয়টিই খুব সুন্দর করে ‘বিবর্তনের আলো ব্যতীত

অনেকেই ফরাসি প্রকৃতিবিজ্ঞানী জঁয়া ব্যাপতিস্তে ল্যামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)-এর প্রতিষ্ঠিত ল্যামার্কবাদের সাথে ‘বিবর্তন তত্ত্ব’-কে গুলিয়ে ফেলেন। এক দিক দিয়ে ল্যামার্ক-ও বিবর্তনবাদী ছিলেন কারণ তিনি মানতেন, নতুন প্রজাতিসমূহ প্রাচীন প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তিনি প্রজাতির পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় সময় এবং জৈববিবর্তনের পদ্ধতি নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। ল্যামার্ক জৈববিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে ভেবেছিলেন—একটি জীবের জীবনকালে পরিবেশ থেকে অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ‘জিরাফ’। ল্যামার্কের মতে, জিরাফের পূর্বপুরুষদের তুলনামূলক ছোট গলা ছিল এবং এরা উঁচু গাছের পাতা খেতে গিয়ে গলাটাকে লম্বা করার চেষ্টা করত। জিরাফের এই উঁচু ডাল থেকে পাতা খাওয়ার প্রবণতা পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যায় এবং বংশধরেরা লম্বা গলা লাভ করে। এমন কী, ল্যামার্ক আরো মনে করতেন, নতুন প্রজাতির বিবর্তন অল্প কিছু প্রজন্মে বা এক প্রজন্মেই হওয়া সম্ভব। ঐ সময়ে ল্যামার্কের ধারণা হয়তো ন্যায়সঙ্গত ছিল কিন্তু বর্তমানে এই ধারণাগুলি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত হয় না।^{১০} আপনি যদি কোন দুর্ঘটনায় আপনার হাত হারান, তবে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম হাতছাড়া অবস্থায় জন্ম লাভ করে না। পেশি শক্ত করতে বা বৃদ্ধি করতে আপনি যদি ভার উত্তলন করেন, তবে আপনার উত্তরসূরির কেউই সেই শক্ত পেশির বৈশিষ্ট্য জন্ম থেকেই লাভ করে আসবে না। ইহুদিরা (মুসলমানরাও) শত শত প্রজন্ম ধরে খৎনা প্রথা মেনে চলছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য জৈবিকভাবে প্রবাহিত হওয়ার কোন লক্ষণ (ছেলে সন্তানের খৎনা করা লিঙ্গ নিয়ে জন্ম) পাওয়া যায়নি।

আধুনিক বিবর্তন তত্ত্ব (নব্য-ডারউইনবাদ^{১১}) অনুসারে জিরাফের কিছু পূর্বপুরুষের ‘র্যান্ডম মিউটেশনের’ মাধ্যমে তুলনামূলক লম্বা ছিল। এরা তাদের প্রজাতির অন্য প্রাণীদের তুলনায় উঁচু ডালের পাতা খেতে পারত, এর ফলে তারা তুলনামূলক বেশি স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করে। এভাবে প্রজাতির অন্য জীবের চেয়ে লম্বা গলার জিরাফেরা বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মে লম্বা গলার জিন প্রবাহিত করে। একটি নতুন প্রজাতির বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন বা লম্বা গলার জিরাফের উদ্ভবের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

জিরাফ অথবা অন্য কোন জীবের বিবর্তনকে একটি মাত্র প্রক্রিয়ার আলোয় দেখা ঠিক হবে না। বিবর্তনের ধারণাকে দাঁড় করাতে হলে কমপক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; যথা রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণ, ভ্যারিয়েশন বা প্রকারণ, এবং সিলেকশন বা নির্বাচন। রেপ্লিকেশন হচ্ছে প্রয়োজনীয় বংশবিস্তার, প্রকারণ বলতে বোঝায় বংশধরদের মধ্যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির মাধ্যমে র্যান্ডম পরিবর্তন উদ্ভব হওয়া, যাতে তাদের পিতা-মাতার সাথে পার্থক্য সৃচিত হয়। নির্বাচন বলতে বোঝায়, যে প্রক্রিয়ায় কোন জীব পরিবেশের সাথে ভালোভাবেই অভিযোজন ঘটাতে পারে, টিকে থাকতে পারে এবং তাদের জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দিতে পারে। এই তিনটি প্রক্রিয়া প্রতিনিয়তই আমাদের প্রকৃতিতে ঘটে চলছে এবং এদের সম্মিলিত ক্রিয়াকেই আমরা বিবর্তন (ক্রমবিকাশ) বলে অভিহিত করে থাকি।

এখন যদি নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে বিবর্তন তত্ত্ব থেকে আরো ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, তবে অবশ্যই ল্যামার্কবাদের মত নব্য-ডারউইনবাদও পুরোপুরি মুছে যাবে। সৃষ্টিবাদ এবং বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা (Intelligent Design) বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্ব হিসেবে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা রাখে না কারণ এগুলো বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়াধীন নয়। এরা জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না বরঞ্চ অতিলৌকিক ব্যাখ্যা হাজির করে, যা কখনই বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করা যায় না। নব্য-ডারউইনবাদ বিবর্তনের সত্যতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং অতিলৌকিক বক্তব্য বাতিল করে।

বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সহিত বুঝতে হবে, কেন বিবর্তনকে ‘শুধুমাত্র একটি থিওরি’ বলে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিবর্তন অবশ্যই একটি তত্ত্ব যার স্বপক্ষে রয়েছে প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ আর রয়েছে জীববিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাখ্যা করার বিপুল ক্ষমতা যা জীববিজ্ঞানের অন্য কোন তত্ত্বে নেই।

অগ্রগামিতার সিঁড়ি

‘বিবর্তন’ শব্দটি অনেক সময় উন্নতি বা অগ্রগতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণেরা অনেক সময় আলাপ-আলোচনায় নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বোঝাতে ‘নৈতিক

বিবর্তন' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন; যেমন নারী অধিকারের স্বীকৃতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা। আধুনিক প্রযুক্তিকে যখন প্রাচীনকালের শিকারির অস্ত্রের সাথে তুলনা করা হয়, তখন বলা হয় 'প্রযুক্তির বিবর্তন'। আসলে এক্ষেত্রে 'বিবর্তন' বলতে এমন কিছু বোঝানো হচ্ছে যা নির্দেশ করে তুলনামূলক উন্নত পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করা। এই অজৈবিক বিবর্তনের বহুল প্রচারে কারণে মানুষ জৈববিবর্তন সম্পর্কেও ভাবে, 'নীচু থেকে উঁচু স্তরে গমনের কোন সিঁড়ি হিসেবে।'

বিবর্তনের সিঁড়ি গ্রিক এবং মধ্যযুগীয় সম্পর্কে ধারণায়। স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পঞ্চদশ থেকে ইউরোপে সবচেয়ে হিসেবে পরিচিত বিষয়গুলো এরকম : একটি পদক্রম একেবারে নীচে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা রয়েছে ঈশ্বর নিজে। অনেকটা এভাবে সাজানো : শিলা, খলিজ, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, দেবদূত, ঈশ্বর।



ধারণার মূলে রয়েছে প্রাচীন ইউরোপের বিশ্ব-প্রকৃতি এই ধারণাকে অত্যন্ত করে 'গ্রেট চেইন'; যা অষ্টাদশ শতকব্যাপী প্রভাব বিস্তারকারী মতবাদ ছিল। গ্রেট চেইন-এর মূল ঈশ্বর এবং তার সৃষ্টির (hierarchy) রয়েছে, যার রয়েছে সবচেয়ে কম জীব আর একদম শীর্ষে নীচ থেকে উপরের ক্রমটি

গ্রেট চেইন-এর এই ধারণাটি মোটেই বিবর্তনকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়নি। ঐ সময় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর বহু বছর আগে প্রত্যেক জীবকে একেবারে নিখুঁতরূপে আধুনিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। গ্রেট চেইনকে বর্ণনা করা যায় শ্রেণীবিন্যাসের একটি পদ্ধতি হিসেবে এবং ডারউইনিয় বিপ্লবের আগেই এটি জনসমর্থন হারাতে থাকে। পরবর্তীতে ডারউইনের তত্ত্ব ও এর পরিমার্জিত রূপ গ্রেট চেইনের সকল শাখা-প্রশাখা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে বিবর্তন প্রকৃতির উর্ধ্বমুখী উদ্দেশ্যের পানে কোনো অগ্রগামিতাকে নির্দেশ করে না।^৬ জিনের পরিব্যক্তি (mutation) সম্পূর্ণ দৈবচয়নের (random) ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ডারউইনের ফিন্চে (Finch) পাখির ডিএনএ নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় (Petren et al. 1999) অত্যন্ত চমৎকারভাবে জানা গেছে, 'কেন অগ্রগামিতা বা উন্নতির ধারণা বিবর্তনের সাথে মেলে না।' গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায়, প্রথম যে ফিন্চে পাখিগুলো, ওয়ার্বলার ফিন্চে (*Certhidea olivacea*) এই

দ্বীপপুঞ্জে আসে, যাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁট তাদেরকে ভাল পতঙ্গভুক বানিয়েছে। ওয়ার্বলার ফিন্চে থেকে পরে কিছু সংখ্যক ফিন্চে পাখি বিবর্তিত হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি হল *Geospiza* ভূমি ফিন্চে, তাদের বড় ও প্রশস্ত ঠোঁট বীজ ভাঙার উপযুক্ত; আরেকটি *Camarhynchus* গোছো ফিন্চে পাখি, তাদের ভোঁতা ঠোঁট গাছ-গাছড়া খাওয়ার জন্য খুব ভালভাবেই অভিযোজিত হয়েছে।

যদিও এই বীজ খেকো, গাছ খেকো ফিন্চে পাখিগুলো পতঙ্গভুক ফিন্চে পাখিগুলো থেকেই বিবর্তিত হয়েছে কিন্তু কোন বিবর্তনের সিঁড়ি অনুসারে পূর্বসূরির উত্তরসূরি অপেক্ষা উন্নত বা উচ্চশ্রেণীর নয়। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিন্চে পাখিদের বিবর্তন প্রাথমিকভাবে খাদ্যসংস্থানের উপর ভিত্তি করে তড়িত হয়েছে; যেমন ভূমির ফিন্চে পাখির বীজ, গাছের ফিন্চে পাখির গাছের বাকল এবং ওয়ার্বলার ফিন্চে পাখির পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। যদি গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে কোন কারণে বীজের সংকট দেখা দিত, তবে কল্পনা করা যায় বীজভুক ফিন্চে পাখির এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত। অন্যদিকে 'বেশ পুরনো প্রজাতি' পতঙ্গভুক ফিন্চে পাখির আরো ভালোভাবে টিকে থাকত। অর্থাৎ গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিন্চে পাখির বিবর্তনের আলোকে বলা যায়, 'উঁচু'-'নীচু' ধারণাটি জৈববিবর্তনের সাথে মোটেই সম্পর্কিত নয়। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা অভিযোজন-ই প্রধান। প্রজাতি ক্রমে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে, সেটা আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; যদি পরিবেশের কোন কারণে তীব্র পরিবর্তন ঘটে তবে যে অভিযোজন ক্ষমতা প্রজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারত, সে অভিযোজন ক্ষমতা তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজ্য নাও হতে পারে।

যদিও জীববিজ্ঞানীরা জৈববিবর্তনের ক্ষেত্রে 'গ্রেট চেইন' বা এই ধরনের অগ্রগামিতার সিঁড়ি'র ধারণাকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তবে এই ধরনের ধারণা এখনো জনসংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিসরে বিদ্যমান। একটি নির্ভুল সাদৃশ্যপূর্ণ ধারণা একটি বোম্বের মত হতে পারে, যা বিভিন্ন দিকে তার ডালপালা-শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে। বিবর্তনকে যদি এভাবে চিন্তা করা যায়, তবে উন্নতির ধারণার দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে; কারণ একটি বোম্বের শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দিকে তিন মাত্রাতেই বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং নতুন শাখা পুরনো শাখার কাছের গুঁড়ি হতে অধিক দূরবর্তী কোন গুঁড়ি সৃষ্টি হতে পারে। একটি সদ্য নতুন গজানো শাখা পুরাতন কোনো শাখা হতে বেরিয়ে এসেছে, যেমন প্রজাতিগুলো আরেকটি প্রাচীন প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে তা কোনো অগ্রগতি বা উন্নতি নির্দেশ করে। প্রকৃতিতে টিকে থাকতে হলে প্রজাতিকে তার নিজের পরিবেশের সাথেই প্রয়োজনীয় অভিযোজন করে নিতে হবেই।

মিসিং লিঙ্ক

১৯৯৯ সালের ২২ এপ্রিল আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় একটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল, “ফসিলগুলো হতে পারে মানুষের হারানো সূত্র।” ইথোপিয়াতে আবিষ্কৃত ফসিল সম্পর্কে পত্রিকাটির ভাষ্য হচ্ছে : “...এটা হতে পারে মানুষের ঠিক আগের পূর্বপুরুষ।” আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্রুম (Robert Broom) দক্ষিণ আফ্রিকার গুহা থেকে তাঁর আবিষ্কৃত ‘এপ-ম্যান’দের ফসিল নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ‘Finding the Missing link’ (১৯৫০)। ঐ ১৯৫০ সাল থেকে পরবর্তীতে ‘মিসিং লিঙ্ক’ (হারানো সূত্র) নিয়মিত আবিষ্কার হচ্ছে। কিভাবে এই ‘হারানো সূত্র’ বারবার আবিষ্কৃত হচ্ছে?

এই সমস্যাটি ‘রূপক’ শব্দের করে দাঁড়িয়ে যখন ‘মিসিং বন্ডি, তখন রূপকার্থক জড়িত হয়ে শিকল অনেক পর্যন্ত বিস্তৃত। একেকটি



একটি ভুল উপর ভিত্তি আছে। আমরা লিঙ্ক শব্দটি আমরা একটা শিকলের সাথে পড়ি : ‘যে গেছনের সময় প্রত্যেকটি লিঙ্ক

প্রজাতিকে নির্দেশ করে; একেকটি জীবনের বৈচিত্রের সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি লিঙ্ক আরো দুটি লিঙ্কের সাথে সংযুক্ত; একটা ইঙ্গিত করে অতীতের, আরেকটি ভবিষ্যতের। একটি লিঙ্ক ভাঙার মাধ্যমে এই শিকলের অংশগুলোকে আলাদা করা যায়, মধ্যবর্তী সম্পর্কও ভেঙে দেওয়া যায়। আবার হারিয়ে যাওয়া লিঙ্ক খুঁজে পেলে পুনরায় সেই শিকল জুড়ে দেওয়া যায়।’—এই আকর্ষণীয় রূপকটির পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, এটা বহু আকাঙ্ক্ষিত অধরা ‘মিসিং লিঙ্ক’ সন্ধানের নাটক চালু রাখতে সহায়তা করে।

কিন্তু এই রূপক শব্দটি যতটা আকর্ষণীয়, ঠিক ততটাই বিভ্রান্তিকর। জীববিজ্ঞানের টাইপোলজিক্যাল (typological) যুগ থেকে প্রচলিত ছিল—‘প্রতিটি প্রজাতি জীবনের ‘গ্রেট চেইন’-এর সাথে সংযুক্ত এবং প্রজাতির সবাই অপরিবর্তিত।’ জন রে (১৬২৭-১৭০৫) এবং ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৯৭) উভয়েই জীববিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাসকরণের স্থপতি (তাঁদের কেউই বিবর্তনবাদী ছিলেন না), জীবিত প্রজাতিগুলোকে একটি ধারায় বর্ণনা করার চিন্তা করতেন। এটি এমন একটি ধারা, ঈশ্বর যা স্থাপন করে দিয়েছেন। (জন রে মনে করতেন, হুল ফুটানো পোকাকার ‘ঈশ্বর প্রদত্ত’ কাজ হল পাপীদের আঘাত করা)। কিন্তু একটা শিকলের সংযোগগুলো যেখানে ধারাবাহিকতাহীন, অপরিবর্তনীয়, এবং সহজেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, সেখানে জীবের

গ্রুপকে এভাবে সহজেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না।^৬ সাধারণভাবে আমরা ‘প্রজাতি’ বলতে বুঝি, নিজেদের মধ্যে বংশবিস্তার করতে পারে এমন গ্রুপ, যা অন্য গ্রুপের সাথে বংশবিস্তার করে না বা করতে পারে না। কিন্তু প্রজাতি স্থির নয় (সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়), আর এটাও নিশ্চিত করা কঠিন যে, কোথায় একটি প্রজাতির শেষ হবে এবং অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে। এই কারণে অনেক আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা একটি ‘পরম্পরাগত রূপক’কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন, যেখানে ক্রম হতে একটি প্রাণীর রূপভেদ (shade) উদীয়মান অন্য প্রাণীর উদ্ভবের আলো হয়ে দেখা দেয়।^৭ জীবন এভাবে কোন সংযোগের পর সংযোগের মাধ্যমে সজ্জিত নয় বরং ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই শিকল (মিসিং লিঙ্ক) যতটুকু শুনতে ‘রূপকার্থ’; বাস্তবিক (অর্থগতভাবে) এটি অনেক অনেক বেশি দূরে।

অর্থাৎ ‘রূপকার্থে শিকল’ পুরোপুরি ভুল। আজকে আমরা জীববিজ্ঞান সম্পর্কে যা জানি, এই শব্দগুচ্ছ তার কোনটাই প্রকাশ করে না। বরং চারশত বছর আগে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে যা জানা গিয়েছিল, তাই তুলে ধরে। তারপরও রূপকখাটির বর্তমানে টিকে থাকার কারণ হল এর সুবিধা; সহজেই বোঝায়, প্রজাতি হচ্ছে (জীবের মধ্যে) ‘অসংলগ্ন কতিপয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন শ্রেণীমাত্র’, দুটি প্রজাতির মধ্যকার পর্যায় নয়। স্কুলে থাকতে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো পাঠ করেছি। সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা তখন, বিবর্তনের প্রধান শাখাটি প্রায় প্রকাশ করতে পারে না যে, কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রবন্ধ, কিংবা রবার্ট ব্রুমের বই, উভয় জায়গাতেই Australopithecenes-এর আবিষ্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে; ওরা আফ্রিকান হোমিনিড^৮ আজ থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর আগে বাস করত। তারা বর্তমানের আধুনিক মানুষদের মত সোজা হয়ে হাঁটতে পারত, কিন্তু তাদের শিম্পাঞ্জি-সদৃশ বড় দাঁত ছিল এবং (শিম্পাঞ্জি-সদৃশ) ছোট মস্তিষ্ক। অস্ট্রেলোপিথেসিনরা শিম্পাঞ্জিদের টিবি উইপোকা খাওয়ার জন্য তৈরি ভোঁতা প্রান্তবিশিষ্ট সরু লাঠির তুলনায় জটিল অনুন্নত পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে পারত কিন্তু তা Homo গণ (Genus) অন্তর্ভুক্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি হাতিয়ারের তুলনায় সাদামাটাই ছিল। শরীরসংস্থানবিদ্যা আর আচরণের ভিত্তিতে দেখলে অস্ট্রেলোপিথেসিনদের ‘অর্ধ-মানব’ বলা যায়। এও মনে করা হয়, হয়তো অস্ট্রেলোপিথেসিনদের কিছু ভিন্ন জাতি থেকে Homo জিনাসের প্রথম দিককার পূর্বপুরুষ উদ্ভূত। ব্রুম সঠিক ছিলেন এবং ওয়াশিংটন পোস্টও; একটা ‘মিসিং লিঙ্ক’ সত্যিই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। নাম হচ্ছে Australopithecus। এই Homo গণের মতোই Australopithecus গণের অনেকগুলো প্রজাতি ছিল; এবং Homo জিনাসের আগের ক্রম হিসেবে আলাদা করে Australopithecus জিনাসের ধারাবাহিকতাহীন কোন রেখা অঙ্কন করা সম্ভব নয়। আর ‘হারানো সূত্র’ (Missing link) শব্দের ব্যবহারের বদলে বরং বলা উচিত আমাদের কিছু ‘ক্রম’ (grade) বা ‘রূপভেদ’ (shade) খুঁজে পেয়েছি।^৯

আমরা আমাদের শব্দ ব্যবহারকে পরিবর্তন করে ‘রূপক’-এর ভুল প্রয়োগ থামাতে পারি। ক্লাসরুমের ভিতর, পাঠ্যবইয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনায়, প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের বলা শুরু করা উচিত আমাদের ‘একটি হারানো সূত্র’ খুঁজছি, ‘হারানো সূত্রটি’ নয়। আরো ভালো হয় যে, আমরা ‘মিসিং লিঙ্ক’ (হারানো সূত্র) শব্দগুচ্ছটির স্থলে অন্য কোন নিখুঁত শব্দ ব্যবহার শুরু করি।

শুধুমাত্র শক্তিমানরাই টিকে থাকে

আজ হতে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে, বর্তমানে *Gigantopithecus* নামে পরিচিত বিশাল আকৃতির এপরা দক্ষিণ এশিয়ার বাঁশের বনে বিচরণ করত। এরা লম্বায় ৯ ফুট এবং ওজন ছিল ৬০০-১০০০ পাউন্ড, এবং বাঁশ ভাঙার জন্য এদের চোয়াল ছিল অনেকটা বর্তমানকালের চিঠি রাখার বাক্সের সমান। নিঃসন্দেহে এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী প্রজাতি। কিন্তু আজকে এই *Gigantopithecus* এপদের রয়েছে দাঁত ও চোয়ালের কিছু ফসিল, যা জাদুঘরের ভল্টে সংরক্ষিত।

যদি শুধু শক্তিমানরাই টিকে থাকে, তবে কিভাবে *Homo* গণের (Genus)-এর অন্তর্ভুক্ত দ্বিপদী আদিমানবেরা *Gigantopithecus* এপদের তুলনায় অর্ধেক মাত্র শারীরিক কাঠামো নিয়ে একই সময় একই স্থানে জীবন ধারণ করেছিল? এই জীবদের মধ্যে কি কোন সংঘর্ষ হয়নি, যার ফলে এই সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী এপদের বিনাশ ঘটে?

গতকালের দানবরা হতে পারে। যদি শুধু টিকে থাকে তবে এখন হয়তো পৃথিবীতে কোনোভাবে যদি সকল মানসিক বিকাশ কেড়ে মানুষেরা পৃথিবীতে মতই হবে।



আজ জাদুঘরের নিদর্শন শক্তিশালী বা বলবানরা কিভাবে এটা সম্ভব? মানুষ রাজত্ব করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রপাতি এবং তার নেওয়া যায়, তবে এই সবচেয়ে অসহায় প্রাণীদের

শক্তিমত্তা বিভিন্নভাবে পেশিশক্তি একটি মাত্র মস্তিষ্ক হতেও পারে। ‘শক্তিমত্তা’র এই বিভিন্ন বাদ পড়ে যায়। আমরা যখন ‘শক্তিশালী’, কিংবা ‘সবচেয়ে উপযুক্ত’ শব্দগুলো ব্যবহার করি তখন বেশির লোকই তৎক্ষণাৎ ভেবে বসে কতিপয় একক সত্তার মধ্যে প্রতিযোগিতা; যারা কোনো বিবর্তনের মঞ্চে লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়েছিল বেঁচে থাকতে এবং সঙ্গীর জন্য। শক্তিশালীরাই বাঁচে এবং তাদের জিন পৌছে দেয় পরবর্তী বংশধরদের কাছে আর পরাজিতরা তাদের বংশধরসহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এই ধরনের ‘একটি স্থানে প্রতিযোগিতার একক লড়াইয়ের’ মনঃকল্পিত ধারণা খুবই সাধারণ মানের। বাস্তবে প্রত্যেক এককই ডজনেরও অধিক স্থানে ডজনেরও অধিক বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়। হয়তো প্রতিটি জীবের একটার সাথে আরেকটার সরাসরি একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কিন্তু প্রতিদিনই এদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করতে হয়। যদি নদী শুকিয়ে যায়, তবে পানি রক্ষার জন্য, তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গেলে, তাপ রক্ষার জন্য (বেঁচে থাকতে হলে) আমাদের-আপনাকে নামতে হবে। নিরামিষ যা খাওয়া হয়, যদি এগুলোর স্বাস্থ্যগুণ পরবর্তীতে হতে থাকে তবে বিপাকক্রিয়ার বহুমুখিতার মুখোমুখি হতে হবে।

অল্পকথায়, একটি ময়দানে এককের মধ্যে লড়াইয়ে যেমনটা বোঝানো হয়, ‘বেঁচে থাকার লড়াই’—ধারণাটি তার থেকে অনেক বেশি জটিল। টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক জীবকে বিভিন্ন ফ্যাক্টর (খাদ্যের সংকট, বাসস্থানের সংকট, সীমিত সম্পদ, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি)-এর সাথে সংগ্রাম করতে হয় এবং প্রায়ই একই সময়ে একাধিক ফ্যাক্টরের সাথে লড়াই হয়। জীববিজ্ঞানে এই ফ্যাক্টরগুলিকে বলে ‘*Selective Pressures*’।

Selective Pressures পরিবর্তিত হতে পারে। একটি সিলেক্টিভ প্রেসার একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্য হয়তো প্রবল চাপ সৃষ্টি করে বিবর্তনের ক্রম তৈরি করতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে এই সিলেক্টিভ প্রেসার দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। পরিবেশ যেখানে সর্বদাই পরিবর্তনশীল কোন প্রজাতিই সেখানে নিশ্চিত হতে পারে না, আগামী কোন কোন সিলেক্টিভ প্রেসারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ ধরনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণায় সব প্রজাতিই পরিবেশের পরিবর্তন হওয়াকে বাধা দিতে চায়। (হরিণ কি কখনো বন্দুক আবিষ্কারের কথা ভেবেছিল?)। বিবর্তন সর্বদাই ক্রিয়াশীল; প্রজাতিকে অতীত ও বর্তমান পরিবেশে অনুসারে আকার লাভ করে, কিন্তু কখনো ভবিষ্যৎ ‘দেখে’ না।^{১০}

আমরা মানুষেরা এবং সকল জীব কোন একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে বাঁচি না; আমরা বাঁচি নিয়ত পরিবর্তনশীল ও অকল্পনীয় রকমের জটিল বিশাল সিলেক্টিভ প্রেসারের জালের সাথে লড়াই করে। ‘টিকে থাকার লড়াই’ সাদামাটাভাবে জীবের নিকট সদস্যদের পরাজিত করা থেকে আরো ব্যাপক অর্থ ধারণ করে।

কেন বিবর্তন সম্পর্কে এই ধরনের একক লড়াইয়ের ‘উপকথা’ (myth) রয়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে রেনেসাঁস যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্যবোধের মধ্যে; যা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করাটা জটিল বটে।^{১১} কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর (হার্বার্ট স্পেনসার প্রণীত) ‘সামাজিক ডারউইনবাদ’ (Social Darwinism)-এর স্পষ্টই সম্পর্কিত। সামাজিক ডারউইনবাদীরা চার্লস ডারউইনের জৈববিবর্তনের মূল ধারণাগুলোকে মানবসমাজ এবং অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করেছেন। তাদের মতে, মানবসমাজের অপূর্ণতাগুলোকে সরিয়ে দেবার মাধ্যমেই কেবল প্রগতি আসবে এবং

এটা প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি সম্ভব। প্রতিযোগিতার বিষয়টাকে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয় হার্বাট স্পেনসারের সেই বিখ্যাত টার্ম দিয়ে : ‘Survival of the fittest’ (জোর যার মূলস্কু তার); যা প্রকাশ করে ইন্ডিভিজুয়ালদের মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে। লক্ষণীয় যে আজকালকার টিভি-রিয়েলিটি অনুষ্ঠানগুলোও এই রূপক শব্দমালায় ডুবে আছে; যেখানে টিকে থাকার ধারণায় নির্মম ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই শ্রেয়তর।

বিবর্তন সম্পর্কে এই মিথ বা উপকথাকে ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে ভাল পছন্দ হচ্ছে, সবাইকে এই শিক্ষা দেওয়া যে পেশিশক্তি দীর্ঘ সফলতার নিশ্চয়তা দেয় না। সত্যি বলতে, কোনো একক বৈশিষ্ট্যই তা দেয় না। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের বুঝতে হবে, দীর্ঘ সফলতার কেন একক কোনো চাবিকাঠি নেই? কারণ আমরা জানি না, আমাদের পরিবেশ কিভাবে-কখন পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য, টিকে থাকতে হলে একমাত্র আশা নমনীয় থাকা এবং অভিযোজন করা। এই অভিযোজন ক্ষমতাই হল প্রকৃত শক্তি, যা জেনেটিক ভ্যারিয়েশন থেকে আসে।

উপসংহার

সাধারণ মিথগুলোর উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের যে চিত্র আমরা এঁকেছি, বলা যায় ‘বিভ্রান্তির এক মোজাইক’। বিভ্রান্তির এই প্রতিধ্বনি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমরা নিজেদের সম্পর্কে এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রজাতি সম্পর্কে কিভাবে ভাবি, আমরা বিবর্তনকে কিভাবে বুঝতে পারি তার সাথে সরাসরি সংযুক্ত। হয় আমরা নিজেদের জীবজগত থেকে ‘আলাদা’ করে দেখি পৃথিবী বিবর্তনের এক নাট্যমঞ্চ^{১২} অথবা আমরা নিজেদেরকে দুনিয়া জুড়ে ঘটে চলা অনেক প্রজাতির সহবিবর্তনের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করব। প্রথমটি তখনই ঘটবে যখন আমরা অপ্রচলিত এবং ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা বিবর্তনকে বর্ণনা করে যাব। আর দ্বিতীয় যেটা সঠিক, প্রকাশ করবে ভাষার তুলনামূলক নির্ভুল ব্যবহার এবং গত ১৫০ বছরে জীববিজ্ঞান হতে কি শিখেছি তা স্বীকার করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে।^{১৩}

বিবর্তন সম্পর্কে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে গেলে অবশ্যই বিবর্তন কি, বিবর্তন কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করতে ভাষা ও শব্দের সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

নোট

১. জীববিজ্ঞানের বইয়ের উপর একটি স্টিকার লাগানো হয়েছে, যেখানে লেখা রয়েছে: “পাঠ্যপুস্তকটি বিবর্তনের ওপর। জীবনের উৎসের আলোকে বিবর্তন একটি নিছক থিওরি মাত্র, বাস্তব কোন ঘটনা নয়। খোলা মনে এর বিষয়বস্তু দেখা উচিত, সাবধানতার সাথে পাঠ করা এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা উচিত।”—এই বক্তব্য যোগ করার কারণে ‘Cobb County School District

বনাম Selman’ মামলা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ২০০৫ সালের ১৩ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় বিচারালয় পাঠ্যবইয়ে এই ধরনের স্টিকার লাগানোকে ‘অসাংবিধানিক’ বলে রায় প্রদান করে।

২. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : “What’s Wrong with ‘Theory not Fact’ Resolutions.” *National Center for Science Education*. 7 December 2000. Available at: www.ncseweb.org/resources/articles/8643_whats_wrong_with_theory_not_%2012_7_2000.asp.
৩. ফলের মাছির উপর সদ্য পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা গেছে, কিছু বংশগতির ইনস্ট্রাকশন হয়তো ডিএনএ’র মধ্যে সংকেত আকারে আবদ্ধ থাকে না, বরং এই উপাদানগুলো ডিএনএ’র চতুর্দিকে আবদ্ধ থেকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে পৌঁছায়। (Lin et al. 2004)।
৪. নিউ-ডারউইনিজম (বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব নামেও অভিহিত করা হয়) ১৯৩০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; যা ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সাথে থ্রেগর মেডেল এবং পরবর্তী অন্যান্য জীববিজ্ঞানী দ্বারা প্রবর্তিত বংশগতির উত্তরাধিকার তত্ত্ব অঙ্গীভূত করে।
৫. জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে ‘জটিলতা সম্পর্কিত বিবর্তনীয় প্রবণতা’ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে; কারণ সাধারণভাবে কিভাবে জটিলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হবে এবং এর পরিমাপ করা হবে।
৬. প্রজাতির ধারণাটি Strickberger (1985:747-756) থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে আমরা কিভাবে প্রজাতিকে সংজ্ঞায়িত করে থাকি, তা Mallet (1995)-এর লেখা থেকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৭. বাঘ ও সিংহ একসময় প্রকৃতিগতভাবে ভারতে সহাবস্থান করত। বাহ্যিকভাবে খুবই ভিন্ন হলেও তারা অনেক সময় পরস্পরের সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে টাইগন বা লাইগার জন্ম দিতে পারে। (বিপরীত লিঙ্গের বাঘ ও সিংহকে বন্ধ অবস্থায় রাখলে অনেক সময় এটি ঘটে থাকে)। তবে এরকম সংকর জাত সচরাচর প্রকৃতিতে দেখা যায় না; কেননা তারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে সংকর বাচ্চা জন্ম দেয় না। তাই বাঘ ও সিংহকে ‘জিনগতভাবে একই প্রজাতি’তে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় কিন্তু তাদের বাহ্যিকভাবে বা আচরণগতভাবে এতই ভিন্নতা রয়েছে যে তাদেরকে জীববিজ্ঞানীরা আলাদা আলাদা প্রজাতিতে ফেলতে পারেন এবং প্রকৃতিতে এরা নিজেরা আপন স্বাভাবিক বজায় রাখে। দ্রষ্টব্য : Wilson 1977:7।
৮. হোমিনিডরা (Hominids) বৃহৎ প্রাইমেট, যারা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে। ঐ *Australopithecus* গণ বা Genus (যা মানুষের গণ ‘Homo’-এর পূর্ববর্তী)-কেই *australopithecines* বুঝিয়ে থাকে। ৪০ লক্ষ বছর আগে তাদের দেখা যেত।

হোমিনিডের অনেকগুলো ভ্যারাইটি অতীতে অস্তিত্বশীল ছিল কিন্তু বর্তমানে শুধু *Homo sapiens sapiens*-রাই টিকে রয়েছে।

৯. 'মিসিং লিংক' রূপক শব্দটির ব্যবহারে মনে হতে পারে, যে কোন প্রজাতিকে কেবলমাত্র একটি চেইন দ্বারা উপস্থাপন করা যায়; যেমন হোমিনিডদের রেখাচিত্রে দেখা যায় প্রথমে হাতের আঙুলগুলোর উপর ভর করে হাঁটা (knuckle-walking), পরে কুঁজো বা আধাদণ্ডায়মান অবস্থা এবং তারপর পুরো দণ্ডায়মান আধুনিক মানুষ। অবশ্য এই রেখাচিত্র অন্যান্য দ্বিপদী হোমিনিড যেমন *robust australopithecenes* (৪০ লক্ষ বছর আগে তাদের দেখা যেত এবং ১০ লক্ষ বছর আগে এরা বিলীন হয়ে গেছে) অথবা নিয়াডার্ভাল প্রজাতি (৩ লক্ষ বছর আগে তাদের দেখা যেত এবং ৩০ হাজার বছর আগে এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, তা প্রদর্শন করে না। এ ধরনের বর্ণনা শুধু একটি অখণ্ড চেইনকে বুঝাতে পারে, যথা চতুর্পদী থেকে দ্বিপদী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক দ্বিপদী ছিল যারা পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, উপরন্তু অনেক চতুর্পদী প্রজাতি বর্তমানে টিকে রয়েছে।
১০. মানব প্রজাতি আসলেই অনন্যসাধারণ কর্মী। আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে পারি, সব ধরনের সামাজিক-জৈবিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। বিভিন্ন জটিল সামাজিক সম্পর্ক ও বৈবাহিক নিয়ম যা মানব জনপুঞ্জতে জিন-প্রবাহ নিশ্চিত করে, তা সামাজিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। জনসাধারণকে পোলিও ও গুটিবসন্তের টিকা দান জৈবিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।
১১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন : Shanahan (2004); এ বিষয়ে আরো আকর্ষণীয় বক্তব্য পাওয়া যাবে : Commager (1965:82-83), and Butterfield (1965:222-246)।
১২. আমরা মনে করি, মানবজাতির এই দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত সম্পদের অপব্যবহারে অবদান রাখছে; যেমন সমুদ্রে মাছ শিকারের নতুন এলাকা আবিষ্কারের সাথে সাথেই মানুষ সেখান থেকে অবিরাম মাছ শিকারে নেমে পড়ে। দ্রষ্টব্য : Jackson et al. (2001)।
১৩. আমরা যেসব পুরাতন শব্দগুচ্ছ বা অভিব্যক্তি ভুলভাবে ব্যবহার করি, সেগুলো শুধু ব্যাখ্যা করলে হবে না বরং এর সাথে সাথে নতুন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ-ও তৈরি করে নিতে হবে। পুরাতন শব্দগুচ্ছকে ধরে রেখে কি লাভ, যখন এগুলো সঠিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করে না? উদাহরণস্বরূপ 'বিবর্তনের সিঁড়ি' (The Ladder of Evolution) শব্দগুচ্ছের আমরা পরিবর্তে বলতে পারি 'বিবর্তনের ঝোপময় পথ' (The Bush of Evolution) বা 'বিবর্তনের সর্পিলা পথ' (The Labyrinth of Evolution)।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- ◆ Brooks, D.J. 2001. Substantial numbers of Americans continue to doubt evolution as explanation for origins of humans. The Gallup Organization. Available online at www.gallup.com/poll/content/login.aspx?ci=1942.
- ◆ Broom, R. 1950. *Finding the Missing link*. London: Watts & Co.
- ◆ Butterfield, H. 1965. *The Origins of Modern Science*, New York: Macmillan.
- ◆ CBS News Pools. 2004. Creationism trumps evolution. CBSNEWS.com. Available online at www.cbsnews.com/stories/2004/11/22/opinion/polls/main657083.shtml.
- ◆ Commager, H.S. 1965. *The Nature and study of History*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Books.
- ◆ Dobzhansky, Theodosius. 1973. Nothing in Biology makes sense except in the light of Evolution. *The American Biology Teacher* 35:125-129.
- ◆ Jackson, J., M. Kirby, W. Berger, K. Bjorndal, L. Botsford, et al. 2001. Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. *Science* 297:629-637.
- ◆ Lin, Q., Q. Chen, L. Lin, and J. Zhou. 2004. The Promoter Targeting Sequence mediates epigenetically heritable transcription memory. *Genes & Development* 18:2639-2651.
- ◆ Mallet, J. 1995. A species definition for the modern synthesis. *Trends in Ecology and Evolution* 10:294-299.
- ◆ National Science Board. 2000. *Science and Engineering Indicators*. Washington, D.C. US Government Printing Office. Available online at www.nsf.gov/sbe/srs/seind/pdf/c8/c08.pdf.
- ◆ Petren, K., B.R. Grant, and P.R. Grant. 1999. A Phylogeny of Darwin's finches based on microsatellite DNA length variation. *Proceedings of the Royal Society of London* B266: 321-329.
- ◆ Shanahan, T. 2004. *The Evolution of Darwinism: Selection, Adaptation and Progress in Evolutionary Biology*. New York: Cambridge University Press.
- ◆ Strickberger, M.W. 1985. *Genetics*. New York: Macmillan.
- ◆ Suplee, C. 1999. Fossil find may be that humans' immediate predecessor. *The Washington Post*, April 23. pp. A3, A11.
- ◆ Wilson, E.O. 1977. *Sociobiology*. Harvard, Massachusetts: The Belknap press of Harvard University Press.

বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণে বাধা কোথায়

বিরঞ্জন রায়*

এক

একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আপাত একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তা দীর্ঘদিনের মানব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের সঙ্গে ‘আবিষ্কারক’ বিজ্ঞানীর সমসাময়িক পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফসল। এটি (তত্ত্ব) একজন অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীর মনে তার সুনির্দিষ্ট রূপটি নেয়। বিবর্তন তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তা সত্য। বিবর্তন তত্ত্ব তখনই আবিষ্কৃত হয়েছে, যখন এর সহায়ক বিজ্ঞানের শাখাসমূহ, যথা ভূতত্ত্ব, ফসিলতত্ত্ব, প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে এবং ইউরোপের সমাজ মানসে দুনিয়াকে নতুন করে দেখার প্রণোদনা তৈরি হয়েছে। এ জন্য দুজন ভিন্ন ব্যক্তি ডারউইন এবং ওয়ালেস স্বতন্ত্রভাবে একই সময় একই তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন। একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গভীর বিবেচনায় যেমন সামাজিক ফসল, তেমনি একটি তত্ত্বের কার্যকারিতা নির্ভর করে সমাজমানসে তার বিস্তারের উপর। সে জন্যই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ প্রাচীন গ্রিকযুগে প্রস্তাবিত হলেও তা পৃথিবীর পাতাতেই সীমিত থেকে যায়; কপার্নিকাসের মতবাদের মতো সমাজমানস পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি। শূন্যের আবিষ্কার ভারতবর্ষে হলেও, তা জ্ঞানচর্চায় এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে আরবদের দ্বারা এর ব্যবহারিক রূপের প্রচারের পরই।

একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমাজকে দুভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত তত্ত্বের প্রযুক্তিগত প্রয়োগে সমাজের বস্তুগত-সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে, যা আবার মানস-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয়ত তত্ত্বটি দুনিয়াকে জানা-বুঝার সীমাকে প্রসারিত করে সরাসরি মানস-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তিত মানস আবার সমাজের বস্তুগত-সংস্কৃতি পরিবর্তনে সক্রিয় হয়। মানস-সংস্কৃতি পরিবর্তনের নিরিখে সব তত্ত্বই তুল্যমূল্য নয়। ব্যক্তির দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টি বা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহেরই মানস-সংস্কৃতি প্রভাবিত করার ক্ষমতা বেশি। যেমন, শুধুমাত্র আবিষ্কারের নিরিখে কপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ কিংবা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের তুল্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আরো রয়েছে। কিন্তু এ দুটি তত্ত্ব সমাজমানসে যে আলোড়ন

* বিরঞ্জন রায় : পেশায় চিকিৎসক, সমাজ-সচেতন বিজ্ঞান লেখক। *বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ*-এর সাথে জড়িত।

তুলেছে, অন্য তত্ত্ব ততটা তুলেনি। কপার্নিকাসিয় আলোড়ন এক শতাব্দীতেই থিতু হয়ে গেছে। সমাজমানস নিজের আবাস পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার পরিবর্তে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে মেনে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত আবিষ্কার মহাবিশ্বের পরিধিকে অকল্পনীয়রূপে প্রসারিত করে, সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতকে যে ক্রমেই প্রান্তীয় অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে, এতে সমাজমানসে মাথা-ব্যথা নেই। অন্যদিকে জীববিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার যদিও বিবর্তন তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়ে ক্রমেই সুদৃঢ় করে তুলেছে; তবুও বিগত দেড়শ বছরেও এ নিয়ে বিভ্রান্তি, সংশয় ও বিতর্ক থামেনি। সমাজমানস সর্বসম্মতিক্রমে একে গ্রহণ করতে পারেনি। এটা কি এজন্য যে, কপার্নিকাসিয় তত্ত্ব যেখানে মানুষের বাসস্থানকে কেন্দ্রীভূত করেছিল, সেখানে বিবর্তনতত্ত্ব তার নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থানকেই টলিয়ে দিয়েছে? কোন ব্যক্তি যেমন আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার স্তর (যেখানে ব্যক্তি নিজেই সর্বকিছুর কেন্দ্র মনে করে) পার হয়েই নিজের বাস্তব অবস্থানকে (যেখানে ব্যক্তি বাস্তবতার অংশমাত্র; কেন্দ্র নয়) মেনে নিতে পারে, যা তার মানস বিকাশের নির্দেশক; সমাজমানস বিকাশের স্তরগুলোও তেমন। সমাজমানসে বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণে বাধাগুলোর মধ্যে এ মনস্তাত্ত্বিক বাধাটি অন্যতম। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বাধা রয়েছে। বিষয়টি গুরুতর অনুসন্ধানের দাবি রাখে। এ প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলাভাষীদের জন্য কলম ধরেছেন তীক্ষ্ণচী চিন্তক মনিরুল ইসলাম। তাঁর বই ‘জৈববিবর্তনবাদ : দেড়শ বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ’ (প্রথম সংস্করণ ২০০৭, সংহতি প্রকাশন, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা)। নামটিই অনুসন্ধানের বার্তাবহ। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের অবলম্বন উপরলিখিত বইটির পর্যালোচনা।

দুই

মনিরুল ইসলাম দেড়শ বছরের দ্বন্দ্ববিরোধের যে ধারাগুলো সংকলিত করেছেন মোটা দাগে এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : যৌক্তিক বিরোধী, অপব্যখ্যাকারী এবং অযৌক্তিক বিরোধী। যৌক্তিক বিরোধিতাগুলো মূলত বিবর্তন তত্ত্বের পদ্ধতি নিয়ে এবং এর অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো নিয়ে। বিজ্ঞান মৌলবাদীদের ধর্ম কিংবা চরমপন্থীদের রাজনীতি নয়, যে কেউ বিরোধিতা করলেই তাকে ‘মুরতাদ’ ঘোষণা করে উচ্ছেদের ডাক দেবে। বরং যৌক্তিক বিরোধিতাকে উৎসাহিত করাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অংশ। এর মাধ্যমেই একটি তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়ে চলে। বিজ্ঞান ‘চূড়ান্ত’ সত্যে বিশ্বাসী নয়, বরং মনে করে আমাদের জ্ঞান সবসময়ই অসম্পূর্ণ, যাকে অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিতে হয়। ডারউইনের সময়কার বিবর্তন তত্ত্বের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নেরই এখন মীমাংসা হয়ে গেছে; এবং সঙ্গত কারণেই আরো নতুন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে। যৌক্তিক বিরোধিতাকারীকে বিবর্তন তত্ত্বের হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সমাধান হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে নতুন বিতর্ক, যৌক্তিক বিরোধিতাকে অযৌক্তিক বিরোধিতায় পর্যবসিত করে।

অপব্যখ্যাকারীরা বিবর্তন তত্ত্বের অপব্যখ্যায় ‘সোস্যাল ডারউইনিজম’ (Social Darwinism)-এর জন্ম দিয়েছেন। সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণবাদের জীববৈজ্ঞানিক সমর্থন আদায়ই এর উদ্দেশ্য। তাদের বুলি, ‘সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট’। তাদের কাছে এর অর্থ ‘জোর যার মুল্লুক তার’। বৈষম্যমূলক সমাজে বা দুনিয়ায় যারা শাসন করছে, তারাই ফিটেস্ট; এবং জীবজগতের নিয়মেই তারা তা করছে, এতে অনায্য কিছু নেই। ডারউইন আবিষ্কৃত ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ আর ‘সোস্যাল ডারউইনিজম’ এক বিষয় নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বহুবিধ, শুধু গায়ের জোর নয়। কোন বৈশিষ্ট্যটি কখন কাজে লাগবে তা জীবটির সুনির্দিষ্ট পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে ‘অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে’! আর প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকে থাকার উপায় শুধু পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাই নয়, সহযোগিতাও বটে। মানব প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের পূর্বপুরুষ নরবানরদের যুথবদ্ধতা বা পারস্পরিক সহযোগিতাই, যৌথশ্রম এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে ভাষার ভিত্তি রচনা করেছে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উন্নততর ভাষা এবং যৌথশ্রম, আন্তপ্রজাতির সংগ্রামে কিংবা প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। ফলে বংশানুগতির স্বতঃস্ফূর্ত ইতস্তত পরিবর্তনে সেই নরবানরদের মস্তিষ্কে উন্নত ভাষার জন্য উপযোগী যে পরিবর্তন হচ্ছিল, তাই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই অভিমুখিনতা মস্তিষ্কের আরো পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপত্তি ঘটিয়েছে বিশাল মস্তিষ্কের অধিকারী মানব প্রজাতির। আর মানব প্রজাতির যৌথশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠা শ্রম বিভাজন এবং অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও সঞ্চরণের মাধ্যম হিসাবে ভাষার বিকাশ, সম্ভব করে তুলেছে একটি প্রজাতি হিসাবে তার ব্যতিক্রমী, অদৃশ্যপূর্ব অগ্রযাত্রা।

ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তন তত্ত্বের অযৌক্তিক বিরোধিতাকারীদের প্রথম দিকে রয়েছেন সনাতন বিশ্বাসী এবং ভাববাদী আদর্শবাদীরা। এঁরা বিবর্তন তত্ত্বকে দেখেছেন যথাক্রমে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইউটোপিয় আদর্শের ধ্বংসকারী হিসাবে। এদের বিরোধিতা যতটা আবেগতান্বিত ততটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। এ ধারাটি বর্তমানে সক্রিয় না থাকলেও এদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোকেই বর্তমানের অযৌক্তিক বিরোধীরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। অযৌক্তিক বিরোধীদের বর্তমান প্রতিনিধিরাই সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংগঠিত। এরা আবেগতান্বিত নয়; উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কৌশলী। এঁদের পুঁজি, জনগণের নির্বিচার বিশ্বাসী, বদ্ধ মানসিকতা। ভেক, ছদ্ম বৈজ্ঞানিক ভাষা। এদের প্রশ্নগুলো পুরানো : পরিকল্পনা তথা পরিকল্পক ছাড়া জীবজগতের মতো এমন জটিল সংগঠনের উৎপত্তি/সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব? মানুষকে স্রষ্টাহীন করে অন্য প্রাণীদের পর্যায়ে নামিয়ে আনলে, নৈতিকতার ভিত্তি থাকে কই? উল্লেখ্য, এসব প্রশ্নের যথাযথ তথ্যনিষ্ঠ, যৌক্তিক উত্তর বিবর্তন তত্ত্বের সমর্থকরা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

বর্তমানের অযৌক্তিক বিরোধীরা বিবর্তন তত্ত্বের বিকল্প হিসাবে, ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে ধর্মীয় সৃষ্টিবাদের নতুন নতুন ‘বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’ দাঁড় করায়; আর বিজ্ঞানমনস্কদের

কাছে প্রচার করে ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’ বা আইডি নামক ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ধারণা। এরা যৌক্তিক বিরোধীদের যুক্তিগুলো নিজেদের মতো ব্যবহার করে এমন একটা আবহ তৈরি করে, যেন বিবর্তন তত্ত্ব তাদের আইডি’র মতোই একটি অপ্রমাণিত প্রকল্প মাত্র। আমেরিকায় এরা আইন করে পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তন তত্ত্ব বাদ দিয়ে দিতে চায়; কিংবা বিবর্তন তত্ত্বের পাশাপাশি আই ডি’কে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। আমাদের দেশে এরা চুপি চুপি পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তন তত্ত্বকে বাদ দিয়ে দেয়। এদের লক্ষ্য এক, মানুষের চেতনাকে বদ্ধ রেখে তাদের উপর আধিপত্য চালানো। এরাই সংস্কৃতিকর্মীর প্রধান প্রতিপক্ষ।

তিন

যৌক্তিক বিরোধীরা বিবর্তন তত্ত্বের প্রতিপক্ষ নয়। অপব্যখ্যাকারীদের খোঁড়া যুক্তির ভিত্তিতে করা অপকর্ম আজ ধিকৃত। বর্তমানে সমাজমানসে বিবর্তন তত্ত্ব প্রসারের মূল বাধাটি আসে অযৌক্তিক বিরোধীদের তরফ থেকেই। এদের সামাজিক পরিচয় এবং উদ্দেশ্যটি আমরা জেনেছি। এবার অনুসন্ধান করা যাক, কেন এরা সমাজমানসে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এর পরিপূরক প্রশ্ন, সাধারণভাবে সমাজমানস বিবর্ততত্ত্ব গ্রহণে অনীহ কেন?

বিষয়টি মূলত মনস্তাত্ত্বিক। এখানে ধর্মতন্ত্রীয় মিথ এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতির প্রাধান্যশীল ধারা। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি বড় ধারাও ধর্মতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার সেকুলার ধারাটিতে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের উপাদান নেই বললেই চলে। এ ধারার শিক্ষকদের অবস্থাও তথৈবচ। কাজেই নিরক্ষর-সাক্ষর নির্বিশেষে সবাই অসচেতন বা সচেতন দুভাবেই নির্বিচার বিশ্বাস ও বদ্ধ মানসিকতার ধারক। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত দার্শনিক প্রশ্নসমূহেই এ মানসিকতা প্রকট। বিবর্তনতত্ত্ব এসবেরই একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করে। বদ্ধ মানসিকতা, তার বিশ্বাসের বিপরীত কিছুর মুখোমুখি হওয়া মাত্র দরজা বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস রক্ষার্থে অযৌক্তিক বিরোধীদের প্রচারিত খোঁড়া যুক্তিকেই নির্বিচারে আঁকড়ে ধরে।

কতক সত্যানুসন্ধানী মন, এ সংস্কৃতিতেই প্রবাহমান ক্ষীণ মুক্তচিন্তার ধারাটির প্রভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি অর্জনে সক্ষম হন। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক মানুষ এতে সক্ষম হবেন, এমনটা আশা করা যায় না। তাহলে সমাজমানসে বিবর্তন তত্ত্ব প্রসারের, তথা জনগণের মানসিক বিকাশের পথটা কী? মনে হয়, অনেকের জন্যই তা একটি সমন্বয়ের পথে আগানো; যেমনটা ইউরোপের ধর্মতন্ত্রে বিশ্বাসীরা করেছেন : ‘ঈশ্বর বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবজগত সৃষ্টি করেছেন।’ ধর্মতন্ত্রে বিশ্বাসীরা এর আগে ভৌত-বিজ্ঞানকে গ্রহণের বেলাতেও একই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসী নিউটন পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন, ভৌত-ঘটনাবলী ব্যাখ্যার জন্য এর বাইরে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলেই মনে করতেন। তিনি ঈশ্বরকে স্থান

দিয়েছিলেন আদি কারণ হিসাবে। অর্থাৎ ঈশ্বর এমন নিয়মেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন যে, একবার সৃষ্টি হবার পর এটি ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়া, নিজ নিয়মেই চলতে সক্ষম। বিজ্ঞানের কাজ এসব নিয়ম আবিষ্কার করা। বিশ্বাসীদের এই যুক্তি, জড়জগতে কাজ করলে জীবজগতে করবে না কেন?

দার্শনিক দৃষ্টিতে এটি কিছুটা গৌজামিল বটে। তবে মানসিকতা বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি মধ্যবর্তী স্তর। অনেক মন হয়তো কখনোই এ স্তর অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিতে কতক অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে হয়, নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিতে হয়। নিশ্চিতভাবে অনিশ্চিত এ সংসারে ক'জন এমন নির্ভীক হতে পারে? এ মধ্যম স্তরটি বিবর্তন তত্ত্ব বিরোধী নয় এবং যুক্তিহীন বিরোধীরা এদের ব্যবহার করতে পারে না। সমাজমানসে বিবর্তনতত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে সংস্কৃতিকর্মীকে জনগণের মানসিকতা বিকাশের স্তরগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

আর্ডি—আমাদের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল

বন্যা আহমেদ*

কিছুদিন ধরে কটরপন্থী ধর্মীয় এবং সৃষ্টিবাদী (Creationist) ইন্টারনেট সাইটগুলোতে যেন উৎসবের সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। দেড়শ' বছর পরে 'বিশ্বমানবতার শত্রু' চার্লস ডারউইনকে ভুল প্রমাণ করা গেল। কিভাবে? প্রায় ৪৪ লক্ষ বছর আগের 'প্রায়-মানুষ' আর্ডি (*Ardipithecus ramidus*)-এর ফসিল আবিষ্কার নাকি ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে? শুধু কী পাশ্চাত্যের ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী লক্ষ্যবস্তু করছে, জানা গেল প্রাচ্যে আল-জাজিরা'র মত খানিকটা উদার দৃষ্টিসম্পন্ন গণমাধ্যমও বিজ্ঞানীদের আর্ডি নিয়ে গবেষণার খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই ফলাও করে প্রচার শুরু করেছে, 'এতদিনে পশ্চিমা বিশ্বের বিপথগামী বিজ্ঞানীরা হুশ ফিরে পেয়েছেন, বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন ডারউইনের দেওয়া মানুষের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটা আসলেই ভুল ছিল!''

কিন্তু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, বিবিসিসহ বিভিন্ন চ্যানেলের ওয়েব সাইটে এ নিয়ে টুকরো টুকরো খবর পড়লাম, কিন্তু কোথাও-ই বিজ্ঞানীদের 'নাকে খত' দিয়ে ভুল স্বীকার করতে দেখলাম না, বরং উল্টোটাই শুনলাম কয়েকদিন ধরে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'ফ্রম দ্যা হরসেস মাউথ', যার অর্থ হচ্ছে কোন খবরের উৎস থেকে সরাসরি শোনা। তাই যখন ডিস্কোভার চ্যানেলে আর্ডির ওপর ২ ঘণ্টার একটি ডকুমেন্টারি সম্প্রচারের কথা শুনলাম, তখন ভাবলাম যাক এবার তাহলে 'স্বয়ং ঘোড়া'দের মুখ থেকেই আসল কথাটা শোনা যাক। যেসব বিজ্ঞানী আর্ডির ফসিল ১৯৯৪ সালের দিকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫ বছর ধরে তা নিয়ে গবেষণার কাজে ব্যস্ত আছেন তাদের কাজ এবং তার বিশ্লেষণ নিয়ে এ অনুষ্ঠান। তারপর আবার না চাইতেই, ২ ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের পরে এই বিজ্ঞানীদের নিয়েই এক ঘণ্টার এক আলোচনা সভা। দেখলাম। কিন্তু যেরকমটা সৃষ্টিবাদীরা দাবি করছিল, সেরকম মোটেই নয়। সব বিজ্ঞানীরাই বরং 'বুক ফুলিয়ে' ব্যাখ্যা করছেন আর্ডি কিভাবে ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তন

* বন্যা আহমেদ : পেশায় সিস্টেম এনালিস্ট। মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) ওয়েবসাইটে 'বিজ্ঞান লেখক' হিসেবে সুপরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বিবর্তনের পথ ধরে', অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

তত্বকে আরো জোরদারভাবে ব্যাখ্যা করছে এবং আমাদের চোখের সামনে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসকে পরিষ্কার করে তুলে ধরছে।

তাহলে কেন বলা হচ্ছে, ‘ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্বকে ভুল প্রমাণ করেছে আর্ডি’র ফসিল?’ পৃথিবীর তাবৎ জীব কি তাহলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভব হয়নি। তারা কি তাহলে প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে ‘সৃষ্টি’ হয়ে পৃথিবীতে এসে জুটেছে?—এরকম প্রশ্নগুলো আজকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বসে শুনতে হচ্ছে, সেটা মেনে নেওয়াই কষ্টকর। আল-জাজিরা’র মত তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ সংবাদ সংস্থা যদি এরকম মিথ্যে খবর প্রচার করে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে, তাহলে দুঃখজনক হলেও এই মিথ্যে প্রচারণাকে খণ্ডন করা ‘ফরজ’ হয়ে দাঁড়ায়। ‘মানুষের উৎপত্তি নিয়ে ডারউইনের বিবর্তন তত্ব ভুল’—আজকে বিজ্ঞানীদের সামনে এই প্রশ্নটা ‘পৃথিবীটা কি আসলেই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে’—এমন প্রশ্ন করারই সামিল।

বিবর্তন তত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করেনি আর্ডি’র আবিষ্কার, বরং একে আরও বিস্তৃত করেছে। বিজ্ঞান-জগতের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত জার্নাল *Science*-এ আর্ডির উপর ১১টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবর মাসে। ডিস্কোভারি চ্যানেলে যে বিজ্ঞানীরা আর্ডি’র ওপর সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তারা সহ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন মোট ৪৭জন বিজ্ঞানী লিখেছেন এ প্রবন্ধগুলো আর্ডি সংক্রান্ত দীর্ঘ ১৪-১৫ বছরের গবেষণা এবং সিদ্ধান্তগুলোকে ব্যাখ্যা করে। বিজ্ঞানীরা তাদের এই প্রবন্ধসংকলনের ভূমিকাটা (*Light on the Origin of Man* প্রবন্ধে) শেষ করছেন এই বলে : “মানুষের বিবর্তনের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বটা সম্পর্কে আমরা বেশ ভাল করে জানি, আমরা এ সময়ের অনেক ফসিল রেকর্ডই খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা এবং তারও আগে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ভাগ হয়ে যাওয়ার সময়ে এবং ঠিক আগের বনমানুষদের তেমন কোন ফসিল পাওয়া যায়নি। *Ardipithecus ramidus* আমাদেরকে এই দুটো সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে সহায়তা করছে। আর্ডি আমাদেরকে ডারউইনের লেখা ‘*অরিজিন অব স্পিসিজ*’ বইটির শেষ কথাগুলো আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে : There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.”^২

অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা নিজেরাই বলছেন, আর্ডি’র এই আবিষ্কার ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্বকেই শক্তিশালী করছে। তাহলে বলা যায়, আল-জাজিরা এবং সৃষ্টিবাদী

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবরগুলো শুধু ভিত্তিহীন নয় বরং তা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৈরি বানোয়াট গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষ আর শিম্পাঞ্জি কি একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে?

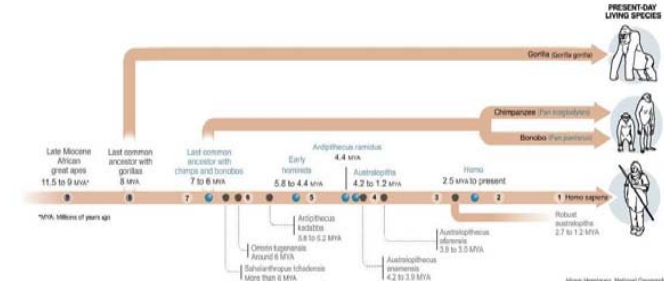
অতীতে যখন কেউ ভুল করে বলেছেন, মানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে এসেছে তখন শুধু বিজ্ঞানীরা নয়, বিবর্তনের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা মানুষজন অত্যন্ত সতর্কভাবে সংশোধন করে দিয়েছেন : না, আমরা মানুষরা সরাসরি শিম্পাঞ্জি থেকে বিবর্তিত হয়নি; বরং শিম্পাঞ্জি, বনোবো (Bonobo, এক ধরনের খর্বাকৃতি শিম্পাঞ্জি) এবং মানুষ একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে যার যার আলাদা পথে বিবর্তিত হয়েছে গত ৭০-৮০ লক্ষ বছর ধরে। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ নামক প্রজাতি দুটি একে অপরের নিকটতম আত্মীয় হলেও তারা কেউ একে অপর থেকে সরাসরি আসেনি বা বিবর্তিত হয়নি। জীববিজ্ঞানে এই দশকের অন্যতম বড় অর্জন হচ্ছে মানুষের জিনোমের পূর্ণ সংশ্লেষণ। ২০০৫ সালে শিম্পাঞ্জির জিনোমের সংশ্লেষণ করা হয়। জিনোম সংশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই শিম্পাঞ্জি আর মানুষের জিনের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৮.৬%; অর্থাৎ শিম্পাঞ্জিরা যে মানুষের নিকটতম আত্মীয় তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে। আর্ডি’র ফসিল কি মানুষের বিবর্তনের ধারার এই মূল ব্যাখ্যা থেকে সরে এসেছে? আমরা কি তাহলে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ (Common Ancestor) থেকে আসিনি?

আবারও দেখা যাক বিজ্ঞানীমহল কি বলছেন এ প্রসঙ্গে। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক* আর্ডি’র খবর প্রকাশের সাথে ‘*Ardipithecus Ramidus Lights the Way*’ শিরোনামে মানব বিবর্তনের একটি সময়সূচি প্রকাশ করে। শিরোনামের ঠিক নীচে ইংরেজিতে লেখাটিকে বাংলা করলে দাঁড়ায় : ‘এই নতুন কঙ্কালটি শিম্পাঞ্জি আর আমাদের সর্বশেষ সাধারণ পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো খোলসা করে দিয়ে বিবর্তনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক পূরণ করলো। তবে এখনও অনেক অজানা বহু কিছুই আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।’

নীচের সময়সূচি^৩ খেয়াল করলে এখনকার আধুনিক বনমানুষ বা এপদের (গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনোবো) সাথে মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষদের ভাগ হয়ে যাওয়ার সময়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। ৮০ লক্ষ বছর আগে গরিলারা ভাগ হয়ে গেছে আধুনিক মানুষ, শিম্পাঞ্জি এবং বানরের ‘সাধারণ পূর্বপুরুষ’ থেকে। তারপর ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের মানুষের পূর্বপুরুষেরা ভাগ হয়ে গেছে শিম্পাঞ্জি এবং বনোবোর (Bonobo) পূর্বপুরুষ থেকে।

Ardipithecus Ramidus Lights the Way

The new skeleton fits in a crucial gap in our evolutionary history and clarifies the identity of our last common ancestor with chimps. But much more remains to be discovered.



ছবি-১ : আধুনিক বনমানুষের সাথে মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষের ভাগ হয়ে যাওয়ার সময়সূচি

আর্ডির আবিষ্কার এবং গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানী টিম ডি হোয়াইট, হাইলে সেলাসি, ওয়েন লাভজয়-সহ ৭ জন বিজ্ঞানীর ‘সাইন্স’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘Ardipithecus ramidus and Paleobiology of Early Hominids’ শেষ ক’টা লাইন এখানে প্রশিধানযোগ্য : “সম্ভবত *Ar. ramidus*-এর সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, সে ডারউইনের দেওয়া ব্যাখ্যাকে জোড়ালোভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে : মানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে সরাসরি বিবর্তিত হয়ে আসেনি; বরং এসেছে সুদূর অতীতে, মিওসিন যুগে আফ্রিকায় জঙ্গলে বিচরণ করা শিম্পাঞ্জি আর মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে বিবর্তিত হওয়া বিভিন্ন আদিপুরুষ থেকে।”

তাহলে এই মুহূর্তে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা আর্ডির খোঁজ পাওয়ার আগে মানব বিবর্তনের মূল ধারা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন এখনও তাকেই আরো স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। বিবর্তনের মূল তত্ত্ব তো বটেই, মানুষ আর শিম্পাঞ্জি যে একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে তা নিয়েও সংশয়ের বিন্দুমাত্র কোন অবকাশ নেই।

আর্ডি নিয়ে এত হৈচৈ কেন?

চার্লস ডারউইন এবং টমাস হাক্সলি গত শতাব্দীর শেষের দিকে যখন মানব-বিবর্তন নিয়ে বই লেখেন তখন নিয়াডার্থাল ছাড়া মানুষের অন্য কোনো প্রজাতির ফসিল পাওয়া যায়নি। কিন্তু তারা বিবর্তনের মূল তত্ত্ব এবং সেই সময়ের সীমাবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রস্তাব করেছিলেন, আধুনিক বনমানুষ এবং মানুষ সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে যার যার মত বিবর্তিত হয়ে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। তারপর পুরো বিংশ শতাব্দী ধরেই মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ বছরের পুরানো মানুষের প্রজাতিগুলোকে বিজ্ঞানীরা Homo (আধুনিক মানুষের গণ)-এর মধ্যে ফেলেন। এদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বড় মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে গেছে এবং

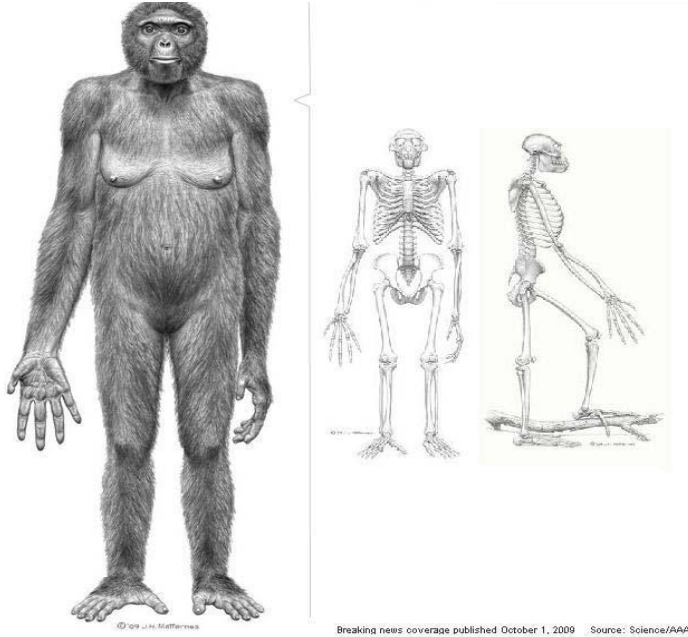
বিভিন্ন রকমের হাতিয়ারের ব্যবহারও শুরু হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ফসিল রেকর্ড থেকে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির সাধারণ পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; কারণ তাদের মধ্যে অনেক মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলোই আর অবশিষ্ট নেই, ইতিমধ্যে তারা আধুনিক মানুষের সব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ফেলেছে। ১৯২৪ সাল থেকেই এখানে সেখানে কিছু আরো পুরানো ফসিলের অংশবিশেষ পাওয়া গেলেও এসব আদিম প্রজাতিগুলোর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পূর্ণ-ফসিল পাওয়া যায়নি যা থেকে বিজ্ঞানীরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

তারপরে সত্তরের দশকে লুসি (*Australopithecus afarensis*)-এর ফসিল আবিষ্কার হলে আমাদের মানব-ইতিহাসকে প্রায় ৩৭ লক্ষ বছরের পরিধিতে এগিয়ে নিয়ে এল। লুসির আগে পাওয়া বিভিন্ন ফসিল থেকে বহুলভাবে বিশ্বাস করা হত, বনমানুষদের সাথে আমাদের ভাগটা ঘটেছে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই এও ভেবে এসেছিলেন, মানুষের সোজা হয়ে দুই পায়ের উপর হাঁটতে পারাটা ছিল আফ্রিকার প্লিওসিন যুগের তৃণভূমিতে অভিযোজিত হওয়ার ফসল। লুসির ফসিল যেন তাদের সেই অনুকল্পকে সঠিক করে দিল। *Australopithecus*-দের কোমড়ের এবং হাঁটুর গঠন থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় তারা দ্বিপদী ছিল। তখনও যেহেতু এর চেয়েও আর পুরানো কোন পূর্ণ-ফসিল পাওয়া যায়নি বিজ্ঞানীরা ধরে নেন লুসির প্রজাতিই আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ যারা হয়তো পৃথিবীর বুকে প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং চলাচল করতে শিখেছিল। শুধু তাই নয়, এখান থেকে আরো একটা জিনিসও বোধহয় প্রথমবারের মত পরিষ্কার হয়ে যায়, বিবর্তনের ধারায় আমাদের এই বড় মস্তিষ্ক আগে আসেনি, বরং তার অনেক আগে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছি। *Australopithecus*-রা দ্বিপদী হলে কি হবে, তাদের মস্তিষ্কের আকার তখনও ছোটই রয়ে গেছে। তাই অনেক বিজ্ঞানীই ‘বড় মস্তিষ্ক’কে নয় বরং দুই পায়ের উপড় খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শেখাকে মানুষ নামক প্রজাতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করেন।

ওদিকে শিম্পাঞ্জি, বনোবো এবং গরিলারা যে আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় তা নিয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই—শুধু তো জেনেটিক সংশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া জিনের মিল নয়, তাদের দেহের বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের মধ্যে সাদৃশ্য, মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে শুরু করে ক্রোমোসোমের গঠনের অভূতপূর্ব মিল, এসব থেকেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায়, আধুনিক বনমানুষ এবং মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ একই ছিল। কিন্তু গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং বনোবো সবার মধ্যেই ছোট মস্তিষ্ক এবং হাতের আঙুলগুলোর গাটের উপর ভর করে হাঁটার বৈশিষ্ট্য (ইংরেজিতে বলে ‘নাকল ওয়াকিং’) দেখা যায়। এখনো টিকে থাকা এই তিন প্রজাতির বনমানুষের মধ্যে যেহেতু আঙুলের গাটের উপর ভর করে হাঁটার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট পরিমাণ ফসিল রেকর্ডের অভাবে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেন, আমাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের

মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল; অর্থাৎ গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং বনোবোদের মধ্যে আলাদা আলাদা করে এই বৈশিষ্ট্যটি বিবর্তিত হয়নি, বরং সাধারণ পূর্বপুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আমরা ধীরে ধীরে আঙুলের উপর ভর করে চলাফেরা না করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছি। আর সর্ষের মধ্যের ভূতটা সেখানেই! প্রায় ৪৩ লক্ষ বছর আগের এই ছোট্ট আর্ডি আজ মানব ইতিহাসের পাতায় লেখা বেশ কিছু ভুল অনুকল্পকে সংশোধন করে দিতে এগিয়ে এসেছে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে। আর্ডির আবিষ্কার থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪৩ লক্ষ বছর আগেই মানুষের আদি-পুরুষদের মধ্যে দ্বিপদী বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আর্ডি যেমন দু'পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, মাটিতে ঘুরে বেড়াতে পারে, তেমনি আবার দিব্যি গাছে গাছে বিচরণও করতে পারে। এরকম কোন ফসিল এর আগে কেউ কখনও দেখেননি, গত দেড়শ বছর ধরে ফসিলবিদেরা এরকম কোন ফসিলের কথা শুধু ভাবতে পেরেছেন। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক* আর্ডির খবর প্রকাশের পরপরই তার কঙ্কাল এবং পূর্ণাঙ্গ দেহের একটি ছবি প্রকাশ করে।

ছবি-২ : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গদেহী *Ardipithecus ramidus*-এর কল্পিত ছবি এবং তার কঙ্কাল



ছবিটির নীচে যে কথাগুলো লেখা ছিল, তা থেকে বিজ্ঞানীদের এই বিস্ময়টা পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ পেয়েছে :

“আর্ডির ফসিল এক মহাবিস্ময়—একজন গবেষক বললেন, ‘এরকম কোন কিছুর কথা ভাবতে পারাও ছিল অসম্ভব।’ অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মতে এবং জনপ্রিয় বিশ্বাস ছিল, ‘সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি যে সময়টায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ের গহ্বর থেকে খুঁজে পাওয়া যে কোন ফসিল দেখতে শিম্পাঞ্জির মতই হবে। অথচ আর্ডির নাকুল ওয়াকিং, গাছে-গাছে ঝুলে থাকার ক্ষমতা’—এসব বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে আর্ডির শোণির গঠন, মাথার খুলি এবং হাত-পা’র গঠনের মধ্যে আদিম-বানর এবং আধুনিক হোমিনিডের বৈশিষ্ট্যাবলীর সম্মিলন দেখা যাচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর এক অদ্ভুত সমন্বয়ের ফলে আর্ডি একদিকে যেমন হাতের তালুর সাহায্যে গাছ থেকে গাছে চড়ে বেড়াতে পারতো আবার অন্যদিকে আমাদের চেয়ে কিছুটা কম দক্ষতায় হলেও দুই পায়ের উপর ভর করে দিব্যি মাটিতে হেঁটে বেড়াতে সক্ষম ছিল।”

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? আমরা এতকাল ধরে ভেবে এসেছিলাম, আধুনিক বনমানুষ এবং মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যে শিম্পাঞ্জি-ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে সেটা মোটেও ঠিক নয়। বরং এদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, যেগুলো আরো আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছু বানর-প্রজাতির ফসিলে পাওয়া গিয়েছিল। এবং এতদিন ধরে আমরা আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য—দুই পায়ে ভর করে দাঁড়ানো সময়সীমা সম্পর্কে যা ধারণা করা হয়েছিল তাও সম্পূর্ণরূপে ভুল ছিল! আমরা আসলে লুসির অনেক আগেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছি। শুনতে বেশ সোজাসাপ্টা মনে হলেও ব্যাপারটি আসলে এত সোজা নয়। কেননা এর ফলে মানব-বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পের মোড় বেশ খানিকটা ঘুরে যাচ্ছে।

ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে জীবাশ্ম-নৃতত্ত্ববিদ টিম হোয়াইটের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ১৯৯৪ সালে ৪৩ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করা আর্ডি প্রজাতির ফসিল আবিষ্কার করেন। আর্ডিরটা একমাত্র প্রায়-পূর্ণাঙ্গ ফসিল হলেও, এই একই প্রজাতির আরো ৩৬টি স্বতন্ত্র ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের শতাধিক হাড়গোড় পাওয়া গেছে। একই সাথে পাওয়া গিয়েছে ২৯ প্রজাতির পাখি, ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং বিভিন্ন ধরনের গাছ এবং বীজের ফসিল। এগুলো নিয়ে গত ১৫ বছর ধরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা কাজ করে আসছেন। জীবিবিদ্যা বা ফসিলবিদ্যায় এতজন বিজ্ঞানীর এত বছর ধরে সম্মিলিত কর্মযজ্ঞের এরকম নজির মনে হয় খুব কমই দেখা গেছে।

আর্ডির শিম্পাঞ্জি, বানর, মানুষে একাকার হয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো

এতদিন পর্যন্ত ফসিল রেকর্ডগুলো থেকে আমরা দ্বিপদী বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই পাইনি। লুসির শ্রেণিচক্রের গঠন অনেকাংশে আমাদের মতই, তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ বছর আগেই অত্যন্ত অগ্রসর দ্বিপদী বৈশিষ্ট্যবলীর অভিযোজন ঘটে গিয়েছিল। এ থেকে আমরা ঠিক কখন এবং কিভাবে সেই দ্বিপদী যাত্রা শুরু করেছিলাম তার প্রাথমিক স্তরগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা পাই না। সে হিসেবে আর্ডি প্রজাতি (*Ardipithecus ramidus*) প্রথম প্রজাতি যার মধ্যে দ্বিপদী বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপগুলো দেখা যাচ্ছে।

আর্ডির শ্রেণিচক্র, পায়ের হাড় (ফিমার) এবং বৃক্কের গঠন থেকে শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। প্রাইমেটদের মধ্যে হোমিনিডের শ্রেণিচক্রের গঠন সবচেয়ে জটিল এবং বনমানুষদের থেকে তা আবার বেশ কিছুটা অন্যরকম। শ্রেণিচক্রের এই বিশেষ গঠনই তাকে দুপায়ের উপর হেঁটে চলে বেড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতো। আর্ডির ইলিয়ামের (শ্রেণিচক্রের বড় হাড়টিকে ইলিয়াম বলে) উপরের অংশে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যা দুই পায়ের উপর ভর করে চলার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। অথচ এর কোনোটিই কিন্তু শিম্পাঞ্জি বা অন্য কোন আধুনিক বনমানুষের মধ্যে দেখা যায় না। ইলিয়ামের উপরের অংশের এই বিবর্তনের কারণে আর্ডি দুই পায়ে খাড়া হয়ে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতে পারলেও খুব জোরে দৌড়াতে বোধহয় সক্ষম ছিল না। দৌড়ে বেড়ানোর জন্য শ্রেণিচক্রের যে অগ্রসর গঠন দরকার তার বিবর্তন এই প্রজাতির মধ্যে তখনও কিন্তু ঘটেনি।^৪

আবার ইলিয়ামের নিচের অংশের গঠনটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বনমানুষের ইলিয়ামের নিচের অংশের সাথে মিলে যাচ্ছে, যা কিনা আবার গাছে চড়ার জন্য অপরিহার্য ছিল। ওদিকে লুসির ফসিলের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় আর্ডির গঠন আদিমতর ছিল। লুসির ইলিয়ামের শুধু উপড়ের অংশই নয়, নীচের অংশটাও সম্পূর্ণভাবে দৌড়ানোর উপযোগী হয়ে উঠেছিল। লুসির শ্রেণিচক্র, হাত ও পায়ের গঠন থেকে এটাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় লুসি শুধু ৩৭ লক্ষ বছর আগে বেশ অগ্রসর দ্বিপদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল তা-ই নয়, গাছে চড়ে বেড়ানোর ক্ষমতাও কিন্তু পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল।

আর্ডির হাতের গঠন দেখলে তাকে শিম্পাঞ্জির চেয়ে আদিম এক বানর প্রজাতি, *Proconsul*-এর কাছাকাছি প্রাণী বলেই মনে হবে। বনমানুষদের হাতের তালু এবং আঙুলের সন্ধিস্থল বা জোড়াগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক শক্ত। গাছের ডালে ডালে চলাফেরার সময় হাতের ওপর এত বড় শরীরের ভার বইতে হয় বলেই হয়তো এই অভিযোজনের প্রয়োজন পড়েছিল। তাদের হাতের তালু যতখানি লম্বাটে, বুড়ো আঙুলটা

ততখানি খাটো। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই বনমানুষদের মাটিতে হাঁটার সময় আঙুলের গাঁটে ভর করে চার হাত-পায়ের সাহায্যে হাঁটতে হয়। প্রাইমেটদের মধ্যে শুধুমাত্র আফ্রিকান বনমানুষেরাই এভাবে চলাফেরা করে। বিভিন্ন প্রজাতির বানর কিন্তু আঙুলের ওপর নয় বরং হাতের তালুর ওপর ভর করেই মাটিতে চলাফেরা করে থাকে। অন্যদিকে, মানুষের হাতের তালু তুলনামূলকভাবে বেশ ছোট এবং কজির গঠন অনেক নমনীয়। এ কারণেই আমরা খুব শক্ত করে জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরতে পারি এবং তাতে চাপ প্রয়োগ করতে পারি। কজি থেকে যতই হাতের উপরের দিকে যাওয়া যায় ততই বনমানুষের সাথে আমাদের পার্থক্য কমতে থাকে।

এ তো গেল বনমানুষ আর মানুষের হাতের গঠন। ওদিকে আর্ডির হাতের সবগুলো হাড়ই প্রায়-অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যা থেকে তাদের হাতের গঠন সম্পর্কে খুব পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। সে যে কোনভাবেই আঙুলের গাঁটে ভর করে হাঁটতো না সেটা খুবই স্পষ্ট, এর জন্য হাত এবং আঙুলের গঠনে যে অভিযোজনগুলোর প্রয়োজন তার কোনোটাই আর্ডির মধ্যে নেই। শুধু তাই নয়, আর্ডির কজি এবং হাতের আঙুলের জোড়াগুলো অত্যন্ত নমনীয়, এমনকি আমাদের চেয়েও আরও অনেক বেশি নমনীয় ছিল বলেই মনে হয়। আর্ডির হাতের গঠন থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, তার হাতের গঠন আধুনিক বনমানুষদের চেয়ে অন্যরকম ছিল। তাদের হাতের সাথে আমাদের হাতের মিলই বরং অনেক বেশি; অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষেরা 'নাক্ল ওয়াকিং' থেকে অভিযোজিত হয়ে এখানে আসেনি, আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। আধুনিক বনমানুষেরাই বরং ধীরে ধীরে তাতে অভিযোজিত হয়েছে, আমাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আমাদের হাতের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো, যা দিয়ে আমরা খুব সহজেই হাতিয়ারের ব্যবহার করতে শিখেছি, তা অর্জন করার জন্য আমাদের খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। এই হাত আমরা অনেকাংশেই সরাসরি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই পেয়েছি, এর জন্য বুড়ো আঙুলের আকার কিছুটা বড় হওয়া এবং আঙুলগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যাওয়ার মত ছোট কিছু অভিযোজন ছাড়া আর তেমন কোন বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়েনি।^৫

আর্ডির পায়ে বনমানুষের মত বড় আঙুলগুলো (বনমানুষদের গাছে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরার সময় ডাল-পালায় পায়ের ঠেক দেয়ার জন্য বা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত Oppsable thumb বা বৃদ্ধাস্থলি) দেখা গেলেও বাকি হাড়ের গঠনগুলো কিন্তু আবার একেবারে অন্য কাহিনী বলছে। তার পায়ের পাতায় একটি ছোট্ট হাড় আছে (osperoneum) যা আবার বনমানুষদের মধ্যে নেই, শুধুমাত্র বানর এবং গিবনদের মধ্যে আছে, আর আছে আমাদের পায়ের পাতায়, সেই হাড়ের অবশিষ্টাংশ হিসেবে। এই হাড়টা না থাকার কারণে বনমানুষদের পা বানরের পায়ের থেকে অনেক বেশি নমনীয় যা দিয়ে তারা বড় শরীর নিয়ে চলাফেরার সময় বা সোজা হয়ে গাছে ওঠার সময় শক্ত করে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে। আর্ডির পায়ের পাতায় যে শুধু এই হাড়টি আছে তাই নয়, এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও

তার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। শিম্পাঞ্জি, গরিলাতে এই হাড়টি না-থাকা আর বানর এবং মানুষের মধ্যে এর অস্তিত্ব থেকে যাওয়া থেকে এটুকু অন্তত বলা যায়, আমাদের ‘সাধারণ পূর্বপুরুষের’ মধ্যেও এর অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বনমানুষদের মধ্যে তা লুপ্ত হয়ে গেছে।

আর্ডির বাকি চারটা আঙুলের বিশেষভাবে অভিযোজিত শক্ত গঠন থেকে একদিকে যেমন বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, আর্ডি দুইপায়ের উপর ভর করে হাঁটতে সক্ষম ছিল, অন্যদিকে তার বাঁকানো বুড়ো আঙুল প্রমাণ করে সে তখনো গাছে-গাছে চড়ে বেড়াতেও বেশ অভ্যস্ত ছিল।^১ এ যেন সেই বাংলা প্রবাদের মত অবস্থা-গাছেরটাও খাবো, তলারটাও কুড়াবো। একদিকে সে দুইপায়ের উপর ভর করে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, আরেকদিকে দিব্যি গাছে-গাছেও রয়ে গেছে তার অব্যাহত বসবাস এবং চলাফেরা!

আর্ডির মাথার খুলিতেও সেই একই রকমের সংকরায়িত বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। তার মস্তিষ্কের আকার শিম্পাঞ্জির সমান হলেও খুলির গঠনে কিন্তু শিম্পাঞ্জি থেকে বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর্ডির মুখের সামনের দিকটা বেশ কিছুটা আগানো, যার ফলে তাকে দেখতে বনমানুষের মতই দেখায়। কিন্তু আবার বনমানুষদের মত বড় এবং ধারালো শ্বদন্ত (উপরের চোয়ালে দুটি এবং নিচের চোয়ালে দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত) নেই আর্ডির। মানুষের শ্বদন্তগুলো বনমানুষদের চেয়ে অনেক ভোঁতা, আর আর্ডিরগুলো মানুষ এবং বনমানুষদের

আশ্চর্য সব বৈশিষ্ট্যের মানুষ, বনমানুষ আর পূর্বপুরুষদের এক ভাবতে পেরেছিল পায়ের উপর ভর করে এরকম সব অদ্ভুত স্তর হয়েছিল! তাই ফসিল-তার সহকর্মীদের ভাষায় এরকম ধরনের সংকর দিয়ে পার হয়ে না আসলে কোনদিন দুই পায়ের হয়ে উঠতো না।



ছবি-৩ : আর্ডির ফসিল

মাঝামাঝি আকৃতির। সমাহার এই আর্ডি! বানর, তাদের সাধারণ অভূতপূর্ব মিশ্রণ। কে আমাদের মানুষ হয়ে দুই উঠে দাঁড়ানোর পিছনে পার হয়ে আসতে বিজ্ঞানী লাভজয় এবং বলতে গেলে বলতে হয়, মার্কো বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে হয়তো আমাদের উপর ভর করে দাঁড়ানোই

আর্ডি মানব-বিবর্তনের কতগুলো খুব মৌলিক ‘অনুকল্প’কে চূরমার করে দিয়েছে; আর এখানেই বোধহয় বিজ্ঞানের সার্থকতা। মানুষের ইতিহাসের বইয়ের কটি পাতা আবার নতুন করে লিখতে হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা দুঃখে ভেঙে পড়ছেন না। বরং অত্যন্ত গৌরবের সাথে বিজ্ঞানীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই নতুন আবিষ্কারের আলোকে পুরানো ভুল ধারণাগুলোকে বেড়ে ফেলে দিয়ে সঠিক তথ্যকে সামনে নিয়ে আসার কাজে। বেশ কয়েকটা পুরানো ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে আর্ডি, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এতদিন যা ধারণা করে এসেছিলেন। মানুষ, শিম্পাঞ্জির মত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে তা সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুকল্প, মানুষ আফ্রিকার সাভানা বা তৃণভূমিতে অভিযোজিত হতে গিয়ে দ্বিপদী হয়ে উঠেছিল—আর্ডির আবিষ্কারের সাথে সাথে তা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। আর্ডির আশে পাশে, ভূত্বকের একই স্তরে যে সমস্ত প্রাণী, গাছপালা এবং বীজের ফসিল পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ওই সময়ে আফ্রিকার সে অঞ্চলে বড় বড় গাছগাছালির সমাহার ছিল। তারও অনেক পরে আসলে আফ্রিকা তৃণভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

লুসি আমাদের ইতিহাসের বইতে হারিয়ে যাওয়া ৩৭ লক্ষ বছর দূরের পাতাটা লিখতে সাহায্য করেছিল, আর্ডি সেই বইটাকেই আরও প্রায় আট-দশ লক্ষ বছর বিস্তৃত করলো। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিদের সাধারণ পূর্বপুরুষেরা যদি প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজ নিজ পথে বিবর্তিত হতে শুরু করে, তাহলে আর্ডি এবং আমাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যে এখনও প্রায় ২০-৩০ লক্ষ বছরের ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। নিত্যানতুন ফসিলের আবিষ্কার, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স এবং তার সাথে-সাথে Evolutionary Developmental Biology (সংক্ষেপে Evo-Devo)-এর মত অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের শাখাগুলো আমাদেরকে উত্তরোত্তর সেই গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের কাহিনী একান্তই আমাদের নিজস্ব ইতিহাস। আর যতই আমরা এ নিয়ে জ্ঞানার্জন করছি, ততই যেন দিনে দিনে মানব-বিবর্তন নিয়ে ডারউইনের চিন্তাভাবনাগুলো আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে : “Man may be excused for feeling some pride at having risen, though not through his own exertions, to the very summit of the organic scale; and the fact of his having thus risen, instead of having been aboriginally placed there, may give him hope for a still higher destiny in the distant future.”

তথ্যসূত্র

১. <http://scienceligionnews.blogspot.com/2009/10/making-sense-of-al-jazeera-strange.html#>
২. Introduction: Light On the Origin of Man. www.sciencemag.org SCIENCE VOL 326 2 OCTOBER 2009 61 Published by AAAS.

৩. <http://ngm.nationalgeographic.com/human-evolution/human-ancestor>
৪. The Pelvis and Femur of *Ardipithecus ramidus*: The Emergence of Upright Walking, DOI: 10.1126/science.1175831, *Science* 326, 71 (2009), C. Owen Lovejoy, *et al.*
৫. Careful Climbing in the Miocene: The Forelimbs of *Ardipithecus ramidus* and Humans Are Primitive, DOI: 10.1126/science.1175827, *Science* 326, 70 (2009); C. Owen Lovejoy, *et al.*
৬. Combining Prehension and Propulsion: The Foot of *Ardipithecus ramidus*, DOI: 10.1126/science.1175832, *Science* 326, 72 (2009); C. Owen Lovejoy, *et al.*

ডারউইন থেকে ডাবল হেলিক্স

দিগন্ত সরকার*

আজকাল কেউ যদি কোন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা-ম্যাগাজিনে খবর পড়তে যান তাহলে আর কিছু না হোক একটা বিষয়ের খবর প্রথম পাতায় পাবেনই। সেটা হল Genetics বা বংশগতিবিদ্যা বা জিন-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের খবর পড়লেই দেখবেন হয় কোনো বিজ্ঞানী নতুন কোনো রোগের জন্য দায়ী কোনো জিন আবিষ্কার করেছেন, না হয় আর কেউ কোনো প্রাণীকে ক্লোন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, এমনকি কোথাও উচ্চফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে; সবই কোনো না কোনোভাবে জিনের সঙ্গে জড়িত। আজকের দুনিয়ায় জিন নিয়ে নাড়াচাড়া করে কত কী করার কথা ভাবছেন বিজ্ঞানীরা; অধিক শক্তিশালী মানুষ বানানো বা বংশগত রোগমুক্তির মত আরো অনেক সম্ভাবনার নতুন পথ দেখিয়েছে জিনের আবিষ্কার।

জিন-বিজ্ঞান চিরকাল এই অবস্থায় ছিল না। ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে যেমন এডিসন ধনী হয়েছিলেন বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করে যেমন আইনস্টাইন জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন, জিন আবিষ্কারকের ব্যাপারে কিন্তু তা হয়নি। শুধু তাই নয়, জিন আবিষ্কারের পর থেকেই একে মানুষের হিতে না লাগিয়ে হিতে-বিপরীত করে মানবজাতিকে মনুষ্যত্ববিহীন এক সুডো-সায়েন্স বা ছদ্মবিজ্ঞানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই অতল খাদের কিনারা থেকে কিভাবে জিন-বিজ্ঞান (বংশগতিবিদ্যা) গত পাঁচ দশকে আবার প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নিল। সেই ইতিহাসও কম রোমহর্ষক নয়।

জেনেটিক্সের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে থাকলেও বংশগতি বলে কিছু যে হয় তা আদিম যুগ থেকেই মানুষ পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান হিসাবে কাজে লাগিয়ে এসেছে। একজন মানুষের নিকটাত্মীয়দের সাথে আচার-আচরণগত মিল তখনও লক্ষ্য করা হত। বাবা-মায়েরা নিজের ছেলমেয়ের মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়াতে। তবে তার প্রয়োগ ছিল মূলত পশুপালন আর কৃষিকাজে। যে গরু বেশি দুধ দেয় তার বাচ্চাও যে বেশি দুধ দিতে পারে বা যে গাছের ফল বড়বড় হয় তার আশেপাশে একই বীজ থেকে জন্মানো গাছের ফলও বড় হবে। তাছাড়া, বীজ ধরে রাখা আর কৃষিকাজের আরো অনেক বুদ্ধিই আসে বংশগতির ধারণা থেকে; তবে তখন তত্ত্বগতভাবে এতটা

* দিগন্ত সরকার : আমেরিকা নিবাসী, কম্পিউটার প্রকৌশলী।

শক্তিশালী না হলেও পর্যবেক্ষণ করে অনেক দূরই এগিয়েছিল মানবসভ্যতা। এর পরের ধাপে আসে নির্বাচিত পুনরুৎপাদন মানে ‘সিলেক্টিভ ব্রিডিং’। বেশি দুধ দেওয়া গরুর বেশি করে সন্তান এনে বা বড় ফলের গাছের বীজ সংরক্ষণ করে আরো বেশি বেশি জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে অদিম মানুষ অনেক প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য। আজকে আমরা যে কলা খাই, সেই কলা স্টেরাইল কলা, আসল কলায় বীজ থাকে। কিন্তু বীজ থাকলে কি আর খেতে ভাল লাগে? তাই অযৌন-জননের মাধ্যমে প্রজনন-অক্ষম কলাগাছ বানিয়ে তাতে যে কলা ধরে তাই আমরা খাই। আর এই বিদ্যা অর্জিত হয়েছে হাজার নয়, প্রায় দশ হাজার বছর আগে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে; এখনো এই অঞ্চলের প্রজাতিগুলোর কলা আমরা বেশি খাই, যেমন সিঙ্গাপুরের আর মার্ভামান। সুতরাং আদিম মানুষকে যতই বিজ্ঞানে অনুন্নত বলা হোক না কেন, বংশগতির ব্যাপারে মানুষের ধারণা অনেক পুরানো।

কিন্তু কি কারণে এই বংশগতি লক্ষ্য করা যায়? কি সেই বস্তু যা জীবের শরীর থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় অপত্যের শরীরে? বাবা-মায়ের মত গুণ কেন ছেলেমেয়ে পায়? তা নিয়ে নিশ্চয় জল্পনা-কল্পনা আদিম যুগেও ছিল। তবে এই ধারণাকে প্রথম ‘তত্ত্ব’-এর আকার দেওয়ার চেষ্টা করে গ্রিকরা। গ্রিক মনীষী হিপোক্রেটাস এক অনুকল্পের উদ্ভাবন করেন যার নাম প্যাঞ্জেনেসিস। তার দাবি ছিল যৌনমিলনের সময় শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কোনো না কোনোভাবে বংশগতি বয়ে নিয়ে যায়। অনুকল্পটি আজকে আমাদের কাছে যতই হাস্যকর লাগুক, আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে এটাই ছিল অনেক। অনেক কাল পরে অনুকল্পটি হাতে গিয়ে পড়ে চার্লস ডারউইনের। ‘*Origin of Species*’ বইয়ের মাধ্যমে ডারউইন তখন সবে আলোচনার মূলে এসেছেন। তাঁর এই বইয়ে তিনি বলেছিলেন বংশগতির সাথে প্রকারণ (Variance)-এর সম্পর্কের কথা। সেই বংশগতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডারউইন তখন আবার ফিরিয়ে আনলেন এই প্যাঞ্জেনেসিস তত্ত্বকে। ডারউইনের দাবি অনুসারে, ‘সারা শরীরের কোষগুলো থেকে ‘গেমুলস’ (Gemmules) বলে এক ধরনের পদার্থ সঞ্চিত হয়, যা জমা হয়ে থাকে মানুষের যৌনাঙ্গে। এভাবে, সব কোষই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য অপত্যে পৌঁছে দেবার একটা সুযোগ পায়।’ এ দিয়ে ডারউইন অনেকগুলো পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যাও দিয়ে দিলেন। অনেক সময়েই দাদুর বৈশিষ্ট্য নাতি পেয়ে যায়, কিন্তু ছেলে পায় না। সেটা কেন হয়? এই প্রশ্নের জবাবে চার্লস ডারউইন বললেন, অনেক গেমুলস সুপ্ত হয়ে যায় জননের সময় কিন্তু পরবর্তীতে আবার জেগে উঠতে পারে। তারাই এর জন্য দায়ী। ডারউইন এই অনুকল্পটি পেশ করলেন ১৮৬৮ সালে, তাঁর ‘*The Variation of Animals and Plants under Domestication*’ বইতে। এর পরের দুই খণ্ডে লেখা বই ‘*The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*’-এ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন, এই একই অনুকল্পের ওপর ভিত্তি করে। এই বইতে তিনি আরো বলেন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আবার লিঙ্গভেদে সুপ্ত

হয়ে যায়, তাই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে একই গেমুলস থেকে হলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আলাদা ধরনের হয়। সব থেকে মজার কথা, ডারউইন এটাও বলেন জীবিত সময়ে অর্জিত বৈশিষ্ট্যও পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব; যা ছিল আদপে ফ্রান্সের জীববিজ্ঞানী জঁয়া ব্যাপতিস্তে ল্যামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)-এর মতবাদ। যদিও বিবর্তনের জন্য এই অধিগত বৈশিষ্ট্যকে ডারউইন স্বীকার না করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন প্রথমে, কিন্তু গেমুলস দিয়ে বংশগতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন সেই ল্যামার্কের তুলটাই ফিরিয়ে আনলেন।

প্যাঞ্জেনেসিসের মত আরেকটি অনুকল্প রয়েছে, যার নাম প্রিফর্মেশনিজম (Preformationism)। এই অনুকল্পে বলা হয়েছে মাতৃজঠরে জ্রণ কিছু অতিক্ষুদ্র অংশ নিয়ে তৈরি হয়। এই অতিক্ষুদ্র অংশগুলো এক একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সহজ কথায়, যেভাবে জ্রণ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি হয়, সেভাবেই আরো কিছু ক্ষুদ্র হোমানকুলাই (Homunculi) থেকে জ্রণ তৈরি হয়। হোমানকুলাই আবার যে কোনো লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, কারণ উভয়ের উপস্থিতিতেই তা বৃদ্ধি পায়। ধর্মবাদীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবি জানালেন, আজকের পুরুষেরা সকলেই তাহলে আদমের শুক্রথলির হোমানকুলাই থেকেই তৈরি, আর নারীরা ইভের ডিম্বাশয়ের। আর আজকে যা আমরা জিনগত রোগ বলে জানি, তাকে ধরা হল জ্রণের গঠনের সময় সৃষ্টিকর্তার রোষ, অথবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের কুচিন্তার ফল। আবার এও মনে করা হত, যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের চাহিদা ঠিকঠাক না মেটানো যায়, তবে হতাশা থেকে বাচ্চার বিকৃতির (এখনকার জিনগত রোগ) সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নেপোলিয়ান তো আইনই পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা দোকান থেকে কিছু জিনিস তুলে নিয়ে গেলেও তাদের শাস্তি হবে না। কিন্তু এই প্রিফর্মেশনিজম অনুকল্পটি ধোপে টেকেনি বেশিদিন। মাইক্রোস্কোপের বহুল ব্যবহার শুরু হবার পর অনেক খুঁজেও এরকম কোনো হোমানকুলাই পাওয়া যায়নি। দু-একটা নড়াচড়া করা ছোটখাটো কিছুও না। কিন্তু ডারউইনের প্যাঞ্জেনেসিস অনুকল্পটি এর চেয়ে বেশি দিন চলেছিল, হয়ত অনুকল্পটি ডারউইনের ছিল বলে; ছোট গেমুলাসগুলো এতটাই ‘ছোট’ ভাবা হচ্ছিল যে মাইক্রোস্কোপকেও বিজ্ঞানীরা তখন ততটা ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিলেন জার্মানির আগস্ট ভাইজম্যান নামের জীববিজ্ঞানী। ভাইজম্যান একটি ইঁদুরের লেজ কেটে দেখালেন যে লেজকাটা ইঁদুরের বাচ্চার লেজ তো গোটাই থাকে। অর্থাৎ গেমুলাস তাহলে ‘মনে রেখে’ সেই বৈশিষ্ট্য পরের প্রজন্মে প্রবাহিত করে না। ভাইজম্যান বংশগতির ধারকের নাম দিলেন ‘জার্মপ্লাজম’; আরো বললেন, কোনো জীবের জীবদশায় কোনো অধিগত বৈশিষ্ট্য (ইঁদুরের কাটা লেজ) জার্মপ্লাজমকে প্রভাবিত করে না। আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস হতে দেখেছি, বিজ্ঞানী-মহলে ‘হিরো’ অনেক কিন্তু কোনো ‘প্রফেট’ নেই। এই ব্যাপারটিই বিজ্ঞানকে আবারো সত্যের পথে আরো একবার নিয়ে গেল। চার্লস ডারউইন বিজ্ঞানী-

মহলে 'হিরো' হলেও তাঁর বক্তব্য প্রমাণ ছাড়া গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রমাণের অভাবে একেবারে ডাস্টবিনে চলে গেল ডারউইনের বংশগতির অনুকল্প। আজও ডারউইনকে সারা বিশ্বেই যুগান্তকারী বিজ্ঞানী বলে মানা হয়, কিন্তু তাঁর বংশগতির অনুকল্পটি কেউ পড়েও দেখে না, ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধির একান্ত ইচ্ছে না হলে।

বংশগতি নিয়ে হয়ত চার্লস ডারউইনের মাথা ঘামানোরই দরকার হত না যদি তাঁর সমসাময়িক আরেক বিজ্ঞানীর কাজ তাঁর হাতে এসে যেত। অবশ্য ঐ ব্যক্তি বিজ্ঞানী নন, পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন ধর্মযাজক। গ্রেগর জোহান মেডেল, জিন-বিজ্ঞানের পিতৃপুরুষ। চেক রিপাবলিকে জন্মগ্রহণকারী মেডেলের স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ফল কখনই ভাল হত না। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় মেডেল ফেল করার পরে স্থায়ীভাবে ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেন। চার্চের ফাদারের পরামর্শে গবেষণাকর্মও চালিয়ে যেতে থাকেন। মনস্ত্রিহিত মেডেল মটর গাছের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লক্ষ্য করেন। তিনি ধারণা করলেন বংশগতি কোন বাহকের মাধ্যমে অপত্যের মধ্যে আসে, এবং এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অথচ পিতা-মাতা উভয়ের কাছ থেকেই অপত্য একটি করে বাহক পেয়ে থাকে; পরবর্তীকালে এই বাহকের নাম দেওয়া হল 'জিন' (Gene)। যেমন ধরা যাক মটর দুই রকম রঙের হয়, যথা হলুদ আর সবুজ। মেডেলের ব্যাখ্যায় সবুজ মটরে উভয়ের থেকেই সবুজ (G) হবার জিন পেয়েছে তাই ওটি সবুজ আর হলুদ মটরে অস্বত একটি জিন হলুদ (Y) হবার জিন। শুধু GG হল সবুজ, আর বাদবাকি YY, YG আর GY হল হলুদ; কারণ হলুদ হল প্রকট বৈশিষ্ট্য আর সবুজ হল সুপ্ত। এই ব্যাখ্যা সরাসরি বংশগতির অনেকগুলো সমস্যাকে সমাধান করে দিল। দাদুর রোগ নাতির মধ্যে দেখা যায়, অথচ ছেলের মধ্যে দেখা যায় না, কারণ ছেলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে। যে জিন এর জন্য দায়ী সেটা সুপ্ত বৈশিষ্ট্য। পরাগরেণু বা বাহকের মধ্যে থাকে একটি মাত্র জিন। পদার্থবিদের মত সংখ্যা গুণে উনি দেখালেন এই ভাঙা-জোড়ার পদ্ধতি পুরো র্যান্ডম; YG গাছের পরাগরেণুর মধ্যে অর্ধেক Y আর বাকি অর্ধেক G থাকবেই। আর তৈরি গাছে ২৫% বা এক-চতুর্থাংশের রং হবে সবুজ।

মজার কথা, মেডেলের এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী-মহলে দাগ কাটতে পারল না। তিনি আর কিছু মটর নিয়ে গবেষণা করার পরে স্থানীয় কিছু জার্নালে এ সংক্রান্ত পেপার প্রকাশ করেন। তারপরে আরো অনেক বিজ্ঞানীর সাথে সেই সময়কার বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল নাগেলিকে লিখলেন তাঁর এই আবিষ্কারের কথা। কিন্তু নাগেলির ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তিনি ১৪০ প্যাকেট বীজ পাঠালেন মেডেলকে পরীক্ষাটি আবার এই নতুন প্রজাতির ওপর করার জন্য। নতুন প্রজাতিটি ছিল এক ধরনের সূর্যমুখী গাছ। এর মধ্যে মটরের মত এত সহজে বোধগম্য কোন জিন-নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্টতা ছিল না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই মেডেল হাল ছেড়ে দিলেন। এদিকে চার্চের ফাদার মারা যাওয়ায় মেডেল পুরোদমে ধর্মযাজকের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর বিজ্ঞান থেকে হয়ে গেল

তাঁর স্বেচ্ছাবসর। মেডেলের অমূল্য কাজ চাপা পড়ে গেল। ১৯০০ সালে তিন বিজ্ঞানী মেডেলের কাজ পুনরুদ্ধার করেন; এরা হলেন কোহেন, শেরমাক আর ভ্রিয়েস। এদের মধ্যে ঘটনাচক্রে কোহেন ছিলেন নাগেলির ছাত্র। আর ভ্রিয়েসই ডারউইনের প্যাঞ্জেনেসিস অনুকরণে বংশগতির বাহকের নাম রাখেন প্যাঞ্জিন, যা থেকে পরে 'জিন' কথাটা এসেছে।

যা হোক, মেডেলের ব্যাখ্যায় একটা ব্যাপার অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। বংশগতির বাহক কে? যে 'জিন' বলে ধারণাটি তিনি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবে কোথায় থাকে আর কিভাবে বাহকের কাজ করে তা নিয়ে মেডেল কিছু বলতে পারেননি। ১৮৮৪ সালে মেডেলের মৃত্যুর সময়ে উন্নততর অণুবীক্ষণের কল্যাণে আবিষ্কৃত হয় কোষের মধ্যের এক নতুন অংশ 'ক্রোমোসোম'। ক্রোমোসোম প্রতিটি জীবকোষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এই ক্রোমোসোমের সাথে মেডেল-বর্ণিত বাহকের কী সম্পর্ক তা জানতে আর দুই দশক লেগে গেল। ১৯০২ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ওয়াল্টার সাটন 'ফডিং'-এর ক্রোমোসোম অণুবীক্ষণের তলায় দেখতে গিয়ে দেখেন ক্রোমোসোমও আসলে এক জোড়া; ঠিক যেমন মেডেল-বর্ণিত বাহকের হওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক একটা জায়গায় ব্যতিক্রম, শুক্র-কোষে (sex cell)। এটাও মেডেলের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। মেডেল বর্ণিত অপত্যের মধ্যে পিতা বা মাতার কাছ থেকে একটাই বাহক আসে। ওয়াল্টার সাটন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন মেডেল বর্ণিত বাহক ক্রোমোসোমের মধ্যেই আছে। সাটনের লেখা পেপার প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। পরে জার্মান বিজ্ঞানী বোভেরি-ও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তাই এই মতবাদটি সাটন-বোভেরি মতবাদ বলে পরিচিতি লাভ করে। অথচ বিজ্ঞানী-মহলে এই মতবাদ ছিল বিতর্কিত। আর সবার মত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক বিজ্ঞানী টমাস হান্ট মরগ্যান-ও বিশ্বাস করেননি যে এরকমটা সম্ভব। তাঁর প্রাথমিক যুক্তি ছিল, যদি গোটা ক্রোমোসোম দুই ভাগে ভেঙে এক টুকরো অপত্যে চলে যায় তাহলে তো একসাথে অনেক বৈশিষ্ট্য অপত্য অর্জন করবে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবে মিলেমিশে থাকে। বাবার কাছ থেকেও কিছু আর মায়ের কাছ থেকেও কিছু বৈশিষ্ট্য অপত্য অর্জন করে; শুধুমাত্র দুইভাগে বিভক্ত ক্রোমোসোম দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

মরগ্যান প্রথমে শিক্ষকতা করতেন ব্রিন মাওর কলেজে। সেখানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ড্রফ, লার্ভা আর পুনরুৎপাদন। ১৯০৪ সালে মরগ্যান বিয়ে করেন আরেক বিজ্ঞানী লিলিয়ানকে; যিনি পরে তাঁকে কাজে বরাবর সাহায্য করেছেন। একই বছরে মরগ্যান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রজনন নিয়ে গবেষণা করার জন্য বেছে নেন ড্রসোফিলা নামের এক বিশেষ ধরনের ফলের মাছিকে; কারণ এই মাছি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ড্রসোফিলা মাছি নিয়ে গবেষণা করতে করতে মরগ্যানের ল্যাবরেটরি মাছি আর মাছির খাবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে তিনি দুধের কৌটায় মাছি সংগ্রহ করতেন বা মাছির খাওয়ানতেন তা নিয়ে অনেক মজার

গল্প আছে। ড্রসোফিলা মাছির মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর চোখের রঙ। মরগ্যান লক্ষ্য করলেন কোন কোন পুরুষ মাছির চোখের রং হয় সাদা, বাকি সাধারণ মাছির চোখ হয় লাল। সাদা চোখ-বিশিষ্ট স্ত্রী-মাছি খুবই দুর্লভ। এরই মধ্যে বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন ক্রোমোসোমের সাথে লিঙ্গের সম্পর্ক; দুটো x ক্রোমোজম পেলে হয় স্ত্রী আর একটা x আর একটা Y হলে হয় পুরুষ। সুতরাং মরগ্যান ধারণা করে নিলেন চোখের রঙ বহনকারী জিন হল x ক্রোমোসোমের মধ্যে অবস্থিত আর সুগু প্রকৃতির। ছেলেদের ক্ষেত্রে x ক্রোমোজম একটাই, তাই সুগু হলেও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় প্রকট জিনের অভাবে। অন্যদিকে স্ত্রী-মাছির ক্রোমোজম দুটো x, তাদের একটাতে জিন থাকলেও অন্যটার প্রকট জিন এই সাদা করার জিনের প্রভাব খর্ব করে দেয়। তাই স্ত্রী মাছিতে সাদা চোখ দুর্লভ। তাঁর এই ব্যাখ্যা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হল সায়েন্স পত্রিকায়।

কিন্তু মরগ্যানের প্রাথমিক খটকাটা তখনও দূর হয়নি। একসাথে সব বৈশিষ্ট্য মানে গোটা এক-একটা ক্রোমোসোমই কি পিতা বা মাতার কোনো একজনের কাছ থেকে আসে? এটা পরীক্ষা করার জন্য তিনি চোখের রঙ-এর মত আরেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন, মাছির ডানার আকার। দেখা গেল এটিও x ক্রোমোসোমের সাথে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য; অথচ যে মাছির চোখের রঙ সাদা, তার যদি ডানাও ছোট হয়, তার মানে তার x ক্রোমোসোমে উভয় জিনই (চোখের রঙ সাদা এবং ডানা ছোট হওয়ার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) রয়েছে। কিন্তু তার কয়েক প্রজন্মের অপত্যদের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখলে দেখা যায় যে মাছির চোখ সাদা তার ডানা আবার ছোট নাও হতে পারে। তার মানে কোন না কোনভাবে একই x ক্রোমোসোম থেকে দুটি জিন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মরগ্যান এই পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করলেন ক্রোমোসোমগুলো কোনোভাবে ভেঙে আবার জোড়া লাগে। এই ঘটনা ঘটে যখন দুই ক্রোমোসোমবিশিষ্ট কোষ থেকে এক ক্রোমোজমবিশিষ্ট গুক্রকোষ (sex-cell) তৈরি হয়। তিনি এর নাম দিলেন ‘রিকম্বিনেশন’। সাথে সাথে আরও ধারণা করলেন যে জিনগুলো ক্রোমোসোম-সজ্জায় যত দূরে থাকে, তত তাদের রিকম্বিনেশনের ফলে আলাদা হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। রিকম্বিনেশন আবিষ্কারের সাথে সাথেই বংশগতি সম্পর্কিত তত্ত্বগত বিতর্ক শেষ হল। কারণ, তত্ত্বগতভাবে জিন কীভাবে বাহিত হয় আর কীভাবে পরিবর্তিত হয়, সে নিয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তখনো জানা যায়নি ক্রোমোসোমের মধ্যে জিন কিভাবে সজ্জিত থাকে বা জিন বস্তুটা আসলে কি ও তার গঠন কি।

১৯১৫ সালে মরগ্যান তার দুই সহকারী বিজ্ঞানীর সাথে মিলে প্রকাশ করেন একটি বই ‘দ্য মেকানিজম অব মেডেলিয়ান হেরিডিটি’। উক্ত গ্রন্থে মরগ্যান দাবি করেন ক্রোমোসোমে রৈখিকভাবে সজ্জিত আছে কিছু মেডেলিয়ান ফ্যাক্টর; যারা পুরুষাণুক্রমে জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই সময়ের মধ্যে তিনি ড্রসোফিলার ৩০টি বিভিন্ন জিনের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে ফেলেছিলেন। এর আরো চার বছর পরে আরো অনেক ড্রসোফিলার মিউটেশন লক্ষ্য করার পরে মরগ্যান আরেকটি বই লিখেন ‘দ্য ফিজিক্যাল

বেসিস অব হেরিডিটি’। এই বইতে মেডেলিয়ান ফ্যাক্টর ছেড়ে তিনি প্রথম জিন শব্দটা ব্যবহার করেন, যা এখনো অবধি বংশগতির একককে বোঝাতে ব্যবহার হয়। মরগ্যান এই জিনের আবার কয়েক দফা বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একই জিন কয়েকটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমন যে কোনো বাহ্যিক প্রকৃতি (রঙ, উচ্চতা ইত্যাদি) একাধিক জিন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সবশেষে দাবি জানান, বংশগতি কেবলমাত্র জিনের বৈশিষ্ট্য, সমগ্র জীবের বৈশিষ্ট্য নয়; মানে জীববৈশিষ্ট্যের যেটুকু জিন-নিয়ন্ত্রিত, সেটুকুই কেবলমাত্র বংশগতির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে যাবে, বাকিটা যাবে না। সহজবোধ্য, এ কারণেই লেজকাটা ইঁদুরের বাচ্চার লেজ গোটাই থাকবে। কারণ, কাটা লেজ তো আর জিনকে প্রভাবিত করতে পারে না।

মরগ্যানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন; জিন-বিজ্ঞানী হিসাবে তিনিই প্রথম। সূচনা করে দিয়ে গেলেন এক নতুন অধ্যায়ের। ওয়াডিংটন নামের মরগ্যানের সমসাময়িক আরেক বিজ্ঞানী বলেন : “গ্যালিলিও বা নিউটনের মতই মরগ্যানের আবিষ্কার আমাদের কল্পনাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।” পঁচাগলা এক ল্যাবরেটরিতে দিনের পর দিন পড়ে থেকে মাছির ওপর নজর রেখে যুগান্তকারী আবিষ্কারের মূল ব্যক্তিত্ব এক বিজ্ঞানী এর থেকে আর কিবা বেশি প্রশংসা আশা করতে পারেন?

পর্ব - ২

মেডেল আর মরগ্যান একটা বৈজ্ঞানিক বিতর্কের মীমাংসা করলেন। চার্লস ডারউইনের তত্ত্বে যেটুকু ফাঁক ছিল, তাও আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যে বংশবৃদ্ধির সময় ক্রোমোসোমের ক্রসওভারের ফলে যে জিন-বিনিময় হয় তার ফলে একাধিক অপত্যের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা দেয়। আর এই পার্থক্যের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে উপযোগী; সেটির অধিকারী জীব বেশি করে আরো বংশবৃদ্ধি করে। ফলে সেই বৈশিষ্ট্যটি ধীরে ধীরে প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দেয়। তাহলে বিবর্তন হল প্রজাতির মধ্যে ‘ভাল জিন’ থাকা প্রাণীদের জন্য অন্য প্রাণীদের সরিয়ে জায়গা বানিয়ে নেবার গল্প যাকে বলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ডারউইন তাঁর ‘Origin of Species’ বইয়ে কৌশলে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন এই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব মানুষের ক্ষেত্রেও খাটে। ডারউইন তাঁর নিজের শেষ বই ‘ডিসেন্ট অব ম্যান’-এ লেখেন : “দুর্বলকে সাহায্য করা ভাল, কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে দুর্বল যদি বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে সমাজে দুর্বলের সংখ্যা বেড়ে যায়। এর একটিই প্রতিরোধের উপায়। সমাজে শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বলদের বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা অথবা তাদের একেবারেই বিবাহের অনুমতি না দেওয়া।”

বিজ্ঞান নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এবার দেখে নেওয়া যাক সমাজের অবস্থা তখন কেমন ছিল, মানুষ জিন নিয়ে কী ভাবত, কী আশার আলো দেখতে পেত ভবিষ্যৎ নিয়ে। তারচেয়েও বড় কথা রাজনীতিবিদেরা এ নিয়ে কি ভাবতেন? জিন মানুষের গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, এই চিন্তা তাদের কি কি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল? শিল্পায়নের পর থেকেই ইউরোপের সমাজে গরিব-বড়লোক বিভেদ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক শ্রেণীর মানুষ ছিল গরিব, বস্তিবাসী, অশিক্ষিত, যাদের মনে করা হত তারা রাষ্ট্রের কল্যাণে বেঁচে আছে। আরেকদল শিক্ষিত, ভদ্র, মিষ্টভাষী আর নিজের উন্নতিতে সচেতন। অথচ সমাজে গরিবদেরই বেশি সন্তান-সন্ততি, ঠিক যেমন এখনো হয়। এবার ডারউইন-মেডেলের তত্ত্ব একসাথে এই সমাজের ওপর প্রভাব চিন্তা করলে দেখা যায় এই অশিক্ষিতরা তাদের কৃষিকার কারণ তাদের ‘খারাপ জিন’, আর উল্টোদিকে নীতিবান উপরতলার লোকজনের ‘ভাল জিন’ তাদের ভাল করে। কিন্তু সন্তানদের মধ্যে যেহেতু পিতামাতার জিন আসে, তাই সমাজের নিচুতলায় বেশি করে সন্তান উৎপাদন হলে সমগ্র সমাজ আস্তে আস্তে ‘খারাপ জিন’-ওয়ালা মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলবে। এভাবে চললে সমাজের অবনতি অনিবার্য। মেডেল-ডারউইনের নীতির এই সামাজিক প্রয়োগের নাম ‘সোস্যাল ডারউইনিজম’ বা সামাজিক ডারউইনবিদ্যা। এই ধারণাটা যিনি প্রথম প্রস্তাব দেন তিনি হলেন হার্বার্ট স্পেন্সার, যার বিষয় ছিল বিবর্তনগত প্রগতি (Evolutionary Progressivism)। তিনি বলেন প্রতি ব্যক্তিই প্রগতির একটি একক, আর এই প্রগতি আসে সমাজের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে।

এই সোস্যাল ডারউইনিজমের ধারণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান ডারউইনেরই এক নিকটাত্মীয়, ফ্রান্সিস গ্যাল্টন। তিনিও সামাজিক প্রগতির সাথে সোস্যাল ডারউইনিজমের সম্পর্ক বিশ্বাস করতেন। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত ‘হেরিডিটারি জিনিয়াস’ বইতে তিনি লেখেন প্রতিভা বা ট্যালেন্ট হল উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার থেকে প্রাপ্ত একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি এজন্য অনেক পরিবারের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে দেখালেন এক পরিবারের লোকজন একই পেশায় ক্রমাগত সফল হচ্ছে। ১৮৭৪ সালে তাঁর পরবর্তী বই ‘ইংলিশ মেন অব সায়েন্স- নেচার ভার্চুয়ালি নার্চার’-এ তিনি ব্যবহারিক জিনবিদ্যার সূচনা করেন আর সিদ্ধান্ত নেন যমজ বাচ্চাদের নিয়ে গবেষণা করেই জানা সম্ভব মানুষের বেড়ে ওঠার ওপর পরিবেশ আর জিনের প্রভাব কতটা। সবশেষে ১৮৮৩ সালে ডারউইনের মৃত্যুর পরে, গ্যাল্টন ‘সামাজিক ডারউইনবিদ্যা’কে হাতিয়ার করে এক সামাজিক বিপ্লবের ডাক দেন। একটা নতুন টার্ম ব্যবহার করেন তিনি ‘ইউজেনিক্স’ (Eugenics)। যার মানে ‘ক্ষণজন্মা’ (Good in birth)। গ্যাল্টন ছিলেন এককথায় বহুমুখী প্রতিভা। জীববিদ্যার সাথে সাথে পরিসংখ্যানেও তাঁর ছিল অসম্ভব দখল। সে কারণেই হয়তো সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা খুব বেশি ছিল। ফলাফল ইউজেনিক্স খুব দ্রুতই বিজ্ঞানীমহলের সমর্থন আদায় করে নেয়।

ইউজেনিক্স ছিল এক অর্থে গ্যাল্টনের গবেষণার অনুকল্প (Hypothesis)। প্রতিভা, ভাল বা খারাপ গুণ যদি পরিবার বা জিন-নির্ভর হয় তাহলে সমাজের প্রগতির একমাত্র উপায় হল প্রতিভাবানদের বেশি সন্তান উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা, আর ‘খারাপ’দের নিরুৎসাহিত করা। এভাবেই সমাজ থেকে খারাপ জিন দূর করা সম্ভব, প্রগতিও আনা সম্ভব। খুব সহজেই বামপন্থীদের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয় এই অনুকল্প। এর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ, যিনি লেখেন : “এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে একমাত্র কোনো ইউজেনিক্স ধর্মই আমাদের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।”

ইউরোপে যে সময়ে গ্যাল্টনের মত মেনে সবাই প্রতিভাবান বা উঁচুতলার মানুষদের বেশি করে সন্তান নিতে বলেছে, সেই একই সময়ে আমেরিকায় এই একই বিপ্লব উল্টোপথে হেঁটে সমাজের নিচুতলার মানুষদের সন্তান উৎপাদন কমানোর দিকে নজর দেয়। ১৮৭৫ সালে রিচার্ড দুগডাল নিউইয়র্কের একটি গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা করে বলেন, এই গোষ্ঠী প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই একইভাবে জোচ্ছুরি, ছিনতাই আর রাহাজানি করে আসছে। কিন্তু এই ধারণাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান চার্লস ড্যাভেনপোর্ট। ১৯১০ সালে লংআইল্যান্ডে বিখ্যাত কোল্ড স্প্রিং হার্বার ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর হিসাবে তিনি শুরু করেন প্রথম ইউজেনিক রেকর্ড অফিস। এই অফিসের কাজ ছিল জিন-নির্ভর বৈশিষ্ট্য (কুষ্ঠরোগ থেকে আরম্ভ করে অপরাধপ্রবণতা) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও তাদের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে রাখা।

ড্যাভেনপোর্ট নিজেও একরকম ইউজেনিক্স চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মেয়েদের পর্যবেক্ষণ আর সামাজিকবিদ্যা ছেলেদের চেয়ে ভাল; তাই ড্যাভেনপোর্ট এই কাজে শুধু মেয়েদেরই নিযুক্ত করতেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত ‘হেরিডিটারি ইন রিলেশন টু ইউজেনিক্স’ বইতে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন, সমস্ত দক্ষতাই পরিবারভিত্তিক; তা সে গান-বাজনা থেকে শুরু করে বোট বানানো পর্যন্ত যেকোনো দক্ষতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি এমনকী আরো এক ধাপ এগিয়ে পদবির সাথে চেহারার সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টাও করেন। একটি বিশেষ পদবিধারী লোকজন যে ‘বলিষ্ঠ, চওড়া কাঁধ, মোটা ভুরু আর সঙ্গীতপ্রেম’-এর অধিকারী হয়, তাঁর গবেষণার ফল তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ইউজেনিক্স ইউরোপের পাশাপাশি আমেরিকায় ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। স্থানীয় ইউজেনিক্স সোসাইটি তৈরি হয় যারা ‘উন্নত পরিবার’দের পুরস্কৃত করত, উৎসাহ দিত আরো বেশি করে সন্তান উৎপাদনে। অপর পাশে ছিল অনুন্নতদের জোর করে জন্মনিয়ন্ত্রণ। ১৯০৭ সালে ইন্ডিয়ানা স্টেটে প্রথম পাশ করা হয় বন্ধ্যাত্বকরণ আইন, যার ফলে অপরাধী, জড়বুদ্ধি, ধর্ষক বা চূড়ান্ত বোকাদের সমাজের স্বার্থে বন্ধ্যাত্বকরণ করানো বাধ্যতামূলক করা হল। এই আইনের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস হয়েছিল, কিন্তু

১৯২৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ব্যাপারটা পাকা হয়ে যায় : ‘সমাজের যারা বোঝা, তাদের বাচ্চারাও সমাজের বোঝাই হবে। সুতরাং তাদের পৃথিবীতে না আসার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।’ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় এরকম ষাট হাজার মানুষের বন্দ্যাত্বকরণ করানো হয়েছিল। এই ডেউ গিয়ে লাগে নাৎসি জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতেও। সেখানেও চলে আইন করে নিচুতলার ওপর অত্যাচার, বলপূর্বক বন্দ্যাত্বকরণ।

এরপরে ইউজেনিক্সের সাথে আরো একটি মাত্রা যোগ হয় ‘বিজ্ঞানসম্মত বর্ণবিদ্বেষ’। আসলে ইউজেনিক্সের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের সব উপাদানই ছিল আগে থেকেই। শুধু দরকার ছিল অগ্নিতে ঘুতাহুতি। সেই কাজটাই করলেন আইনজীবী ম্যাডিসন গ্রান্ট। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত ‘দ্য পাসিং অব গ্রেট রেস’ বইতে তিনি দাবি জানালেন নর্ডিকরা (উত্তর-ইউরোপিয়ান) জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ, নিগ্রো, এশিয়ান, এমেনকী বাকি ইউরোপিয়ানদের চেয়েও। গ্রান্ট এই ভিত্তিতে নর্ডিক নয় যারা তাদের আমেরিকায় অভিবাসনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। এ জন্য তিনি ‘আমেরিকান ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিকশন লীগ’ নামের একটি সংস্থায় যোগ দেন। এর আগে তিনি গ্লাটন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, ড্যাভেনপোর্টের সাথে মিলে। এই সময়েই আই-কিউ টেস্ট ‘প্রমাণ’ করে দিল আমেরিকায় অভিবাসীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই সাধারণ আমেরিকানদের তুলনায় বুদ্ধিবিদ্যায় নিচুমানের। মজার কথা এই আই-কিউ টেস্টগুলোতে অধিকাংশ প্রশ্নই হত জ্ঞানভিত্তিক, তাও প্রশ্ন হত ইংরেজিতে। আমেরিকা সংক্রান্ত জ্ঞান আমেরিকানদের বেশি থাকাই যে স্বাভাবিক, এই নিশ্চিত সত্যকে উপেক্ষা করেই প্রচার এগিয়ে চলল। এই কাজে গ্রান্টের সহযোগী ছিলেন হ্যারি লাফলিন নামক আরেক বর্ণবিদ্বেষী বৈজ্ঞানিক। গ্রান্ট নিজে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের খুব নিকট বন্ধু ছিলেন।

যাহোক, গ্রান্টের বই পাঠকমহলে খ্যাতি পেতে সময় নেয়নি। ১৯৩৭ সালের মধ্যে বইটির ১,৩৭,০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল যা তৎকালীন হিসাবে অকল্পনীয়। খ্যাতির সাথে সাথে বইয়ের জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে। বইটি অনূদিত হতে থাকে বিভিন্ন ভাষায়। ১৯২৫ সালে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয় বইটি আর এটা প্রভাবিত করে এক রাষ্ট্রনায়ককে অ্যাডলফ হিটলার। হিটলার নিজে গ্রান্টকে ব্যক্তিগত চিঠিতে পরিষ্কার লেখেন : ‘এই বইই হল আমার বাইবেল।’

ইংল্যান্ডে ফ্রান্সিস গ্যাল্টন যে কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন সেই কাজকেই আমেরিকায় অন্য মাত্রা এনে দিলেন গ্রান্ট। আর এই প্রথমবারের জন্য এই বর্ণবিদ্বেষী ধারণা স্থান করে নিল জার্মানির একনায়কের মস্তিষ্কে। আর সাথে ছিল তাঁর (হিটলার) সহযোগী কিছু ভণ্ড বিজ্ঞানীও। শুরু হল ইউজেনিক্সের নাৎসি ভার্সন। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই হিটলার আমেরিকানদের অনুকরণে আইন প্রবর্তন করলেন ‘জিনগত ত্রুটি নির্মূল’ করার জন্য। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ২,২৫,০০০ মানুষের বন্দ্যাত্বকরণ

করানো হল। এই বিষয়ে শুরু হল এক বিশেষ ধরনের কোর্ট ‘হেরিডিটি কোর্ট’। এর সাথে ছিল সমাজের ‘ভাল’দের আরো বেশি করে সন্তান নিতে উৎসাহী করে তোলা। ১৯৩৬ সালে আইন করে তাদের সন্তানসম্ভবা স্ত্রীদের জন্য ভাল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। ইহুদিরা নর্ডিক ছিল না, তাই তাদের সাথে মূল জার্মানদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হল, যাতে জার্মান জিন ইহুদিদের সাথে মিশে অনুন্নত সন্তানের জন্ম না দিতে পারে। নাৎসিদের রাজত্বের শেষদিকে দেখা গেল মোট ৪ লক্ষ মানুষের বন্দ্যাত্বকরণ করা হয়েছে আর স্থাপিত হয়েছে ২০০ হেরিডিটি কোর্ট।

দশকের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দেখা গেল এভাবে একটা বড় দল তৈরি হয়ে গেছে যাদের বন্দ্যাত্বকরণ করা হয়েছে অথচ তারা কারাগারে রাষ্ট্রের পয়সায় খেয়ে চলেছে। তাই নাৎসিরা বুঝে গেল বন্দ্যাত্বকরণ হয়তো অনুন্নত অপত্যের হাত থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু এক প্রজন্মের কিছু ‘অপদার্থ’কে জন্ম দেয় যারা সরকারি পয়সায় জীবন যাপণ করে। তাই সরকারি হাসপাতালে প্রশ্নপত্র বিলি করা হল, এদের পরীক্ষা নেবার জন্য। পরীক্ষায় ৭৫,০০০ লোক পাশ করতে পারল না। তাদের চিহ্নিত করা হল ‘খাদ্য ধ্বংসকারী’ বা ‘বঁচে থাকার অনুপযুক্ত’ বলে। কিছুদিনের মধ্যেই নাৎসি-বিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত করে সমস্ত ইহুদি আর জিপসিদের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন। আর এদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তৈরি হল গ্যাস চেম্বার, গণহত্যার মারণাস্ত্র। এইভাবে, গ্রান্টের অনুকল্পের মধ্যে দিয়ে যে বর্ণবিদ্বেষ শুরু হয়েছিল, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে গিয়ে তা এক গণহত্যালীলার আকার ধারণ করল। জার্মান জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য দেশের মধ্যের ‘অনুন্নত’দের সরিয়ে দেবার এই মুতু্যছকই ইউজেনিক্সের শেষ অবদান।

ইউজেনিক্স ছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। যদিও আজ অবধি ইউজেনিক্সের মূল দায় বিজ্ঞানীদের ঘাড়েই চাপানো হয় বাস্তবে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বাথরক্ষার্থে ইউজেনিক্সকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। যতজন না বিজ্ঞানী ইউজেনিক্সে সামিল হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিল সমাজবিজ্ঞানী আর রাজনীতিবিদরা; যারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন একে। রাষ্ট্রের ধারণা ছিল এই বিজ্ঞানের অজুহাতে যদি নিচুতলার মানুষগুলো সরিয়ে ফেলা যায়। সাথে ছিল কিছু বর্ণবিদ্বেষী বিজ্ঞানী, যারা অবৈজ্ঞানিক প্রথায় সার্ভে করে অদ্ভুত সব ফলাফল হাজির করতেন। লক্ষণীয় বিষয় হল ইউজেনিক্সে যাদের মূল অবদান, সেই বিজ্ঞানীদের কেউই নোবেল পুরস্কার পাননি, মূল বিজ্ঞানীমহলেও এই অনুকল্পটি যথেষ্ট বিতর্কিত ছিল। অথচ তাদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র আইন প্রবর্তন করে। বিজ্ঞানের এতটা স্বার্থান্বেষী ব্যবহার ইতিহাসে বিরল।

পর্ব - ৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণলীলা শেষ হতেই ইউজেনিক্সের দাপটও শেষ হল। কিন্তু চাহিদা ফুরলো না জিন-বিজ্ঞানের। নতুন নতুন আবিষ্কার থেমে থাকল না। মরণগ্যান সমাধান

করে দিয়ে গেছেন যে ক্রোমোসোমের মধ্যেই থাকে বংশগতির চাবিকাঠি, সেই চাবিকাঠি এবার হাতে তুলতে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু তার জন্য জানা চাই বংশগতির রাসায়নিক তত্ত্ব; যা রাসায়নিক আকারে বলে দেবে বংশগতি ঠিক কিভাবে প্রবাহিত হয়। যখন ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হিমশিম খাচ্ছেন, সেই সময়ে ফ্রেডেরিক মিশার নামে এক সুইস জীববিজ্ঞানী পুঁজ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন এর মধ্যে নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায়। পরে তিনটি শ্বেতকণিকার ক্রোমোজোমকে নিউক্লিক এসিডের উৎস হিসাবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি এই এসিডের নাম দেন নিউক্লিইন। মিশার সঠিকভাবে ধারণা করতে পেরেছিলেন যে বংশগতি কোনো রাসায়নিকের মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। মিশার নোবেল পুরস্কার পাওয়া অবধি বেঁচে থাকতে না পারলেও আরেক বিজ্ঞানী এরপরে নিউক্লিক এসিড নিয়ে কাজ করে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি হলেন অ্যালব্রেখট কোসেল। ১৯১০ সালে প্রোটিন আর নিউক্লিক এসিড নিয়ে কাজ করার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। নিউক্লিক এসিড নিয়ে কাজ তখন সবে শুরু। নিউক্লিক এসিডের গঠন নিয়ে এর পরে কাজ করলেন ফিবাস লেভেন, নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইন্সটিটিউটে। লেভেন কোষে পাওয়া নিউক্লিক এসিডের রাসায়নিক উপাদানগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিউক্লিক এসিডের চার উপাদান, যথা এডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C) আর গুয়ানিন (G)। কিন্তু লেভেন ক্রোমোসোমের নিউক্লিক এসিডের সঠিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ১৯২৯ সালে ডিএনএ বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড আবিষ্কার করার পরে তিনি দাবি করেন এটি মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত।

লেভেনের এই আবিষ্কার ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা ব্যাপার তখন বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বংশগতির বাহক যেহেতু খুবই জটিল বার্তা বহন করে, তাই তার রাসায়নিক কাঠামোও জটিল হবে। লেভেনের আবিষ্কারের পরে বোঝা গেল ডিএনএ'র কাঠামো এই জটিল বার্তা ধারণের পক্ষে উপযোগী হবে না। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকলেন প্রোটিনই হবে সেই বার্তাবাহক। ২০ রকমের বিভিন্ন এমিনো এসিড দিয়ে তৈরি বলে প্রোটিনের বিভিন্ন রূপ ধারণ করা সম্ভব আর বার্তা বহনের কাজও করা সহজ। অপরদিকে, মাত্র চারটে (A, T, C, G) ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দিয়ে তৈরি চার শৃঙ্খলার অণু কিছুতেই অত জটিল বার্তা বহন করতে পারে না।

এই ভুল ধারণা আরো অনেক দিন রয়ে যেত, যদি না আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে এক অঘটন না ঘটিয়ে ফেলতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টায় ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ গবেষণা করছিলেন নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। এই ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের; একটা মারাত্মক ধরনের আরেকটা নির্বিষ। প্রথম ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে বলা হত S (Smooth) আর দ্বিতীয়টিকে R (Rough)। এই S ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করলে ইঁদুরের দ্রুত মৃত্যু হত। কিন্তু R ব্যাকটেরিয়া কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দেখা গেল, S ব্যাকটেরিয়ার

কোষের বাইরের দিকে উপস্থিত একটি বিশেষ পদার্থের আচ্ছাদন কোষকে রক্ষা করত, R ব্যাকটেরিয়ার কোষে এরকম কিছু ছিল না। এবার বিজ্ঞানী গ্রিফিথ কিছু মৃত S ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুর মরে না। সবশেষে মৃত S ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে R ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা হল। এবার গ্রিফিথকে অবাক করে দিয়ে ইঁদুরটা মরে গেল। কিভাবে মৃত ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে ওঠে ইঁদুরটাকে মেরে দিল? দুই ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া কিভাবে যড়যন্ত্র করে মেরে ফেলল ইঁদুরটাকে? মৃত ইঁদুরের শরীর থেকে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা গেল ওগুলো সব S ব্যাকটেরিয়া। এর মানে জিনগতভাবে বদলে গেছে ব্যাকটেরিয়া। কিন্তু কিভাবে এরকম হল? মানব সভ্যতার ইতিহাসে, চোখের সামনে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন করা আগে কখনো দেখা যায়নি। গ্রিফিথই প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে এটা ঘটে? মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে কি এমন উপাদান সংগ্রহ করে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে?

সেই সূত্র উদ্ঘাটন করলেন অসয়াল্ড আভেরি, অনেক পরে ১৯৪৪ সালে রকফেলার ইন্সটিটিউটেই। তিনি বিজ্ঞানী ম্যাকলেড আর ম্যাককার্টির সাথে মিলে প্রমাণ করলেন যে উপাদান সংগ্রহ করে এই রূপান্তর ঘটে তা হল ডিএনএ, পুরো নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড। গ্রিফিথ যে কাজটা মৃত S ব্যাকটেরিয়া দিয়ে করেই বিস্মিত হয়েছিলেন, সেটাকে এই বিজ্ঞানীরা কয়েক ভাগে ভেঙে নিলেন। প্রথমে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর বাইরের আচ্ছাদন সরানো হল আর তারপরে আগের প্রক্রিয়া চালানো হল, তাতেও রূপান্তর হল। তার মানে বাইরের আচ্ছাদনের কোনো ভূমিকা নেই রূপান্তরে। একই ভাবে তিনি এর পরে একে একে মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে প্রোটিন ও আরএনএ সরিয়ে দিয়ে দেখলেন রূপান্তর হচ্ছে। সবশেষে ডিএনএ কোষ থেকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেল আর কোনো রূপান্তর হচ্ছে না। তার মানে গল্পটা এরকম দাঁড়ালো : মৃত S ব্যাকটেরিয়াগুলোর ডিএনএ জীবিত S ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত হচ্ছে, নতুনরূপ ধারণ করছে। তার মানে ডিএনএ'ই হল জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক; অন্য কথায় ডিএনএ জিনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আভেরির মত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। আভেরি, ম্যাকলেড আর ম্যাককার্টি কেউই নোবেল পুরস্কার পেলেন না। (অনেক পরে বাংলাদেশে কলোরা নিয়ে গবেষণাকেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন ম্যাকলেড। ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত বাংলাদেশের কলোরা গবেষণা কেন্দ্র এখন পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়েরিয়া ডিসিসেস রিসার্চ বা সংক্ষেপে আইসিডিডিআরবি নামে।) ততদিনে প্রোটিন নিয়ে বংশগতির ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই গঁথে গিয়েছিল যে অনেক বিজ্ঞানীই তার মত পাতাই দিলেন না। এই পাতা না দেবার দলে ছিলেন সুইডিশ রসায়নবিদ এইনার হ্যামারস্টেনও। কিন্তু হ্যামারস্টেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বসলেন, নোবেল কমিটিতে আভেরির নমিনেশনের বিরোধিতা করলেন। পঞ্চাশ

বছর পরে নোবেল আর্কাইভ থেকে জানা গেল এই নির্মম সত্য। মজার কথা, হ্যামারস্টেন নিজেও কিন্তু ডিএনএ নিয়েই কাজ করেছেন। অথচ তিনি ফ্লুগস্করেও টের পাননি এর কী মহিমা হতে পারে। উনি আর বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর মত মনে করলেন প্রোটিনই হবে বোধহয় বংশগতির বাহক; আর এর ফলে নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হল একটি মৌলিক গবেষণা ও গবেষক। ডিএনএ'র প্রকৃত কাঠামো জানা যাবার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান। জেমস ওয়াটসন তার বই 'DNA'-তে লিখেছেন আর কয়েক বছর বাঁচলে তিনি হয়তো নোবেল পুরস্কার পেয়েই যেতেন। আরেক নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী আর্নে টিসেলিয়াসের মতে নোবেল না পাওয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে আভেরিই ছিলেন সবথেকে যোগ্য বিজ্ঞানী।

অনেক সময়েই বিজ্ঞানের একাধিক শাখা একে অপরের সাথে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু আজকের স্পেশলাইজেশনের যুগে দেখা যায় ক্রস-ডিসিপ্লিন নলেজ বা একাধিক শাখায় দক্ষ লোকের সংখ্যা দ্রুতই কমেছে। তবে যখনকার কথা বলছি, তখন এই সমস্যাটা এত গভীর ছিল না। তাই জ্ঞান বিনিময়ের জন্য বিজ্ঞানীদের অভাব হত না। তাও কিছু কিছু বিজ্ঞানী এদের মধ্যে আলাদা করে জায়গা করে নিতে পারেন। আর কেউ কেউ পারেন এক শাখার বিজ্ঞানীদের অন্য শাখায় উৎসাহিত করে তুলতে। শেষোক্ত কাজটিই করেছিলেন অস্ট্রিয়ান নোবেলজয়ী পদার্থবিদ এরুইন শ্রোডিংগার।

শ্রোডিংগার কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একজন নিবেদিত প্রাণ পদার্থবিদ ছিলেন। ১৯৪৩ সালে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জানালেন যে বিষয়বস্তু পদার্থবিদদের অতি পরিচিত গাণিতিক সমীকরণের খুব একটা ধার ধারে না। এই বক্তৃতাটিতেই তিনি প্রথম জীবন ও তার অর্থ বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলেন। এরপরে, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'হোয়াট ইজ লাইফ' নামক তাঁর বইতে তিনি লিখেছিলেন যে জীবনের উদ্দেশ্য হল কিছু তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ আর প্রবাহ। আর ক্রোমোসোম হল এই তথ্যের ধারক। বংশানুক্রমিকভাবে আসা এই তথ্য ক্রোমোসোমের জটিল অণুদের বিন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই জীবন কী সেটা বুঝতে গেলে আগে ওই বিন্যাস বুঝতে হবে। এটাই ছিল তাঁর বইয়ের মূল বক্তব্য।

এদিকে একই সময়ে পদার্থবিদরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত জটিল তত্ত্ব দিয়ে পরমাণুর গঠন ও তাদের আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ, যা পরমাণুর চেয়েও অনেক বেশি জরুরি তা হল আমাদের জীবনের উৎস, মেকানিজমগুলি বোঝা। তা নিয়ে গবেষকেরা আকাল। ট্র্যাডিশনাল জীববিজ্ঞানীরা অধিকাংশই পর্যবেক্ষণ নিয়েই মগ্ন থাকেন, গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করে দেখেন না বা পরিসংখ্যানেও ততটা দক্ষ নন। শ্রোডিংগারের বই অনেক পদার্থবিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানীকেই জীবনের তথ্য উদ্ঘাটনের পথে আনতে সক্ষম হল। মজার কথা, ডিএনএ আবিষ্কারের নাটকের কুশীলবদের অধিকাংশই এই বই পড়েই 'জীবন' নিয়ে গবেষণার পথে আসেন।

যেমন ধরা যাক মরিস উইল্কিন্সের কথা। এই পদার্থবিদ পরমাণু বোমা তৈরিতে ম্যানহাটন প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলেন। বোমার আসল রূপ হিরোশিমা-নাগাসাকিতে দেখে তার বোধোদয় হল। তিনি একরকম পাগল হয়েই প্যারিসে চলে যাবেন ভাবছিলেন চিত্রকর হবার শখে। এই সময়েই তার হাতে এসে পড়ে শ্রোডিংগারের বইটি। বইটি পড়ে উনি উৎসাহিত হয়ে পড়েন জীবন সংক্রান্ত গবেষণায় আসতে। তিনিই সর্বপ্রথম 'এক্সরে ডিফ্রাকশন টেকনলজি' ব্যবহার করে ডিএনএ'র গঠন পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেন। হয়তো একজন পদার্থবিদ ছাড়া এই চিন্তা সাধারণ জীববিজ্ঞানীদের মাথায় আসতো না। আরেকজন ছিলেন ফ্রান্সিস ক্রিক। যিনি মূলত ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র এবং তার পদার্থবিদ্যার মত যুক্তিনির্ভর ও মডেলভিত্তিক গবেষণার অভ্যাসও এই ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- নারায়ণ সেন, *ডারউইন থেকে ডিএনএ*, ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- ম. আখতারনজ্জামান, *বিবর্তনবিদ্যা*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- James D. Watson, Andrew Berry, *DNA: The Secret if Life*, 2004, Random House inc, Newyork.
- James D. Watson, *The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA*, 2001, Simon & Schuster, Newyork.
- Franklin H. Portugal, Jack S. Cohen, *A Century of DNA: A History of the Structure and Function of the Genetic Substance*, 1980, The MIT press.
- A. H. Sturtevant, *A History of Genetics*, 2001, Cold Spring Harbor Laboratory Press.

প্রসঙ্গ ‘বিবর্তন’ : জাকির নায়েকের মিথ্যাচার

শিক্ষানবিস*

এক

পাঠকের কাছে অনুরোধ, এ প্রবন্ধটি পাঠ শুরু করার আগে অবশ্যই ইন্টারনেটের ভিডিও দেখার ওয়েব সাইট ‘ইউটিউব’ থেকে ‘Theory of Evolution—An Islamic Viewpoint’ শিরোনামের জাকির নায়েকের ইংরেজি ভাষ্যের লেকচারটি দেখে নিন। লেকচারটির ওয়েব ঠিকানা : http://www.youtube.com/watch?v=y-_BDLNfcOc। একবার নয়, দু-তিনবার দেখুন, ভালো করে শুনুন; কারণ, প্রবন্ধটির গোটা বিষয়বস্তুই আলোচ্য লেকচারের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তাই লেকচার আগে শুনে নিলে অথবা প্রবন্ধটি পাঠের সময় শুনতে থাকলে ‘বিবর্তন’ সম্পর্কে জাকির নায়েকের কথাগুলো সহজেই বোধগম্য হবে; এবং প্রবন্ধের সঠিকতাও যাচাই করা যাবে।

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক। সংক্ষেপে জাকির নায়েক। আকাশ-সংস্কৃতির এ যুগে বাংলাদেশের ইসলামিক টিভি এবং ভারতের পিস টিভি’র বদৌলতে জাকির বাংলাদেশে এখন আর অপরিচিত লেকচারের উপর ভিত্তি খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃশ্য বই (অনুবাদ : মোঃ পাবলিকেশন, ঢাকা) জাকির নায়েক ভারতের থেকে এম.বি.বি.এস পেশায় চিকিৎসক থেকে ইসলামি একনিষ্ঠভাবে চিকিৎসা পেশা থেকে ‘ইসলামিক রিসার্চ



কোন ব্যক্তি নন। তাঁর করে রচিত ‘ইসলাম ও নামের বাংলায় অনুদিত মারুফ হাসান, পিস থেকে জানা যায় : মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে হলেও ১৯৯১ সাল দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অব্যাহতি নেন। তিনি ফাউন্ডেশন’ (IRF)-

* শিক্ষানবিস : শিক্ষার্থী, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। মুক্তমনা (www.mukto-mona.com), সচলায়তন (www.sachalayatan.com) ওয়েবে ‘ব্লগ লেখক’ হিসেবে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত ব্লগ : <http://bigganpuri.wordpress.com>।

এর প্রতিষ্ঠাতা। দাওয়াতি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাকির নায়েক নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক Peace TV-তে বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার প্রদান করে থাকেন, যেমন : বিভিন্ন ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্মে ‘আল্লাহ’ সম্পর্কে ধারণা, সন্তাসবাদ এবং জিহাদ, মিডিয়া এবং ইসলাম, ইসলামে নারীর অধিকার, ইত্যাদি। (আর এই লেকচারগুলোই বাংলায় ডাবিং করে বাংলাদেশের ইসলামিক টিভি প্রচার করে থাকে)। পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মগ্রন্থকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট; ‘আল কোরান এবং আধুনিক বিজ্ঞান’, ‘বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কোরান’ প্রভৃতি আকর্ষণীয় শিরোনামে লেকচার প্রদান করেছেন বিভিন্ন সময়। এ সমস্ত লেকচার সিডি, ডিভিডি’র পাশাপাশি বাংলায় অনুদিত বই আকারে রাজধানী ঢাকার সিডি-বইয়ের দোকানের গণ্ডি ছাড়িয়ে মফস্বল এলাকার সিডি-বইয়ের দোকানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বেশ আগেই। তাঁর লেকচার শুনে এবং বাংলায় অনুদিত বইগুলো পাঠ করে বোঝা যায়, তিনি ইসলাম ধর্ম এবং কোরান শরিফকে ‘জাস্টিফাই’ করে ‘বিজ্ঞানসম্মত’ প্রমাণ এবং অন্য ধর্ম-ধর্মগ্রন্থগুলিকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক হিসেবে উপস্থাপনে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আসছেন।

বিবর্তন নিয়ে সারা বিশ্বে কম-বেশি সব ধর্মের কটরপন্থী ধার্মিকদের মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও বিজ্ঞান-অঙ্গনে বিবর্তনের অস্তিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতা নেই। বিবর্তন নিয়ে যাদের অল্পবিস্তর পড়াশোনা আছে, তারা জানেন বিবর্তনের পদ্ধতি নিয়ে হয়তো বিজ্ঞানীর মধ্যে যৌক্তিক বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রাণীজগৎ, চারপাশের পরিবেশ সবকিছুই যে বিবর্তিত হচ্ছে, বিবর্তনের মাধ্যমেই প্রজাতির উদ্ভব এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বিবর্তনের সংশ্লেষণী তত্ত্ব, আণবিক জীববিজ্ঞান, কোষবংশগতিবিদ্যা, Evolutionary Developmental Biology (সংক্ষেপে Evo-Devo) নামের জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা শতশত প্রমাণ হাজির করে বিবর্তনকে ‘সত্য’ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকের যুগে একজন পদার্থবিদের কাছে গ্যালিলিও’র ‘পড়ন্ত বস্তুর সূত্র’, ‘মহাকর্ষ-অভিকর্ষ বল’, আইনস্টাইনের ‘থিওরি অব রিলেটিভিটি’ যতটুকু সত্য, একজন জীববিজ্ঞানীর কাছে ‘বিবর্তন’-ও ঠিক ততটাই সত্য।

কিন্তু ইসলামি অঙ্গনের পরিচিত মুখ জাকির নায়েক এই ‘জাজ্বল্যমান সত্য’কে মিথ্যা বলেছেন। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতির আবেগকে উক্ষে দিতে হাতে কোরান শরিফ নিয়ে ‘বিবর্তন তত্ত্ব’ মিথ্যা প্রমাণ করার মিশনে নেমেছেন।

পূর্বেই বলে নেওয়া ভাল, একজন জাকির নায়েক বিবর্তনকে অস্বীকার করতেই পারেন, তাতে বিজ্ঞানের কিছু যায় আসে না। তিনি যদি পড়ন্ত বস্তুর সূত্র ‘মিথ্যা’ বলে বিশ্বাস করেন, কিংবা জীববিজ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলে মানতে না চান, তাতে কি হল? একজন ব্যক্তি জাকির নায়েকের বিশ্বাস কিংবা তাঁর মত হাজার হাজার ব্যক্তির বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞান কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ বিজ্ঞান কোনো ডেমোক্রেসির ব্যাপার নয়।

বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পরীক্ষণ-নির্ভর, তথ্য-উপাত্ত প্রমাণের বিষয়। এর সাথে যোগ করে আমরা বলতে পারি, বিবর্তন তত্ত্ব ভ্রান্ত কী সত্য-তা কারো মতামত বা মানা না-মানার ব্যাপার নয়। শিক্ষিত এমন কী বিজ্ঞানের কোন শাখায় উচ্চতর ডিগ্রিধারী ও বিজ্ঞানীদের অবৈজ্ঞানিক মতামতও এখানে মূল্যহীন।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তবে একজন ‘জাকির নায়েক’ নিয়ে কেন এ লেখা? কারণ জাকির নায়েক সম্পর্কে ইদানীং সাধারণ মুসলমানদের মনে যেভাবেই হোক একটা শ্রদ্ধার আসন গড়ে উঠেছে। তিনি ইসলামকে বিশ্বের অন্য যে কোনো ধর্মের তুলনায় আধুনিক, র্যাশনাল প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিকদের সাথে প্রকাশ্যে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শোনা যায়, একদা খ্রিস্ট ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ বেনেডিক্টকে প্রকাশ্যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তাই জাকির নায়েকের মত মহারথীর সমালোচনা, অনেকের কাছে সরাসরি ‘ইসলামের’ বিরুদ্ধে সমালোচনা বলে অনুভূত হতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধকরি জরুরি। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য (ইসলাম ধর্মের সমালোচনা), মোটেই তা নয়। নিখাদ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা। বিবর্তন বা বিজ্ঞানের যে কোন শাখা নিয়ে কারো মনে সংশয় থাকতে পারে, অবাস্তব মনে হতে পারে, যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মঙ্গল অভিযান; কিংবা জানেন না বলে বিরোধিতা করতে পারেন, যেমন স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা। কিন্তু মূল ভিত্তি সম্পর্কে একদমই না জেনে, ‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে’ সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তির বিবর্তন হোক আর বিজ্ঞানের যে কোন শাখাই হোক, এর সমালোচনা করা, বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো কতটুকু ন্যায্যসঙ্গত? একজন বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে ঐ ব্যক্তির এই ভুলগুলো ধরিয়ে দেবার আদৌ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের জন্য বিজ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন, বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচার ধরিয়ে দেওয়া নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়।

দুই

মূল আলোচনায় যাই। ইউটিউবে প্রচারিত ঐ ভিডিওতে দেখা গেল একজন মহিলা জাকির নায়েককে বিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁর প্রশ্নটা বাংলা করলে দাঁড়ায় : “ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ অন্য প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এটা তো ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী। আপনি এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?”

প্রশ্নের উত্তর দিতে জাকির নায়েক মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শক-শ্রোতা। তিনি প্রায় ৭ মিনিটের বক্তৃতা দিলেন : “ডারউইন এবং বিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা। বিভিন্ন উদাহরণের কথা বলে দেখাতে চাইলেন, ‘বিবর্তন কিচ্ছু না! সম্পূর্ণ ভুল একটা ব্যক্তিগত মতবাদ, যার উপর ডারউইনের নিজেরও আস্থা ছিল না।’ লেকচার শেষে হিসেব কষে দেখি প্রায় ৭ মিনিটের এই লেকচারে জাকির ২৮টি ‘মিথ্যা’

কথা বলেছেন। লেকচার শুনলে অনেকে হয়েতো এই মিথ্যা কথাকে ‘ভুল’ বলতে পারেন। কিন্তু আমি ‘ভুল’ বলতে রাজি না। কারণ যে ব্যক্তি খুব দ্রুততার সাথে কোরান-গীতা-বেদ-বাইবেলের অমুক চ্যাপ্টারের তমুক ভাষা মুখস্ত বলে যেতে পারেন (এবং তাঁর দক্ষ স্মৃতিশক্তি এবং মুখস্ত বলে যাওয়ার ক্ষমতার কারণেই বিশ্বের বিরাট সংখ্যক মুসলমানের কাছে ‘হিরো’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন) তাঁর পক্ষে এত সহজ-সাধারণ ভুল করা সম্ভব—এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়; এবং চার্লস ডারউইনের জীবনী এবং বিবর্তন তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের প্রচুর বইয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দুর্মূল্য ও দুর্লভ কোন কিছু নয়। তারওপর তিনি পেশায় একদা চিকিৎসক ছিলেন, আজকের যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ন্যূনতম হলেও বিবর্তন-বিদ্যা পাঠ যে আবশ্যিক, এটাও মনে রাখতে হবে। তবে এই যুক্তিতে তাঁর বক্তব্যকে ‘ভুল’ বলা যায় : ‘যদি তিনি বিবর্তন তত্ত্ব বোঝেন না, এ সম্পর্কিত কোনো অথেন্ডিক বই পাঠ করেননি কখনো, ডারউইনের নাম জেনেছেন শুধু আর কিচ্ছু জানেন না’ বলে মনে করেন কেউ—তাহলে ঠিক আছে। মনে প্রশ্ন ওঠে, মিলনায়তন ভর্তি শতাধিক দর্শক-শ্রোতার মধ্যে একজনও কি এই মিথ্যাগুলো ধরিয়ে দেয়ার মত জ্ঞান ও সাহস রাখেন না? চার্লস ডারউইন আর জৈববিবর্তন নিয়ে মানুষের এতোই অজ্ঞানতা!

উল্লেখ্য, ‘বিবর্তন’ সম্পর্কে জাকির নায়েকের বক্তব্যগুলো ভিডিও লেকচার থেকে প্রথমে লিখিতরূপ প্রদান করেন TH Huxley নামের এক ব্লগ লেখক ‘www.islam.com’ নামের ওয়েব সাইটে। ‘Dr. Zakir Naik: The Rising Star of Incompetent Muslim Science’ শিরোনামের তাঁর ঐ লেখায় ডা. নায়েকের বক্তৃতা থেকে তিনি ২৭টি পয়েন্ট চিহ্নিত করেন। লেখাটির ওয়েব ঠিকানা : <http://www.islam.com/reply.asp?id=381583&ct=2&mn=381583>। TH Huxley-এর ইংরেজিতে ঐ লেখা থেকে আমি প্রভূত সাহায্য নিয়েছি। এই লেখার অনেক কিছুই এখানে ছবুছ অনুবাদ করা হয়েছে। টি.এইচ.হাস্সলি’র যুক্তিগুলো নির্ভরযোগ্য রেফারেন্সের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সংযোজন-বিস্তারনের মাধ্যমে আমি ২৮টি মিথ্যা চিহ্নিত করেছি। নীচে ইংরেজি ক্যাপিটাল অক্ষরের লেখাগুলো জাকির নায়েকের বক্তব্য।

এবার এক এক করে জাকির নায়েক বর্ণিত মিথ্যা/ভুলগুলো তুলে ধরা হল :

“THE ORIGIN OF SPECIES’ - IT SAYS THAT... “CHARLES DARWIN WENT ON AN ISLAND BY THE NAME OF ‘CALOTROPIS’ ON A SHIP NAMED AS ‘HMS BEAGEL AND THERE HE FOUND BIRDS PECKING AT NICHES.”

১. জাকির নায়েক তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন এভাবে : “আপনারা যদি ডারউইনের ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ বইটি পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন সেখানে বলা

আছে...”—তার মানে তিনি নিশ্চয়ই এই বইটা পড়েছেন? কিন্তু, চার্লস ডারউইন তো কখনোই ‘CALOTROPIS’ নামের কোনো দ্বীপে যাননি। ডারউইন বিগল জাহাজে করে ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর রওয়ানা হয়ে পাঁচ সমুদ্র তেরো দ্বীপ ভ্রমণ করে ২ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে পুনরায় দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের ভ্রমণে তিনি প্রথমে উত্তর আটলান্টিকের ক্যানারি ও কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ হয়ে ব্রাজিলের স্যালভেডর উপকূলে পৌঁছেছিলেন। তারপর দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বতীরে রিওদেজেনেরো, মন্টেভিও, বোনোস এরিস বন্দরগুলি, দক্ষিণ আর্জেন্টিনার উপকূলের বিভিন্ন স্থানে, ফকল্যান্ড দ্বীপ ইত্যাদি স্থানে কয়েকবার উত্তর-দক্ষিণে ঘোরাঘুরির পর, আমেরিকার দক্ষিণতমপ্রান্ত কেপ হর্ন ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছেন। এখানে চিলি অঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ শেষে পেরুর লিমা বন্দরে নামেন। এরপর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রথমে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ হয়ে টাহিটি ও টঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ ছুঁয়ে উত্তর নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বন্দরে পৌঁছেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল পরিভ্রমণের সময় সিডনি, টাসমানিয়ার হোর্বাট, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা ছুঁয়ে ভারত মহাসাগরে আসেন। এই সাগরের কোকস ও রিইউনিয়ান দ্বীপ দুটি ছুঁয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান বন্দরে আসেন। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে, শেষে আবার আটলান্টিকে ফিরে আসেন। এখানে সেন্ট হেলেনা দ্বীপ এবং অ্যাসনসন দ্বীপ দেখে আরেবার ব্রাজিলের স্যালভেডরে নোঙর ফেলেন। এখান থেকে ইংল্যান্ডের পথে আরেকবার ক্যানারি দ্বীপ ও সেই সঙ্গে অ্যাজেরস দ্বীপ দেখে পাঁচ বছরের পরিভ্রমণ ইতি টানতে প্লিমাথ বন্দরে শেষ নোঙরটি ফেলেন। বিগল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্‌রয় সরকারি কাজের অঙ্গ হিসেবে ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ লিখে রেখেছিলেন। এই বিবরণ থেকে বিগলের পৃথিবী পরিভ্রমণের ভৌগলিক পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি ‘প্রকৃতিবিদ’ ডারউইন-ও এই যাত্রার ঘটনাপঞ্জির বিশদ রোজনামাচা নিয়মিত লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দেশে ফিরে আসার কয়েক বছর পর ১৮৩৯ সালে বিগল জাহাজের ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই *Journal of the Researches of the Voyage of H. M. S. Beagle*। ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্‌রয় কিংবা ডারউইনের বর্ণনার কোথাও এই ‘CALOTROPIS’ দ্বীপের নাম-গন্ধ নেই। সারা পৃথিবীতেও ‘CALOTROPIS’ নামের কোন দ্বীপ আছে কিনা সন্দেহ? এটা মনে হয় জাকিরের Slip of the tongue? উদ্ভিদের একটা গণের (genus) নাম calotropis। জাকির সম্ভবত এখানে ‘গ্যালাপাগোস’ (Galapagos) দ্বীপপুঞ্জের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।^১ ইকুয়েডর থেকে প্রায় ৬০০ মাইল পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট-বড় তেরটি দ্বীপ মিলে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। এই ১৩টি দ্বীপের মধ্যেও কোনোটিরই নাম Calotropis নয়। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপের নাম হল : নারবরো (Narborough, আরেক নাম Fernandina) চ্যাথাম (Chatham, আরেক নাম San Cristóbal), চার্লস (Charles, আরেক নাম Santa María বা Floreana), আলবার্মলে (Albemarle, আরেক নাম Isabela), জেমস (James, আরেক নাম San

Salvador বা Santiago), ইনডেফেটিগেবল (Indefatigable, আরেক নাম Santa Cruz)। ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি বিগল জাহাজে করে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের চ্যাথাম দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেন। সবগুলো দ্বীপে তিনি নামেননি, সময় স্বল্পতার কারণে চারটি দ্বীপ ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলো হল : চ্যাথাম, চার্লস, জেমস এবং আলবার্মলে দ্বীপ। এই দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ডারউইন তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; এখান থেকেই তাঁর মনে প্রথম ‘জীবজগতে বিবর্তন ও প্রজাতির উৎপত্তি’র বীজ রোপিত হয়। তাই বিবর্তন তত্ত্ব এবং ডারউইনের নামের সাথে ‘গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের’ নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

২. ‘পেকিং অ্যাট নিশেস’ বলতে জাকির ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অর্থবোধক নয়। ইংরেজি Peck শব্দের অর্থ ঠোঁক দেয়া। এখানে NICHES বলতে ‘ইকোলজিক্যাল নিশ’ তথা বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশকে নিশ্চয়ই বোঝানো হচ্ছে।^২ পরিবেশকে কীভাবে ঠোঁক দেওয়া যায়? আপাতত মনে হচ্ছে এখানে pecking এর বদলে living হবে। অর্থাৎ পাখিরা বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করে। আমার মতে তিনি সম্ভবত এরকম কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন : “Darwin did spend several years sailing around the entire world as ship’s naturalist in the HMS Beagle. One of his stops were the Galapagos Islands, where he found a number of finches (birds) that LIVED (not “pecked”) in different ecological niches.”

“... DEPENDING UPON THE ECOLOGICAL NICHES THEY PECK, THE BEAKS KEPT ON BECOMING LONG AND SHORT. THIS OBSERVATION WAS MADE IN THE SAME SPECIES - NOT IN DIFFERENT SPECIES...”

৩. একে তো ডা. নায়ক দ্বীপের নাম ঠিক বলেননি এবং পাখির নামও উচ্চারণ করেননি, তার উপর গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে ডারউইনের সংগৃহীত এবং পর্যবেক্ষণ করা পাখিগুলোকে ‘একই প্রজাতির’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ডারউইন

* জীববিজ্ঞানে যৌনপ্রজননশীল জীবের মধ্যে ‘প্রজাতি’ (species) বলতে আর্নেস্ট মায়ার (Ernst Mayr) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই এখন মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য। আর্নেস্ট মায়ারের মতে—‘প্রজাতি হচ্ছে এমন একটি প্রাকৃতিক জননপুঞ্জ, যার সদস্যগণ বাস্তুতে নিজেদের মধ্যে অবাধ জননরত অথবা জনন করার ক্ষমতা রাখে, যাদের আছে একটি সাধারণ জিন ভাণ্ডার (gene pool) এবং অনুরূপ অন্যান্য দল থেকে তারা যৌনজননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন।’ আর বিবর্তনের আলোকে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উৎপত্তির মূল কথা হচ্ছে, একটি জনপুঞ্জ ভেঙে একাধিক জনপুঞ্জের উৎপত্তি বা একটি ‘সাধারণ’ জিনভাণ্ডার ভেঙে একাধিক জিনভাণ্ডারের উৎপত্তি, যাদের মধ্যে অবাধে জনন হয় না বা জিনের আদান-প্রদান চলে না। (দ্রষ্টব্য : ম. আখতারজ্জামান, *বিবর্তনবিদ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৫৯)।—সম্পাদক।

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ হতে প্রাণীদের মধ্যে তিন প্রজাতির কচ্ছপের বাচ্চা, ডিম, ১৬ প্রজাতির শামুক, সম্পূর্ণ নতুন ১৫ প্রজাতির মাছ, সামুদ্রিক সরীসৃপ ইণ্ডিয়ানা, খেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুড়, সীল, পেঙ্গুইনসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি ডারউইন নিজে মোট ২৬ প্রজাতির প্রচুর পাখি ধরতে সক্ষম হন। পাখিগুলোর মধ্যে ছিল চিল, পঁচা, কবুতর, রেন (Wren), ফ্লাইকেচার, থ্রাশ (Thrush), ফ্লেমিংগো, ফিঞ্চ (Finch) প্রজাতির পাখি। নায়ক বোধহয় ‘পাখি’ বলতে গ্যালাপাগোস দ্বীপের চডুই পাখির মত দেখতে ফিঞ্চ বা ফিঙ্গে পাখির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন^১; কারণ বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় এই পাখিগুলোকে পরে ‘ডারউইনের ফিঙ্গে’ নাম দেওয়া হয়েছে। গ্যালাপাগোস দ্বীপে ফিঙ্গে পাখির ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ডারউইন চারটি ভিন্ন গণের (Genus) ১৩টি প্রজাতি দেখেছেন, যেমন : *Geospiza magnirostris*, *G. fortis*, *G. fuliginosa*, *G. nebulosa* (পূর্বে *difficilis*), *G. scandens*, *G. conirostris*, *Platyspiza crassirostris*, *Camarhynchus psittacula*, *C. pauper*, *C. parvulus*, *C. pallidus*, *C. heliobates*, *Certhidea olivacea*। পরবর্তীতে বাকি একটি প্রজাতি (*Pinaroloxias inornata*) পাওয়া গিয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকের চারশ মাইল দূরের কোকস (Cocos) দ্বীপ হতে; এটি ডারউইন দেখতে পাননি এবং সংগ্রহও করেননি। এটা ঠিক, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঙ্গে পাখিগুলো দেখার সময় ডারউইন বুঝতে পারেননি যে এগুলো ‘একই পাখির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি’। সেটা বোঝার কোনো উপায়ও ছিল না; কারণ ফিঙ্গে পাখিগুলোর দেহের গঠন, রং (বাদামি অথবা কালো), পালকের বৈশিষ্ট্যে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পার্থক্য পাখিগুলোর খাদ্যের প্রকৃতিভেদে ঠোঁটের আকার এবং দৈর্ঘ্যের মধ্যে। ডারউইন বিগল জাহাজের ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পক্ষী-বিশারদ (Ornithologist) John Gould-এর সহায়তায় ফিঙ্গে পাখিগুলোর নমুনা পরীক্ষা করে ‘ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি’র বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন।^২ ডা. নায়ক আরও একটি ভুল কথা বলেছেন। একই প্রজাতির পাখির মধ্যে beak তথা ঠোঁটের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হিসেব করা গণনার মধ্যে আসে না। এই পার্থক্যটা হিসেব করা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রেই আসে। ‘একই প্রজাতির ফিঙ্গে পাখির একটার ঠোঁট ছোট আর অন্যটার বড় কেন’—ডারউইন না-কী এই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন! এসব কথা শুনলে ডারউইন নির্খাত স্ট্রোক করতেন!

^১ বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে পাখির উপর পরিচালিত গবেষণা সম্পর্কে জানতে দেখুন : Frank Sulloway, Darwin’s Finches: Evolution of a Legend, *Journal of the History of Biology*, 15, 1982, Available at www.sulloway.org/Finches.pdf। — সম্পাদক।

৪. ভিন্ন প্রজাতির বিষয়টা গেল। প্রজাতিগুলোর মধ্যে ঠোঁটের দৈর্ঘ্য ছাড়াও আরও কিছু পার্থক্য ছিল, যেমন সঙ্গীর সাথে ব্যবহার, গান এবং খাদ্যাভ্যাস। এগুলো এতই পৃথক ছিল যে ডারউইন দ্বীপে থাকার সময় বুঝতেই পারেননি, এরা সবাই ফিঙ্গে পাখি।

“CHARLES DARWIN WROTE A LETTER TO HIS FRIEND THOMAS THOMTAN, IN 1861 SAYING ‘I DO NOT BELIEVE IN ‘NATURAL SELECTION’- THE WORD THAT YOU USE - I DON’T BELIEVE IN ‘THEORY OF EVOLUTION’ BECAUSE I HAVEN’T GOT ANY PROOF. I ONLY BELIEVE IN IT BECAUSE IT HELPS ME IN CLASSIFICATION OF EMBRYOLOGY, IN MORPHOLOGY, IN RUDIMENTARY ORGANS.”

৫. THOMAS THOMTAN কে? জাকির নায়ক বলছেন, ‘ডারউইনের বন্ধু’। এই নামে ডারউইন সম্পর্কিত বইপত্র, সায়েন্স ম্যাগাজিন, ইন্টারনেটে গুগল সার্চ করে কাউকে পাওয়া গেল না। অবশেষে ‘*The Correspondence of Charles Darwin*’ নামক ওয়েব সাইটের (www.darwinproject.ac.uk) স্মরণাপন্ন হতে হল। এখানে ১৮২১ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ডারউইনের সব লেখা স্থান পেয়েছে। চিঠি, ডায়ারি, আত্মজীবনী সব ঘেটেও এই নামে কাউকে পাওয়া গেল না। তবে টমাস থমসন (১৮১৭-৭৮) নামে সে সময়ের একজনকে পাওয়া গেছে।^৩ ডারউইন কখনই থমসনকে চিঠি লিখেননি। জানা যায় থমসন একদা ডারউইনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যা হারিয়ে গেছে। তাই চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই হারিয়ে যাওয়া চিঠি সম্পর্কে আমরা শুধু জানতে পারি উদ্ভিদ-শ্রেণীবদ্ধন পদ্ধতি (বেহাম-হুকার)-এর আবিষ্কারক ডারউইনের বন্ধু জোসেফ ডাল্টন হুকার^৪ (১৮১৭-১৯১১) ডারউইনের কাছে লেখা এক চিঠিতে থমসনের পাঠানো চিঠির কথা উল্লেখ করেছিলেন। অর্থাৎ ডারউইন ও হুকার পরস্পরকে যেসব চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে কয়েকটিতে কেবল থমসনের নাম এসেছে। জাকিরের বক্তব্য শুনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উদিত হয়, ডারউইন তাঁর ক্ল্যাসিক বই ‘*অরিজিন অব স্পিসিজ*’ প্রকাশের দুই বছর পর বলছেন, ‘বিবর্তন সম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ পাননি’—এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-সুহৃদ চার্লস লায়েল, টমাস হার্বলি, আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, প্রফেসর হেনড্রো, ডাল্টন হুকারের মত ব্যক্তিদের কাউকে কিছু না বলে ‘অখ্যাত-অপরিচিত’ টমাস থমসনকে এ কথা বলেছেন, কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

৬. নায়ক বলেছেন, ‘ডারউইনের ঐ চিঠি ১৮৬১ সালে লেখা’। অর্থাৎ ‘*অরিজিন অব স্পিসিজ*’ প্রকাশের (১৮৫৯) দুই বছর পর এই চিঠি লেখা হয়েছে। এখানেও কন্ট্রাডিকশন এসে যাচ্ছে। ডারউইন তাঁর বই প্রকাশের দুই বছর পর কখনই বলতে পারেন না, “I haven’t got any proof.” কারণ তাঁর এই বই ‘বিবর্তনের প্রমাণ’

জোগাডের কাজটাই করেছে। ১৮৩৮ সালের অক্টোবরে নেহাত কৌতূহল বশে যখন আরেক ইংরেজ মনীষী টমাস হেনরি ম্যালথাসের *An Essay on the Principle of Population* (১৭৯৮ সালে প্রকাশিত) পুস্তিকাটি পাঠ করছিলেন, সেখান থেকে ডারউইন প্রথম তাঁর তত্ত্ব ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’-এর সূত্র খুঁজে পান। এরপর দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কেবল বিবর্তনের প্রমাণ জোগাড় করে গেছেন, বই প্রকাশ করেননি। তিনি চাচ্ছিলেন বই প্রকাশের আগে সবকিছু সাজিয়ে নিতে, যাতে বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি ‘fact of evolution’ তথা প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাখ্যার জন্য একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। বই প্রকাশের পর অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন জীবজগতে, প্রকৃতিতে বিবর্তন আসলেই ঘটেছে এবং ডারউইন তাঁর বইয়ের মাধ্যমে সেটা দেখাতে সফল হয়েছেন। কিন্তু এই বিবর্তন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি যে ‘তত্ত্ব’ উপস্থাপন করেছেন সেটা অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই (এমন কী ডারউইনের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও) প্রথম দিকে গ্রহণ করেননি।

“CHARLES DARWIN HIMSELF SAID THAT, THERE WERE MISSING LINKS. HE DID NOT AGREE WITH IT - HE HIMSELF SAID THAT THERE WERE MISSING LINKS.”

৭. ‘মিসিং লিংক’ যদিও কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। তারপরও এই পরিভাষার বহুল ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। যাহোক, ডারউইনের সময় ‘মিসিং লিংক’ অবশ্যই ছিল। কিন্তু এই ‘মিসিং লিংক’গুলো সম্পূর্ণ খুঁজে না পাওয়ার কারণে ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব অস্বীকার করেননি। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহও পোষণ করেননি। ডারউইনের সময়, মানুষের পূর্বপুরুষের অনেক ফসিল আবিষ্কৃত হয়নি। তখন অনেকেই ডারউইনকে বিরক্ত করত এই বলে, ‘কোথায় তোমার missing link? কোথায় তোমার জীবাশ্ম-প্রমাণ, যা প্রমাণ করবে বানর বা উল্লুক মানুষের উৎস প্রজাতি?’ তিনি উত্তর দিতেন, হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির জীবাশ্মের নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না; তবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আফ্রিকায় মানুষের ‘মিসিং লিংক’ পাওয়া যাবে; এবং আমরা জানি পরবর্তীতে আফ্রিকা থেকেই মানুষের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বিবর্তন তত্ত্বকে আরও জোড়ালো করেছে।

“THE REASON IS BECAUSE, THAT IF YOU ANALYSE, THE CHURCH... THE CHURCH WAS AGAINST SCIENCE PREVIOUSLY - AND YOU KNOW THE INCIDENCE THAT THEY SENTENCED GALILEO TO DEATH.”

৮. জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)-কে ‘কপারনিকাসের মহাবিশ্বের সৌরজগতীয় মডেল’ সমর্থন জ্ঞাপন এবং ঐ তত্ত্বের পক্ষে প্রচারবিধানের কারণে খ্রিস্ট পুরোহিতরা ‘বাইবেলের সৃষ্টিবাদ’ অস্বীকারের অভিযোগ তুলে আঙুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। কিন্তু গ্যালিলিওকে চার্চ মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। ১৬৩৩ সালের ২২ জুন তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। আট বছর পরে ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

“THEY SENTENCED GALILEO TO DEATH - WHY? BECAUSE HE SAID CERTAIN STATEMENTS IN THE ASTRONOMY, ETC., WHICH WENT AGAINST THE BIBLE - SO THEY SENTENCED HIM TO DEATH, FOR WHICH THE POPE APOLOGIZED NOW. SO WHEN CHARLES DARWIN CAME UP WITH A THEORY WHICH GOES AGAINST THE BIBLE, THEY DID NOT... THEY DID NOT WANT ANY SUFFICIENT PROOF—AN ENEMY OF MY ENEMY IS MY FRIEND. SO ALL THE SCIENTISTS... MOST OF THEM - THEY SUPPORTED THE THEORY, BECAUSE IT WENT AGAINST THE BIBLE - NOT BECAUSE IT WAS TRUE.”

৯. সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বানোয়াট কথা জাকির নায়েক এখানে বলেছেন। ডারউইন-যুগের (সম্ভবত একমাত্র টমাস হার্সলি ছাড়া) কোন বিজ্ঞানীই বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য ডারউইনের তত্ত্বকে মেনে নেননি। ডারউইনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ‘বইটি প্রকাশের দু’সপ্তাহের মধ্যে ডাউন গ্রামের ডারউইনের বাসার ঠিকানায় চিঠির ঢল নামে। সবই বিরূপ মন্তব্য। উদ্দিগ্ন ডারউইন তাঁর পুরানো বন্ধু ও অগ্রজ বিজ্ঞানীদের দেখা করেন সমর্থনের আশায়। কিন্তু না। আশায় গুড়েবালি। ডারউইনের অত্যন্ত কাছের লোক হিসেবে পরিচিত চার্লস লয়েল, বিগল জাহাজে ভ্রমণের সময় যার বই *Principle of Geology* পাঠ ভূত্বকের পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেনস্লো, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক অ্যাডাম সেজউইক, ডাল্টন হুকার কেউই ডারউইনের পক্ষে এগিয়ে আসেননি। রক্ষণশীল অধ্যাপক অ্যাডাম সেজউইক তাঁকে জানান, তিনি এই বই পড়ে দারুণ মর্মান্বিত হয়েছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রত্নজীববিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ রিচার্ড ওয়েন তো ডারউইনের সঙ্গে রীতিমতো শত্রুতা শুরু করেন। বিগল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিট্‌সুরয় ডারউইনকে ‘কেউটে সাপ’ বলে গালি দেন, জাহাজে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে ডারউইনকে নিয়োগ দেওয়ার পাপ স্বলনের জন্য বিনামূল্যে বাইবেল বিলি শুরু করেন; এবং পরবর্তীতে তিনি ‘পাপের ভার’ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক লুই আগাসি বোস্টন প্রকৃতিবিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে ‘দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত হলেও আসলে ভ্রান্ত’ বলে নাকচ করে দেন। জার্মানি ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মহলে ডারউইনবাদ আলোচনার অযোগ্য ঘোষিত হয়।’ (দ্রষ্টব্য : দ্বিজেন শর্মা, *চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৫-২৬)। ঐ সময়ের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই ধার্মিক ছিলেন এবং চার্চকে ভুলেও নিজেদের শত্রু মনে করতেন না। কিন্তু প্রকৃতিতে যে বিবর্তন আসলেই ঘটেছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ ছিল না।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে বিবর্তন তত্ত্ব পড়ানোর যে কারণ জাকির নায়েক বলেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বানোয়াট। ডারউইনের বই নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখক ‘রিভিউ’ করেছেন। আগেই বলেছি, তাদের অধিকাংশই সেসময় ধার্মিক ছিলেন। সুতরাং চার্চের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এমন কিছু তারা কখনোই পাঠ্যপুস্তকে যোগ করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তা পাঠ্যপুস্তকে যোগ করা হয়েছে, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে আর কোনো সন্দেহই অবশিষ্ট ছিল না। পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তন তত্ত্ব তুলে দেওয়া আর নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব উঠিয়ে দেওয়া একই কথা। দুটোর পক্ষেই এখন সমান প্রমাণ আছে। তাছাড়া আজ পর্যন্ত জাকির নায়েক বর্ণিত এ ধরনের ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্বের’ কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। কারো কোনো রিভিউ থেকে বোঝা যায়নি যে, তিনি চার্চের বিরোধিতা করার জন্যই বিবর্তনতত্ত্বের সমর্থন করছেন। বরং উল্টোটাই সত্য বলা যায়। অর্থাৎ যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্র করে পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তন তত্ত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের কথাই বলা যায়। একসময় এদেশের উচ্চ মাধ্যমিকের জীববিজ্ঞানে ‘বিবর্তন তত্ত্ব’ পড়ানো হতো। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য ইশারায় একসময় তা তুলে দেয়া হয়। বিবর্তন তত্ত্বের বদলে জীববিজ্ঞান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় ‘জৈব প্রযুক্তি’। এটা সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্র।

“ALL THE STAGES ... ‘LUCY’ - THERE WERE FOUR ‘HOMONITES’. SCIENCE TELLS US TODAY THAT THERE WERE FOUR ‘HOMONITES’—FIRST IS ‘LUCY’ ALONG WITH ITS GUY ‘DOSNOPYTICHEST’, WHICH DIED ABOUT 3 AND A 1/2 MILLION YEARS—THE ICE AGE. THEN NEXT CAME THE ‘HOMOSEPIANS’, WHO DIED ABOUT 5 HUNDRED THOUSAND YEARS AGO. THEN CAME THE ‘NEANDERTHAL MAN’, WHO DIED HUNDRED TO FORTY THOUSAND YEARS AGO. THEN CAME THE FOURTH STAGE, ‘THE CRO-MAGNON.’”

১০. ‘হোমোনাইট’ বা ‘হোমোনাইড’ বলে কিছু নেই। প্রকৃত শব্দ ‘হোমিনিড’ (Hominid)। হোমিনিড হচ্ছে, Hominidae বা এপ বা বনমানুষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (অধুনালুপ্ত অথবা বর্তমানে জীবিত) কোন সদস্য (মানুষসহ শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং)। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, জাকির বিবর্তন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আর বারে বারে ‘Slip of the tongue’ ঘটে চলছে। তাঁর পক্ষে সঠিক শব্দ জানাটাই বিস্ময়কর।

১১. জাকির নায়েক যেভাবে ‘সাধারণীকরণ’ (Generalization) করে ‘সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে’ মানব-বিবর্তনের কথা বলছেন, ‘প্রথমে লুসি, এরপর হোমোস্যাপিয়েন্স, এরপর নিয়াভার্থাল এবং শেষে ক্রো-ম্যাগনন’—বাস্তবে কিন্তু মোটেই সেরকম নয়। তিনি বলেছেন, ‘মানুষের বিবর্তনের চারটি ধাপের (stage) কথা বলা হয়েছে।’ এটা

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বিবর্তনের কোনো পাঠ্যবইয়েই মানুষের বিবর্তনের চারটি ধাপের কথা উল্লেখ নেই। মানুষেরা যে গণের অন্তর্ভুক্ত, সেই ‘Homo’ গণের (Genus) অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো স্বতন্ত্র প্রজাতির (যেমন : *Homo habilis*, *Homo ergaster*, *Homo antecessor*, *Homo heidelbergensis*, *Homo neanderthalensis*, *Homo floresiensis*, *Homo sapiens* ইত্যাদি) কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন এবং এই স্বতন্ত্র প্রজাতিগুলির মধ্যে আমরাও একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি, বর্তমানে যারা একমাত্র পৃথিবীতে টিকে রয়েছে। আজ থেকে (সম্ভাব্য) ২৩-২৪ লক্ষ বছর আগে ‘*Australopithecus*’ গণ থেকে ‘Homo’ গণের উদ্ভব ঘটেছে। ‘*Australopithecus*’ গণের প্রাপ্ত ফসিল গবেষণা করে ধারণা করা হয় এদের কমপক্ষে চারটি প্রজাতি ছিল, যথা : *Australopithecus afarensis*, *A. africanus*, *A. boisei*, *A. robustus*; এছাড়া আরো দুটি প্রজাতি *A. aethiopicus* ও *A. crassidens* আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। ‘*Australopithecus*’ গণের কোনো এক প্রজাতি আধুনিক মানুষের ‘Homo’ গণের উৎস। সম্ভবত *Australopithecus afarensis* বা *Australopithecus africanus* কিংবা অন্য দুটি থেকেও হতে পারে। সঠিক পরম্পরা এখনো জানা যায়নি; গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ‘*Australopithecus*’ গণের পূর্বের গণ ‘*Ardipithecus*’। *Ardipithecus* গণের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রজাতি *Ardipithecus kadabba*, *Ardipithecus ramidus*। *Ardipithecus* গণের পূর্বপুরুষের ইতিহাসও বিজ্ঞানীদের কাছে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে আসছে। মানব-বিবর্তন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে বাঞ্ছনীয় নয়।

১২. DOSNOPYTICHEST নামে কোন হোমিনিড নেই। লুসি যে হোমিনিডের অন্তর্ভুক্ত তার নাম *Australopithecus afarensis*।

১৩. Ice age বা বরফ যুগ মোটেই সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর আগের ঘটনা নয়। ১.৬ মিলিয়ন বা ১৬ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে শুরু করে দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত বরফ যুগ ছিল।

১৪. জাকিরের ভাষ্য মতে ‘হোমো স্যাপিয়েন্স ৫০০ হাজার বছর আগে মারা গেছে।’ হোমো স্যাপিয়েন্স তো আমরা, বর্তমান পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষেরা, আমরা তো এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি। মারা গেলাম কবে?

১৫. নিয়াভার্থালরা ‘Homo’ গণের অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র একটি প্রজাতি (*Homo neanderthalensis*)। আমরা মানুষেরা একই গণের আরেকটি স্বতন্ত্র প্রজাতি (*Homo sapiens*)। নিয়াভার্থালরা সরাসরি আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ নয়। সর্বশেষ বরফ যুগের প্রথম দিকে এরা ইউরোপে বাস করত; তাদের সর্বোচ্চ বিস্তারের সময় এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উজবেকিস্তানেও বাস করত বলে ধারণা করা হয়। এদের মস্তিষ্কের আকার (প্রায় ১৪৫০ সিসি) আমাদের সে সময়কার পূর্বপুরুষদের তুলনায়ও বড় ছিল। ৩৫ হাজার বছর আগে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর জাকির নায়েক বলছেন,

‘নিয়াডার্থালরা মানুষের উৎপত্তির একটি ধাপ এবং তারা ১০০ থেকে ৪০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে।’

১৬. ক্রো-ম্যাগনন আলাদা কোনো প্রজাতি নয়; কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও ক্রোম্যাগননের প্রাণু জীবাশ্মের গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এরা আধুনিক মানুষ ‘হোমো স্যাপিয়েন্স’। ইউরোপের উচ্চ প্যালিওলিথিক অঞ্চলের হোমো স্যাপিয়েন্সদেরকে ক্রো-ম্যাগনন নামে ডাকা হয়।

“THERE IS NO LINK AT ALL BETWEEN THESE STAGES”

১৭. হোমিনিডদের মধ্যে অনেক লিংক আছে। *Australopithecus afarensis* এবং *Homo sapiens*-এর মধ্যেও কয়েকটি লিংক আছে, যেমন : *Homo habilis*, *Homo ergaster*, *Homo heidelbergensis* ইত্যাদি।

“ACCORDING TO P. P. GRASSE IN 1971 WHO HELD THE CHAIR OF EVOLUTIONARY STUDIES IN PARIS, IN SOJERION UNIVERSITY, HE SAID... ‘IT IS ABSURD - WE CANNOT SAY WHO WERE OUR ANCESTORS BASED ON FOSSILS.’”

১৮. P. P. GRASSE-এর পরিচয় দিতে গিয়ে জাকির নায়েক ভুল করেছেন। প্যারিসে SOJERION UNIVERSITY নামে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সমগ্র বিশ্বের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ? তিনি হয়তো বলতে চেয়েছিলেন ‘University of Paris’-এর কথা, যাকে অনেক সময় ‘La Sorbonne’ নামে ডাকা হয়।

Pierre-Paul Grasse প্রাণীবিজ্ঞানী, এবং ফ্রান্সের ‘Academie des Sciences’-এর প্রেসিডেন্টেরও দায়িত্ব পালন করেন কিছুকাল।^৬ একসময় তিনি ছিলেন নব্য-ল্যামার্কবাদী, পরে মিউটেশনিস্ট। বিবর্তন তত্ত্বের ইতিহাস হতে জানি, ডারউইনের সময় বংশগতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। ডারউইনের তত্ত্ব জীবের প্রজন্মান্তরে সঞ্চারশীল পরিবর্তনের (Heritable Change) কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বংশগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি তিনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এক সংকটের সম্মুখীন হয়। বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব (The Modern Synthesis Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠার হওয়ার আগ পর্যন্ত চার্লস ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ তত্ত্বের সাথে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের ‘বংশগতি তত্ত্বের’ সম্মিলন সেভাবে ঘটেনি। ওই সময় জীববৈচিত্র্য, প্রজন্মান্তরে সঞ্চারশীল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, এবং প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ‘বিকল্প’ হিসেবে বিভিন্ন অনুকল্প হাজির হয়, যেমন নব্য-ল্যামার্কবাদ, অর্থোজেনেসিস (Orthogenesis), উল্লফন (Saltation) বা মিউটেশনিস্ট অনুকল্প ইত্যাদি। নব্য-ল্যামার্কবাদীরা মনে করতেন ‘পরিবেশের প্রভাবে জার্মপ্লাজমে (জননকোষ) পরিবর্তন ঘটা সম্ভব এবং এরূপ পরিবর্তন বংশানুসৃত হয়ে থাকে। ফলে

পরিবেশের প্রভাবে বিবর্তন ঘটতে পারে।’ নব্য ল্যামার্কবাদকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে রাশিয়ায় ‘লিসেস্কোইজম’ (Trofim Denisovich Lysenko-এর মতবাদ)-এর মত অপবিজ্ঞানের জন্ম হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে জন্ম নেয় আরেক কলঙ্কজনক অধ্যায়। লিসেস্কো সোভিয়েত ইউনিয়নে মেন্ডেল-মরগানের বংশগতিবিদ্যা, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে ‘বুর্জোয়া’ ঘোষণা করে এই তত্ত্বের চর্চা নিষিদ্ধ করে দেন। লিসেস্কোর মতের সমর্থক নয় এমন অনেক বিজ্ঞানীই চাকুরিচ্যুত হন। কেউ কেউ গ্রেফতার হন, নানাভাবে নির্যাতিত হন। এন. আই ভেভিলভের মত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে বন্দি করে জেলে ঢোকানো হয়, সেখানে তিনি মারা যান। লিসেস্কোর দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট শাসিত রাশিয়ায় মার্কসবাদ-লেলিনবাদের সাথে মিলে যায় বলে, স্তালিনের সময়কালে সরকারি সহযোগিতায় লিসেস্কো তাঁর অপকীর্তি চালু রাখেন। এতে বিজ্ঞানের কোনো লাভ হয়নি, কিংবা রাশিয়ায়ও বিবর্তন তত্ত্বের কোন উন্নয়ন ঘটেনি; বরং বিজ্ঞানকে কোন রাজনৈতিক দল বা কোন দর্শনের সাথে জোর করে মেলাতে চাইলে কিরূপ বিয়োগান্ত পরিণতি তৈরি হতে পারে, তার উদাহরণ হচ্ছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে লিসেস্কোবাদের বিপর্যয় থেকে। অর্থোজেনেসিস অনুকল্প মতে, ‘বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে সরল রেখায়। জীবের ভেতরে অবস্থিত কোন শক্তি বিবর্তন প্রক্রিয়াকে সরল রেখায় চালনা করে।’ এমন কী, ‘প্রজাতির মধ্যে প্রকারণ বা ভ্যারিয়েশনের উৎপত্তি random নয়; এগুলোর নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। জীবের ভেতরে যে শক্তি ভ্যারিয়েশন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, সে শক্তিই এ লক্ষ্য স্থির করে দেয়। তাই এতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোন হাত নেই।’ আর উল্লফন বা মিউটেশনিস্ট মতানুসারে, ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন একদম গৌণ একটি বিষয়, মিউটেশনই বিবর্তনের মূল ফ্যাক্টর।’ মিউটেশনিস্টরা বিশ্বাস করতেন, ‘ভ্যারিয়েশন তথা প্রজাতির উৎপত্তি হয় হঠাৎ হঠাৎ, লাফিয়ে, লাফিয়ে, বৃহৎ আকারে, কোনরূপ পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত, কোনরূপ অন্তরবর্তী পর্যায় না রেখে। প্রজাতির উদ্ভবের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বা অবিচ্ছিন্নতা (Continuity) নেই।’ যা ডারউইনের স্পষ্টই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বিপরীত। Pierre-Paul Grasse ছিলেন সম্ভবত এই মিউটেশনিস্ট মতাবলম্বী। কিন্তু বর্তমানকালের জীববিজ্ঞানীরা জানেন, এদের ধারণা-মতবাদগুলো ভুল ছিল। চল্লিশের দশকে জনপুঞ্জ বংশগতিবিদ্যার (Population Genetics) অভ্যুদয়ের পর ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে মেন্ডেল-মরগানের বংশগতির সম্মিলন ঘটে। জনপুঞ্জে জিন কিভাবে বংশানুসৃত হয় তা ব্যাখ্যা করেছিলেন ইংরেজ গণিতবিদ জি. এইচ. হার্ডি (G. H. Hardy) ও জার্মান চিকিৎসক ভিলহেল্ম ওয়েনবার্গ (Wilhelm Weinberg)। পরিসংখ্যানবিদ ইউল (G. Udny Yule) দেখিয়েছিলেন, ডারউইনের ‘অবিচ্ছিন্ন প্রকারণের’ (Continuous Variation) সাথে মেন্ডেলের বংশগতির সম্পর্ক রয়েছে, পরিসংখ্যান দিয়ে তা প্রমাণ করা যায়। সুইডিশ জীববিদ নিলসন-এল (H. Nielson-Ehl) ইউলের প্রকল্পকে প্রমাণ করেছিলেন। এরপর আরো অনেক বিজ্ঞানীর বিরামহীন গবেষণা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা এড়িয়ে গিয়ে প্রবন্ধের পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে খুব সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায়, ১৯৩৭ সালে থিওডোসিয়াস ডবলানস্কির

‘Genetics and the Origin of Species’ গ্রন্থ প্রকাশের পর ধীরে ধীরে বংশগতিবিদ্যার সঙ্গে বিবর্তন তত্ত্বের, বিশেষত ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব’র সমন্বয় ঘটে। ডারউইন তত্ত্বের বংশগতি সংক্রান্ত অসম্পূর্ণতা দূর হয়। বিবর্তনে মিউটেশন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, পৃথকীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণের ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; জন্ম নেয় বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব।

জাকির নায়েকের লেকচার হতে দেখা যাচ্ছে, পল গ্রাসে বলেছেন ‘ফসিলের উপর নির্ভর করে আমাদের পূর্বপুরুষ কে তা নির্ধারণ করা অসম্ভব।’ ধরে নিচ্ছি এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন ১৯৭১ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ৩৮ বছর আগে এবং পল গ্রাসে কোথায় এমন কথা বলেছেন তার রেফারেন্স অবশ্য জাকির দেননি। যাহোক, সে সময় ‘মিসিং লিংক’ হিসেবে হয়তো অনেক জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি; কিন্তু গত ৩৮ বছরে অনেক-অনেক জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে। সুতরাং গ্রাসে আজ থেকে ৩৮ বছর আগে ফসিল নিয়ে কী বলেছিলেন তার আজ কোন মূল্য নেই। ঠিক যেমন, এরিস্টটল আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে পরমাণু সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার আজ কোন মূল্য নেই। সুতরাং বিবর্তনের আধুনিক জ্ঞানের বিরোধী এক ব্যক্তির আগের একটি উক্তি তুলে এনে জাকির নায়েক অসততার পরিচয় দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি আপাত অজ্ঞ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। আর একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, ‘জিন’ বলে যে একটা কিছু আছে, তা জানা গেছে মাত্র এক শতাব্দী আগে (মেডেলের আবিষ্কার সম্পর্কে জানা যায় ১৯০০ সালে) আর ডিএনএ’র গঠন আমরা বুঝতে পারলাম মাত্র আধা শতাব্দী আগে (১৯৫৩ সালে)। সে হিসেবে পল গ্রাসের সময়কালে আণবিক জীববিজ্ঞান বা বংশগতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা তো আঁতুড়ঘরেই ছিল। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই শাখাগুলি হাঁটি হাঁটি পা পা করে শৈশবকাল অতিক্রম করেছে।

জীবজগতে জীবন্ত প্রাণীসমূহের যে পর্বগুলো রয়েছে এবং ফসিলরেকর্ড অনুযায়ী অতীতে যে বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের পর্বসমূহ, বর্তমান পর্বগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং মধ্যবর্তী ফসিলসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে যৌক্তিক বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়গুলো নির্ধারিত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই (শুধুমাত্র ফসিলবিদ্যার উপর নির্ভর করে) বিবর্তনের স্পষ্ট একটি চিত্র পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারটিকে বিবর্তন-বিরোধীরা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে ‘জৈববিবর্তন তত্ত্ব অস্পষ্ট, অনির্ধারিত এবং বিভ্রান্তিকর।’ প্রকৃতপক্ষে এ সকল বিষয়ে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা জৈববিবর্তনের মূল তত্ত্বকে বোঝার ক্ষেত্রে কোন বড় বাধা নয়। (দ্রষ্টব্য : মনিরুল ইসলাম, *জৈববিবর্তনবাদ দেড়শ বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৯)। এমন কী এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। আজকের যুগে জৈববিবর্তনকে ব্যাখ্যার জন্য জীববিজ্ঞানীদের ভৃত্ত্ব বা ফসিলবিদ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় না। রিচার্ড

ডকিসের মত আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, ‘এখন কোন জীবের ডিএনএ’র মধ্যে লেখা ইতিহাস থেকেই ঐ জীবের বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা পড়ে ফেলা সম্ভব।’ জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, আণবিক জীববিজ্ঞান, কোষবংশগতিবিদ্যা, Evolutionary Developmental Biology জীববিজ্ঞানের প্রভৃতি শাখার দ্রুত অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে জৈববিবর্তনের মূল তত্ত্বকে ইতিমধ্যে বিভিন্নভাবে প্রমাণ করা গেছে। অর্থাৎ ফসিলবিদ্যার বিভিন্ন অস্পষ্টতাগুলো জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের প্রসারের ফলে পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

“SIR ALBERT GEORGIE WHO GOT THE NOBLE PRIZE FOR INVENTING... FOR INVENTING THE VITAMIN ‘C’ - HE WROTE THE BOOK ‘THE CAVE APE AND MAN’, AGAINST DARWIN’S THEORY.”

১৯. ALBERT GEORGIE নামে কোন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী নেই। জাকির নায়েক এখানে বোধহয় ভিটামিন-সি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী Albert Szent-Gyorgyi von Nagyraptol-এর কথা বলতে চেয়েছিলেন।^১

২০. ‘ভিটামিন সি’ উদ্ভাবন (invent) করা সম্ভব না। কারণ এটা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। এখানে ‘উদ্ভাবনের’ বদলে আবিষ্কার (Discover) হবে।

২১. ‘THE CAVE APE AND MAN’ নামে কোন বই নেই। Gyorgyi-এর লেখা একটি বইয়ের নাম ‘The Crazy Ape’ (১৯৭০)। নায়েক বোধহয় এই বইটার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। এই বই বিবর্তন তত্ত্বের বিপক্ষে লেখা কি-না আমি নিশ্চিত নই; তবে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এই বই সম্পর্কে বলা রয়েছে, ‘পৃথিবীতে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখা একটি নৈরাশ্যবাদী গ্রন্থ যাতে বিজ্ঞানের সমালোচনা করা হয়েছে।’ তার মানে অবশ্যই এই বই Gyorgyi কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে লিখেননি। Gyorgyi বিবর্তন তত্ত্বের সমালোচক ছিলেন এটা ঠিক। তিনি সৃষ্টিবাদের পক্ষে Syntropy^২ নামে একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধারণা মোটেই বৈজ্ঞানিক নয় এবং বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়নি। একে বরং অধিবিদ্যার (metaphysics) অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের ‘অহম’ বিষয়ক ধারণা যেমন অধিবিদ্যার অন্তর্গত, তেমনি ‘সিনট্রপি’র ধারণা অধিবিদ্যার অন্তর্গত। ফ্রয়েডের ‘অহম’ বিষয়ক ধারণাকে বর্তমানে ‘অপবিজ্ঞান’ হিসেবেই গণ্য করা হয়।

“AGAIN, SIR FRED HOYLE’S WORK - HE WROTE SEVERAL WORKS AGAINST DARWIN’S THEORY.”

২২. ফ্রেড হয়েল ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত।^৩ জীববিজ্ঞানের উপর তাঁর তেমন কোন দখল ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি যে মৌলিক অবদানটি রেখেছিলেন

তাও বর্তমানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি মহাবিশ্বের 'স্থির অবস্থা তত্ত্ব' (Steady State Theory) উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব'ই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিক। জীববিজ্ঞানে ফ্রেড হায়লের কোন মৌলিক অবদানই নেই। তিনি 'রাসায়নিক বিবর্তনের সাধারণ ধারণা' মানতেন না। তাঁর মতে 'প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে মহাশূন্যে এবং প্যানস্পার্মিয়ার মাধ্যমে ক্রমেই মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে; পৃথিবীতে রাসায়নিক বিবর্তন ঘটেছে ধূমকেতুর মাধ্যমে আগত প্রচুর ভাইরাসের মধ্যস্থতায়।'

"RUPERTS ALBERT, THIS PERSON WROTE A NEW THEORY OF EVOLUTION AGAINST DARWIN'S THEORY."

২৩. রুপার্টস আলবার্ট নামের কাউকে বইপত্র, ইন্টারনেট ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজন লোক যে কী-না ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে খণ্ডন করে বিবর্তনের উপর সম্পূর্ণ নতুন একটি তত্ত্বেরই জন্ম দিয়েছেন অথচ তাঁর কোন নাম-নিশানাই পাওয়া যাচ্ছে না? বিস্ময়কর বটে! কখনো নায়েকের সাথে দেখা হলে রেফারেন্সটা জেনে নিতে হবে।

"IT'S UNTHINKABLE...YOU CANNOT THINK THAT WE ARE CREATED FROM THE APES."

২৪. জাকিরের ভাষ্য মতে রুপার্টস আলবার্ট নামের (অজ্ঞাত) ব্যক্তি এই কথা বলেছেন। কথার মধ্যেও ভুল আছে : 'we are created from the apes'—জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা পূর্বে এপ (বনমানুষ) ছিলাম-ই না, এখনও এপ আছি। আমরা এপ, গরীলা-শিম্পাঞ্জিরাও এপ। বর্তমানে জীবিত সব এপ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, এটাই জীববিজ্ঞানীদের ভাষ্য। নায়েক কোথাকার অজ্ঞাত রুপার্টসের সূত্র ধরে বলছেন, এই ভাষ্য না-কী 'অচিন্তনীয়'!

"IF YOU KNOW OF SIR FRANK SALOSBURY...HE WAS A BIOLOGIST. HE SAID... 'IT IS ILLOGICAL TO BELIEVE IN DARWIN'S THEORY'. SIR WHITEMEAT, HE WROTE A BOOK AGAINST DARWIN'S THEORY - HE WAS ALSO A BIOLOGIST."

২৫. একের পর এক অখ্যাত-অজানা ব্যক্তিদের নাম বলে যাচ্ছেন ডা. জাকির নায়েক। ইন্টারনেট, বইপত্র অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে SALOSBURY এবং WHITEMEAT নামের দুজন জীববিজ্ঞানী, 'যারা বিবর্তনের বিরুদ্ধে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন' এমন যোগ্য ব্যক্তিদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। এরা আসলেই জীববিজ্ঞানী, না-কী জাকিরের 'উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা' বুঝা যাচ্ছে না। তবে Frank O. Salisbury নামের একজন চিত্রশিল্পীকে পাওয়া গেছে!

বিবর্তনের বিরোধিতা করে জাকিরের লেকচার শুনলে বোঝা যায় তিনি প্রতিবারই 'appeal to authority' অনুসরণ করছেন। নামগুলো ঠিকঠাক বলতে পারলে হয়ত

ধারণা করা যেত, নায়েক শুধু রেফারেন্স প্রদানে অথরিটি হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু যে ৬ জন বিবর্তন-বিরোধী নাম তিনি নিয়ে আসলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজনের নাম ঠিক হয়েছে। একজনের নাম একটু ভুল করেছেন। আর বাকি তিনটা একেবারেই হয়নি।

"AN AMEBA, AT LOWER SPECIES LEVEL... AMEBA CAN CHANGE TO PAREMISHIA. QUR'AN DOES NOT SAY... 'AMEBA CANNOT CHANGE TO PAREMISHIA' - QUR'AN DOES NOT SAY."

২৬. Paremishia নামের কিছু নেই। কেউ যদি এই শব্দ গুগলে লিখে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন যতগুলো রেজাল্ট আসে তার সবগুলোই কোন না কোন ইসলামি সাইটের। এখানে জাকির নায়েক সম্ভবত paramecium বোঝাতে চেয়েছিলেন।^{১০} আর, কোন ধর্মগ্রন্থ কি বলল বা না বলল, তার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান কখনো কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'তত্ত্ব' (Theory) তৈরি করে না। বিজ্ঞানের 'তত্ত্ব' তৈরির স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে।

"IF THEY HAVE GOT PROOF...IT CANNOT BE POSSIBLE... IT IS NOT AGAINST THE QUR'AN. BUT THERE IS NO PROOF AT ALL."

২৭. যতটুকু প্রমাণ থাকলে জৈববিবর্তনকে একটি পরিপূর্ণ 'থিওরি' হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তারচেয়ে অনেক-অনেক বেশি প্রমাণ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে; উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি পদার্থবিজ্ঞানে 'মহাকর্ষ-অভিকর্ষ বল' যতটা গ্রহণযোগ্য, জীববিজ্ঞানে 'জৈববিবর্তন তত্ত্বের' গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা ততটুকু। জাকির নায়েকরা মহাকর্ষ-অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কিছু বলেন না; কারণ এ সম্পর্কে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে কিছু বলা নেই, কিন্তু জৈববিবর্তন তত্ত্ব ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে যায় বলেই একটি জাজুল্যমান সত্যকে ঘৃণ্য উপায়ে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছেন।

"PEOPLE TALK ABOUT MOLECULAR BIOLOGY THEORY - THEY TALK ABOUT GENETIC CODING. ACCORDING TO HENSES CRAKE WHO IS AN AUTHORITY IN THIS FIELD - HE SAID... 'IT IS UNIMAGINABLE'. AGAIN IF YOU DO THAT RATIO, THE PROBABILITY OF ONE DNA FORMING, 'FROM APE TO HUMAN BEING IS AGAIN ZERO'..."

২৮. Henses Crake কে? জাকিরের ভাষ্য মতে, 'তিনি আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত অথরিটি।' আবারও 'Slip of the tongue' করলেন নায়েক; Henses Crake নয়, আসলে 'ফ্রান্সিস ক্রিক'^{১১} হবে। আমাদের নবম-দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইয়ে ডিএনএ'র যুগ্ম-সর্পিলা গঠনের যৌথ আবিষ্কারক জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক সম্পর্কে লেখা রয়েছে; আর জাকির মেডিক্যাল পাশ করে ডাক্তার হয়ে গেলেন,

তারপরও ফ্রান্সিস ক্রিকের নাম উচ্চারণ করতে-ই পারলেন না? একে তো নাম ভুল করেছেন, তারউপর ক্রিক সম্পর্কে একেবারে মিথ্যে-বানোয়াট কথা অতি-কনফিডেন্সের সাথে বলে দিয়েছেন। ক্রিক না-কী বিবর্তন নিয়ে বলেছেন, ‘এটা অকল্পনীয়’? ক্রিক কোথায়-কখন এমন কথা বলেছেন, জাকির নায়েক রেফারেন্স দেননি। আমিও কোথাও খুঁজে পাইনি। বরং এটা আমরা জানি বিবর্তন তত্ত্বের উপর তাঁর শতভাগ আস্থা ছিল। ওয়াটসন-ক্রিকের ডিএনএ’র গঠন আবিষ্কারের পরই ‘আণবিক জীববিজ্ঞান’ নামের জীববিজ্ঞানের নতুন শাখার উন্মেষ ঘটে। যেখানে বিবর্তনকে একদম গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

আজকের যুগে আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা থেকেই বিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে; যেমন ‘ভিভিন জীবের বংশানুসৃত দ্রব্য ডিএনএ, আরএনএ এবং প্রোটিনের ন্যায় বৃহৎ অণুসমূহের আণবিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সর্বত্র একই নিয়মে এদের বিন্যাস হয়। এদের গঠন-এককও একই। যেমন সকল জীবের প্রোটিনের গঠন-একক এমাইনো এসিড। একই রকমের (২০ প্রকার অত্যাবশ্যিকীয়) এমাইনো এসিড দিয়ে সকল জীবের প্রোটিন গঠিত। প্রোটিন অণুতে এমাইনো এসিডের অবশেষসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে এমাইনো এসিড অনুক্রম। একইভাবে দেখা গেছে সকল জীবের ডিএনএ অণুর গঠন-একক বেস। মাত্র চার প্রকার বেস (এডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, সাইটোসিন) দিয়ে সকল জীবের ডিএনএ গঠিত। ডিএনএ-তে বেসসমূহের অনুক্রমকে বলে নিউক্লিয়োটাইড অনুক্রম। আর আরএনএ-এর গঠনও ডিএনএ’র অনুরূপ। পার্থক্য হল একটি বেসে। আরএনএ-তে থাইমিনের বদলে থাকে ইউরাসিল।

আণবিক জীববিদ্যা প্রমাণ করেছে যে ডিএনএ, আরএনএ ও প্রোটিনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক সকল জীবের একই। প্রোটিন অণুর এমাইনো এসিড অনুক্রম নির্ধারণ নিউক্লিক এসিডের (ডিএনএ এবং আরএনএ-এর) ত্রৈয়ী বেস অনুক্রম বা জেনেটিক কোড। সকল প্রকার জীবের উৎপত্তি যদি একই সূত্র থেকে না হয়, তবে আণবিক জীববিদ্যার এসব আবিষ্কার একেবারে অর্থহীন। তাই এ কথা মেনে নিতে হয় যে সকল জীবের উৎপত্তি একই উৎস হতে। তবে সময় সময় এদের মধ্যে কিছু বংশানুসৃত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ পার্থক্যটা বাহ্যিক গঠনে যতটা প্রকট ততটা আণবিক পর্যায়ে নয়।’ (দ্রষ্টব্য : ম. আখতারুজ্জামান, *বিবর্তনবিদ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২১৫-২২২)।

তিন

জাকির নায়েকের বাগ্মীতা-কৌশল

বিবর্তন নিয়ে জাকির নায়েকের দীর্ঘ মিথ্যাচার সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এবার আমরা জাকির নায়েকের বাগ্মীতা-কৌশল নিয়ে সামান্য হলেও আলোচনা করতে পারি। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তিনি ঠিক কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেন—সেটা এবার দেখা যাক :

বিবর্তনের উপর লেকচার দিতে গিয়ে বললেন, ‘তিনি কয়েক শত বিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ীর রেফারেন্স দিতে পারেন, যারা বিবর্তন তত্ত্বের বিপক্ষে ছিলেন।’ এটা সাধারণ মানুষকে ‘বুঝ দেয়ার’ সাধারণ পদ্ধতি। মানুষ কখনই ঘাঁটাতে যাবে না, আসলেই কয়শত এমন বিজ্ঞানী আছে কিংবা নেই? এই কথা বলে তিনি পার পেতে পারতেন, যদি কয়েক শতের মধ্য থেকে অন্তত কয়েকজনের নাম সঠিকভাবে বলতে পারতেন। তিনি মাত্র একজনের নাম বলতে পেরেছেন, ভিটামিন সি’র ‘উদ্ভাবক’ জর্জি। এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। তাঁর মানে তিনি বিবর্তন নিয়ে কথা বলার যোগ্য একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামও বলতে পারেননি যিনি বিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি অবশ্য পল গ্রাসের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেটাও আলোচনায় এসেছে। এভাবেই জাকির নায়েক প্রথম ধোঁকাটি দিয়েছেন।

জাকির নায়েক পেশায় একসময় একজন চিকিৎসক হলেও বিজ্ঞানের কিছুই বোঝেননি বা ইচ্ছেকৃতভাবে বিজ্ঞানকে বিকৃত করে চলছেন। তাঁর প্রথম কথাতেই সেটা বোঝা গেছে। বিবর্তনের ওপর এই লেকচারে ‘থিওরি’ কথাটা সাধারণ মানুষ যে অর্থে ব্যবহার করে তিনিও এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা সাধারণত ‘থিওরি’ বলতে এমন কিছুকে বোঝাই যার ব্যবহারিক কোনো গুরুত্ব নেই; যেমন অনেকেই বলেন ‘জীবনটা তো থিওরি দিয়ে চলে না’ কিংবা ‘থিওরি কপচাবেন না।’ কিন্তু বিজ্ঞানে ‘থিওরি’ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে—‘বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত অনুকল্প।’ জাকির নায়েক বললেন : “I have not come across any book which say ‘fact of evolution’, all books say ‘theory of evolution’.” চিকিৎসা বিজ্ঞানে লেখাপড়া করেও জাকির নায়েকের এই বক্তব্য থেকে ‘বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’ সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। মনে হচ্ছে জাকির নায়েক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ‘থিওরি’ পরিভাষাটির অর্থ বোঝেননি বা ইচ্ছেকৃতভাবেই প্রকাশ করতে চাননি। বিজ্ঞানে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে, তিনি জানেন ‘Theory of Gravitation’ বা ‘Electromagnetic Theory’ বলতে কি বোঝায়? পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি জগদ্বিখ্যাত জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী এবং জনপ্রিয় সাইন্স-ফিকশন লেখক আইজ্যাক আসিমভের (Isaac Asimov) কথা। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে তিনি নিউইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিনে সৃষ্টিবাদীদের ‘থিওরি’ সম্পর্কে অজ্ঞতা উন্মোচন করে বলেছেন : “A theory (as the word is used by scientists) is a

detailed description of some facet of the universe's workings that is based on long observation and, where possible, experiment. It is the result of careful reasoning from these observations and experiments that has survived the critical study of scientists generally.”² অর্থাৎ বিজ্ঞানে ‘থিওরি’ বলতে কোনোভাবেই ‘যেনতেন অনুমান’, ‘অপরীক্ষিত-অপ্রমাণিত বক্তব্য’ ‘লোককথা’ ইত্যাদি কোনোভাবেই বোঝানো হয় না; স্পষ্টভাবেই থিওরি’র সাথে বৈধ প্রমাণ, অর্থবোধক গবেষণা, পরীক্ষিত অনুকল্প জড়িত। আর ‘প্রকৃতিতে সংঘটিত কোন বিষয় বা কোন পর্যবেক্ষণ যখন বারংবার বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয় তাকে ফ্যাক্ট বা বাস্তবতা বা সত্য বলা হয়ে থাকে।’ থিওরি’র কাজ হচ্ছে, এই বাস্তবতা বা সত্য বা ফ্যাক্ট বা পরীক্ষিত কোন অনুকল্প কীভাবে ঘটছে, সেই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দান করা এবং বোধগম্য করে তোলা। সে হিসেবে বিবর্তনও একটি বৈজ্ঞানিক থিওরি; যা প্রচুর পরিমাণে ‘বৈধ প্রমাণ’, ‘অর্থবোধক গবেষণা’, ‘পরীক্ষিত অনুকল্পের’ মাধ্যমে গড়ে ওঠেছে। আমেরিকার বিখ্যাত জীববিশেষজ্ঞ স্টিফেন জে. গোল্ড (Stephen J. Gould, 1941-2002) বলেন : “If the vernacular word FACT has any currency in science, it can only be defined as “confirmed to so high a degree that it would be perverse to withhold provisional assent.” By this definition, evolution – the observation that all organisms are connected by unbroken ties of genealogy – is as much a fact as anything discovered by science – as well confirmed as Copernicus’s claim that the Earth moves around the sun.”⁸ মনে রাখতে হবে ‘বিজ্ঞান স্ববির কিছু নয়, প্রতিনিয়তই বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের পরেই তত্ত্বগুলো তৈরি হয়, পূর্বের তত্ত্বগুলো পরিবর্তিত-পরিবর্তিত-সংস্কার হয়। ধরা যাক, আম-জাম-আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে, শূন্য ভেসে থাকে না—তা হচ্ছে ফ্যাক্ট বা বাস্তবতা; আর কেন মাটিতে পড়ে—এটা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়ে খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে নিউটনের এই সূত্র হল ‘থিওরি’। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না, যেমন আলোর বেগের কাছাকাছি গতিশীল কোন বস্তুকণা বা যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব খুব বেশি (ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি), সেসব পরিস্থিতিতে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের চেয়ে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (General Theory of Relativity) আরো নিখুঁত ফলাফল দেয়। তাহলে আমরা কি বলব, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউটনের তত্ত্ব (আইনস্টাইনের তত্ত্বও যদি কখনো ভুল প্রমাণিত হয়) ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিধায় গাছ থেকে আম-জাম-আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে? নাকি গাছের ডাল এবং মাটির মাঝামাঝি শূন্যে ঝুলে রয়েছে? আম-জাম-আপেলের পতন তো নিউটন বা আইনস্টাইনের তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। বিজ্ঞানের নিয়মই হচ্ছে যে তত্ত্বটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের পর সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতাকে এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারে, তাকেই গ্রহণ করা হয়। তারপরও যদি দেখা যায় এর চেয়ে আরো ভালো বিশ্লেষণ পরবর্তীতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ীই যথাযথ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যায়, নতুন নতুন এবং উন্নতর তত্ত্বের দ্বারা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানে অগ্রগতি ঘটতে থাকে।^{১০} বিবর্তন তত্ত্বের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জীবজগতের ফ্যাক্ট বা বাস্তবতা হলো—‘জীবমাত্রই জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য অবলম্বনগুলো সেই হারে বাড়ে না। ফলে দেখা দেয় প্রচণ্ড লড়াই—একই প্রজাতির বংশধরদের মধ্যে, বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে। বংশানুসৃত ভ্যারিয়েশন জীবের চরিত্র ধর্ম, তাই প্রত্যেক প্রজাতির সন্তানরা মা-বাবা, ভাই-বোন থেকে পৃথক হয়ে থাকে। খাদ্য, স্থান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু নিয়ে জীবদের যখন প্রচণ্ড লড়াই বাধে, তখন ওইসব ভ্যারিয়েশনের কোন কোনটি কিছুটা সুবিধাজনক হলে ঐ জীবেরা কঠোর ‘অস্তিত্বের সংগ্রামে’ টিকে যায়, অনুকূল ভ্যারিয়েশন নাই যাদের, সেই জীবদের নির্বিশেষে মৃত্যু ঘটে। কোন জীব স্থির নয়, কোন প্রাণীকেই পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, তারা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে।’ জীববিজ্ঞানের আর কোনো থিওরি-ই এই মুহূর্তে জীবজগতের এই ফ্যাক্টগুলোকে যথা প্রজাতির উৎপত্তি, বিকাশ, ভ্যারিয়েশন তৈরির কারণ ইত্যাদি এত স্পষ্ট করে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যদি কখনো পাওয়া যায়, তবে সেটিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে, নয়তো বাতিল বলে গণ্য হবে। জীবজগতের ফ্যাক্টগুলোকে ডারউইন ১৫০ বছর আগে তাঁর ‘অরিজিন অব স্পিসিজ’ বইয়ে দেখিয়েছিলেন; তার সাথে ফ্যাক্টগুলোকে ব্যাখ্যার জন্য একটি তত্ত্বও জুড়ে দিয়েছিলেন। সে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হয়তো সময় লেগেছে, কিন্তু ফ্যাক্টগুলো নিয়ে তখনও কেউ সংশয় পোষণ করতে পারেনি। অর্থাৎ ফ্যাক্ট বোঝার অনেক পরেই আমরা ‘থিওরি’ হিসেবে বিবর্তনকে গ্রহণ করেছি। আর জাকির নায়েক বললেন উল্টো কথা; এটা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার একটা উপায়। কারণ অনেকেই হয়তো থিওরি কথাটির বৈজ্ঞানিক অর্থ জানেন না।

সবশেষে নায়েকের কনফিডেন্স, বাচনভঙ্গির কথা না বললেই নয়। মিথ্যা কথাগুলো কত সাহসের সাথে বলেন, ভিডিও দেখলেই বুঝা যায়। তাঁকে ভাল বিতর্কিক বলা যেতে পারে। ট্র্যাডিশনাল বিতর্কে ‘জ্ঞান’ মুখ্য থাকে না। মুখ্য বিষয় থাকে উপস্থাপনের ভঙ্গি। তাছাড়া নায়েক কাদের সামনে কী বিষয়ে বক্তৃতা দেন সেটাও এ থেকে বোঝা যায়। বিবর্তন নিয়ে তিনি এমন সব মানুষের সামনেই কথা বলেছেন যাদের বিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর চেয়ে কম।

বিবর্তন বিষয়ে আমি কিছুটা জানতাম, তাই তাঁর কথাগুলো odd লেগেছে। কিন্তু যে বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানি না, সে বিষয়ে তাঁর কথা শুনলে হয়ত মোটেও odd লাগতো না। হয়তো বাস্তবতার সাথে সেগুলোকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম না। জাকিরের দর্শক-শ্রোতাদেরও হয়তো একই অবস্থা।

বিবর্তন নিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যতদিন গুঁচিবামু থাকবে, বিবর্তন নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, তারাই ততদিন বিবর্তন নিয়ে ওয়াজ-নসিহত করবে।

সাক্ষাৎকার

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর...

উৎস নির্দেশ

১. <http://en.wikipedia.org/wiki/Galapagos>
২. http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_niche
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Darwin's_finches
৪. <http://www.darwinproject.ac.uk/darwinletters/namedefs/namedef-4735.html>
৫. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dalton_Hooker
৬. http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Paul_Grasse
৭. http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gyorgyi
৮. <http://www.icr.org/article/136/>
৯. http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle
১০. <http://en.wikipedia.org/wiki/Paramecium>
১১. http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
১২. Isaac Asimov, "The Threat of Creationism", New York Times Magazine, 14 June 1981. Available at: http://www.stephenjaygould.org/ctrl/azimov_creationism.html.
১৩. বন্যা আহমেদ, *বিবর্তনের পথ ধরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯।
১৪. Stephen J Gould, 'Creation Science is an Oxymoron', *Skeptical Inquirer*, Vol. XI, no. 2 / winter 1986-87. Available at: <http://www.skepticfiles.org/socialis/creation.htm>.

সভ্য সমাজ গড়তে, সভ্যতার অগ্রগমনকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন শিক্ষার, উপাসনা-ধর্মের নয়। বিশ্বের যে অঞ্চলে শিক্ষার বিকাশ যত কম, সেই অঞ্চলে উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা তত বেশি।

—প্রবীর ঘোষ।

'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল' এদেশে অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার-চিরাচরিত প্রথার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের ধারা ভেঙে জনগণের জীবনাচরণে মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ প্রসারের নিমিত্তে কাজ করে চলেছে। এ সংগঠন বাংলাদেশের সাধারণ জনগণসহ যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মী, সেকুলার রাজনৈতিকদলের সদস্যদের মধ্যে 'যুক্তিবাদী-চিন্তা'র পরিচিতি ঘটানো ও প্রসারের উদ্দেশ্যে 'যুক্তিবাদ', 'নারীবাদ', 'সম্মত', 'উপাসনাধর্ম', 'প্রক্রিয়া'সহ সমকালীন নিয়ে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও সাধারণ সম্পাদক প্রবীর করেছেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হবে। এ সংখ্যায় হল। [বি.দ্র.: বি. যু. কা.'র প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম নামের গ্রন্থ প্রকাশ করে বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন।]



(৫) বি. যু. কা. : কেউ কেউ যুক্তিবাদীদের 'নাস্তিক' বলে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে এও লক্ষ্য করা যায়, কিছু ধর্মীয় নেতা নিজেদের নামের শেষে 'যুক্তিবাদী' টাইটেল জুড়ে দিচ্ছেন। ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাস রেখে কি যুক্তিবাদী হওয়া যায়? একজন ব্যক্তিকে 'যুক্তিবাদী' হতে হলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়?

প্রবীর ঘোষ : বিজ্ঞানমনস্কতা বা যুক্তিবাদের কতগুলো আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত আছে। এই শর্ত পূরণের পরই একজন মানুষ 'বিজ্ঞানমনস্ক' বা 'যুক্তিমনস্ক' মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত। শর্তগুলো এই রকম :

(১) পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশ্লেষিত ও প্রমাণযুক্ত শৃঙ্খলিত জ্ঞানকে মানবেন।

(২) যুক্তিবাদীরা হবেন নমনীয়। যে'দিকে যুক্তি, সে'দিকেই তিনি ঝুঁকবেন। ভাববাদীরা হলেন এর বিপরীত চরিত্রের। তাঁরা গুরুবাক্য (ধর্মগুরু) ও নিজ ধর্মগ্রন্থের কথা চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাসে অনমনীয়।

(৩) প্রশ্নাতীত আনুগত্য নয়। প্রয়োজনে অবশ্যই প্রশ্ন তুলতে হবে। ভক্তেরা ধর্মগুরুর কথা যেভাবে চূড়ান্ত ও অদ্রাশ্য বলে বিশ্বাস করেন, তা যুক্তিমনস্ক মানুষের কাম্য হতে পারে না। মনে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন। যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারপর গ্রহণ বা বর্জন করবেন।

(৪) কে বললেন—সেটা বড় নয়। কী বললেন, সেটাই বড়ো কথা। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ বা বিজ্ঞানচার্য সত্যেন্দ্রনাথ যদি পরলোক বা অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন, তাতে কী এসে যায়? তাঁদের বিশ্বাস তো 'বিজ্ঞানের সত্য' হয়ে যাবে না। একজন নতুন, সাধারণ মানুষও গ্রহণযোগ্য কোনও তত্ত্ব দিলে তাকে গ্রহণ করার মত, প্রশংসা করার মত উদার মন চাই একজন খাঁটি যুক্তিবাদীর।

(৫) কোনো তত্ত্ব বা গ্রন্থকে 'অপরিবর্তনীয়', 'চূড়ান্ত', 'চিরন্তন' ভাবটা যুক্তিবিরোধী। যে তত্ত্ব বা গ্রন্থের বক্তব্য আজ যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য, কাল তাকেই হটিয়ে দিতে পারে নতুন তথ্য। এমন হয়েছে, হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

(৬) বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলনে যুক্ত হলে অনেকেই আপনাকে নানা প্রশ্ন করবেন। এটাই স্বাভাবিক। আমরা কেউ-ই সবকিছু জানি না। জানা থাকলে আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দিই। জানা না থাকলে স্পষ্ট বলুন, 'জানি না'। সবজাতার ভণ্ডামি করবেন না। যদি দেখেন, কিছু মানুষ আপনাকে নিয়েই মজা করতে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে চলেছেন, তবে তাঁদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করুন। যাঁরা তর্কের খাতিরে তর্ক করতে চান, জানার আগ্রহ নেই, তাঁদের জন্য শক্তি ক্ষয় করবেন না। শুধু রেডিও, টিভি-র মতো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এইসব তর্কিকদের মোকাবিলা করুন, ছিন্ন করুন।

(৭) নিজের যুক্তিতে বুঝে নিন—ঈশ্বর সর্বকালের সেরা গুণব।

(৮) বুঝে নিন, ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই।

(৯) ভাগ্য-নিয়তি-জ্যোতিষে বিশ্বাস রেখে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া যায়, যুক্তিবাদী হওয়া যায় না।

(১০) 'আত্মা অবিনশ্বর'—এমন ভুল ও মিথ্যে ভাবনাকে মনে জিইয়ে রেখে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। আত্মা অবিনশ্বর ভাবনাকে সত্যি ধরে নিয়েই শ্রদ্ধা করা হয়। নিজেকে বিজ্ঞানমনস্ক বলে জাহির করবেন এবং একই সঙ্গে শ্রদ্ধার মতো

কুসংস্কারকে তোল্লাই দেবেন—ভাবাই যায় না। সুতরাং শ্রদ্ধা করা তো নয়-ই, শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানও এড়িয়ে যান। নিজের দোদুল্যমানতাকে জাস্টিফাই করতে মা-বাবার সেন্টিমেন্টের কথা তুলে অজুহাত খাড়া করবে না। অজুহাত একটি কুৎসিত শব্দ।

আপনি বিজ্ঞান আন্দোলন ও শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান এক সঙ্গে করলে সাধারণের কাছে ভুল সংকেত পৌঁছাবে। 'আত্মা অমর'—এই চিন্তার পথ ধরতে আসে জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদি অলীক চিন্তা। এসব অলীক চিন্তা পুষ্ট করতে চায় শোষকশ্রেণী; কারণ এমন ভুল চিন্তার পরিণতিতে শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য শোষকদের দায়ী না করে ভাগ্য, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদিকে দায়ী করবে।

(১১) নিজেকে কথায় ও কাজে জাত-পাত-বর্ণ-গোত্রের উর্ধ্ব রাখতে হবে।

(১২) জন্মগতভাবে কথিত 'উচ্চবর্ণ'-এর হলেও ভুলতে হবে বর্ণ-পরিচয়।

(১৩) উপবীত বা পৈতা, তাবিজ-কবজ-মাদুলি ধারণ করে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না।

(১৪) ভুলতে হবে জন্মগত ধর্মীয় পরিচয়। ধর্মীয় পরিচয়ই আমাদের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক করতে পারে। আমাদের পরিচয় হোক—মানবতাবাদী।

(১৫) শালগ্রাম-শিলা, অগ্নি, ঈশ্বর, ধর্মগ্রন্থ (যে কোনো ধর্মের) সাক্ষী রেখে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ অবশ্যই কুসংস্কার। যে ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই, তাকে সাক্ষী রাখার মতো স্থূল-কুসংস্কারকে ত্যাগ করুন।

(১৬) 'স্বামী' শব্দটি ব্যবহার করবেন না। 'স্বামী' শব্দের অর্থ 'প্রভু'। প্রভু কখনও বন্ধু হয় না। স্বামীর বিকল্প শব্দ হতে পারে 'জীবনসঙ্গী' বা 'সঙ্গী'।

(১৭) যৌন ইচ্ছা অবশ্যই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু পর্নো-বই পড়া, নীল-ছবি দেখা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলা কখনই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়, অস্বাভাবিক। অর্থাৎ যৌন বিকৃতি।

(১৮) অজাচার নয়। প্রেমহীন মিলন উত্তেজনার কাছে আত্মসমর্পণ-ও নয়। প্রেমের পথ ধরেই আসুক সুস্থ কাম।

(১৯) বহুগামিতা ও বেশ্যাবৃত্তিকে কোনভাবেই সমর্থন নয়। অশ্লীলতাকে সমর্থন নয়।

(২০) দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক হবেন না।

(২১) নিজেকে লিঙ্গ বৈষম্যের উর্ধ্ব রাখুন।

(২২) ভাষাগত ও প্রাদেশিকগত সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করুন।

(২৩) শুধু নাকচ বা বর্জনের ওপর কোনও কিছু স্থায়ী ভিত গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমানে সমাজের প্রচলিত নেতিবাচক দিকগুলোর নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, জনমত গড়তে হবে। কিন্তু তারই পাশাপাশি ইতিবাচক গঠনমূলক পথ অবশ্যই দেখতে ও দেখাতে হবে। আমাদের অশ্রদ্ধা পুরানো সবকিছুর প্রতি নয়, আমাদের অশ্রদ্ধা যুক্তিহীনতার প্রতি। আমাদের শ্রদ্ধা যা নতুন তার প্রতি নয়, আমাদের শ্রদ্ধা যুক্তির প্রতি।

(২৪) ধর্ম-নিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমজনতার যে ধ্যান-ধারণা তা সবই এসেছে লাগাতার প্রচারের ফল হিসেবে। শোষণ ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পালন ও পুষ্ট করতেই শোষণ শ্রেণী ও তার সহায়ক শক্তি রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রচার-মাধ্যমগুলো ‘ধর্ম-নিরপেক্ষতা’ থেকে ‘প্রাচীন ঐতিহ্য’ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার লাগাতারভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সঠিক বিশ্লেষণ হাজির করে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার চালাতে হবে। আমজনতার মধ্যে সঠিক ধারণা সঞ্চারিত করতে হবে।

(২৫) সংগঠনের প্রত্যেকটা জয়কে প্রচারের দায়িত্বে নিয়ে আসা প্রত্যেক সদস্যের জরুরি কর্তব্য। আধুনিক প্রযুক্তি (এস.এম.এস., ওয়েবসাইট, ই-মেইল ইত্যাদি) ব্যবহার করে জয়ের বার্তাকে ছড়িয়ে দিন যতজনের কাছে সম্ভব।

(২৬) কোনো সদস্যের প্রশংসনীয় কাজকে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রশংসা করুন।

(২৭) সংগঠনের মধ্যে ‘গোষ্ঠী’ তৈরির চেষ্টা করবে না। যে কোনও নীতি বা বিষয় নিয়ে সরাসরি খোলামেলাভাবে গঠনমূলক আলোচনা না করে দল পাকায় অনেকেই এবং তাতে ক্ষতি হয় এবং সংগঠন ভাঙে।

(২৮) এমন গোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা দেখলে আপনার উচিত সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে বিষয়টি নেতৃত্বের নজরে আনা।

(২৯) নেতৃত্বের কোনো দুর্নীতি দেখলে দুর্নীতির শরিক না হয়ে সে বিষয়ে সমস্ত সদস্যকে সরাসরি জানান।

(৩০) রাষ্ট্র চায় বড় মাপের গণসংগঠনগুলো তাদের কথায় উঠুক-বসুক। শাসক-দলও চায় গণসংগঠনগুলোকে ছলে-বলে-কৌশলে দখল করতে। শাসকদল যদি দেখে কোনো গণসংগঠন তাদের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে—তবে তো কথাই নেই। দখল করার জন্য ঝাঁপাবে। তারা সমিতির সদস্যদের কাউকে কাউকে ‘চর’ হিসেবে কাজে লাগবেই। আপনাকে ‘চর’ হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছে? শাসকদলের ভয়ে সে খবর

নেতৃত্বকে জানাতে পারছেন না? আপনার দ্বিধাশ্রুত মানসিকতা সংগঠনের বিশাল ক্ষতি করতে পারে।

(৩১) রাষ্ট্র বা শাসক দল যে গণসংগঠনের কাজ-কর্মকে নিজেদের স্বার্থ-বিরোধী বলে মনে করে, সেই সংগঠনের নেতার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে চাইবে সংগঠনেরই কিছু সদস্যকে কাজে লাগিয়ে। কারণ এইসব সমাজ-শত্রু রাজনীতিকরা জানে নেতাকে হত্যার চাইতে নেতার ‘চরিত্র-হত্যা’ আন্দোলনকে শেষ করার পক্ষে অনেক কার্যকর হাতিয়ার। এই বিষয়ে সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যের সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি।

(৩২) যুক্তিবাদী আন্দোলন যদি বাস্তবিকই সংগ্রামী হতে চায়, তবে অবশ্যই সংগঠনের লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। নতুবা অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

(৩৩) সহযোগী করতে, সাথী করতে সমমনোভাবাপন্নদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ বাড়ান। বিভিন্ন গণসংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি সর্বত্র আপনার সংগঠনের আদর্শের বন্ধু তৈরি করুন। এঁদের স্টাডি ক্লাসে আনুন। বিপদে এঁদের সাহায্যে পাবেন-ই। যতজনের সাহায্য পাবেন, ততটাই লাভ।

(৩৪) যুক্তিবাদী ও মুক্তমনের সংগঠন গড়ে তুলতে গেলে ‘স্টাডি ক্লাস’ চালাতেই হবে। স্টাডি ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিতে ডাকুন সেই সেই বিষয়ে জানেন, এমন ব্যক্তিকে। স্টাডি ক্লাসে যে কেউ বক্তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি বিস্তার করতে পারবেন। এখানে কোনো ‘ইগো’-কে বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশয় দেওয়া চলবে না। সবাই আলোচনা করবেন এক-ই লেভেলে থেকে। স্টাডি ক্লাসে সবাইকে বলতে বলুন, প্রশ্ন করতে বলুন। ‘স্টাডি ক্লাসের’ আলোচনা যত উন্নত মানের হবে, তত-ই আলোচনায় যোগ দেওয়া মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি শাণিত হবে।

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার ঝাঁক বিশ্বজনীনতার দিকে, মানবতার দিকে। এইসব আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত পূরণ ছাড়া একজন খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার মানুষ হয়ে ওঠার চিন্তা অবাস্তব। মনে রাখবেন, ‘যুক্তিবাদী’ সাজা যায় না। ‘যুক্তিবাদী’ হয়ে উঠতে হয়’, একটু একটু করে হয়ে উঠতে হয়।

যে ধর্মীয় নেতা নিজেদের ‘যুক্তিবাদী’ বলে প্রচার করেন তারা ভণ্ড। একটা কথা বলা খুবই জরুরি—একজন ‘নাস্তিক’ দুর্নীতিপরায়ণ, চোর, খুনি, লম্পট হতে পারেন। অর্থাৎ সব নাস্তিক ‘যুক্তিবাদী’ ও ‘মানবতাবাদী’ নন। কিন্তু ‘যুক্তিবাদী’ হয়ে ওঠার আবশ্যিক শর্ত—তাকে ‘নাস্তিক’ ও ‘মানবতাবাদী’ হতেই হবে।

‘যুক্তিবাদ’ তর্কের প্রয়োগ কৌশল নয়। ‘যুক্তিবাদ’ একটা সম্পূর্ণ দর্শন। মানব প্রজাতির অগ্রগতির দর্শন।

(৬) বি. যু. কা. : অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই বলে থাকেন—“ধর্ম একটা পবিত্র বিশ্বাসের বিষয়। সভ্য সমাজ গঠনে ধর্মের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ধর্মের সমালোচনা বা বিরোধিতা করা নেতিবাচক চিন্তার ফসল।”—এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

প্রবীর ঘোষ : ‘ধর্ম’ শব্দের সংজ্ঞা বা অর্থটা পরিষ্কার করা এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরি। ‘সাহিত্য সংসদ’ প্রকাশিত ‘বাংলা ভাষার অভিধান’ গ্রন্থে ‘ধর্ম’ বা ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ হিসেবে বলা হয়েছে : “যে সকলকে ধারণ বা পোষণ করে। প্রত্যেক জীব, বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব গুণ; যার অভাবে সেই জীব, বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না; যথা অগ্নির ধর্ম উত্তাপ এবং ঔজ্জ্বল্য, জলের তারল্য এবং শৈত্য। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব, পশুধর্ম পশুত্ব। শাস্ত্র মতে ঈশ্বরাজ্য যথাযথ পালন” (শাস্ত্র অর্থ বেদ, পুরাণ ইত্যাদি বিধিনিষেধ সমন্বিত সংস্কৃত গ্রন্থ)। ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ গ্রন্থে ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে : “স্বভাব, গুণ, শক্তি (কালের ধর্ম, আগুনের ধর্ম)”, “ঈশ্বরোপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়ের আদেশ ও তত্ত্ব (হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম)”, “পুণ্যকর্ম, সৎকর্ম, কর্তব্য (ক্ষমা পরম ধর্ম)”, নৈতিক সততা (ধর্মহীন আচরণ)”; তাহলে অভিধান থেকে আমরা ‘ধর্ম’ শব্দের দুই রকম সংজ্ঞা পেলাম : একটা শাস্ত্র মতে, অপরটি Commonsense বা সাধারণ বোধ-বুদ্ধি থেকে।

শাস্ত্র মতে ‘ধর্ম’ হল—সর্বশক্তিমান কোনো শক্তিতে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁর উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, পারলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস ও পালন ইত্যাদি। অন্য মত অনুসারে বলা হল, ‘ধর্ম’ হল গুণ বা property বা quality অথবা characteristic ইত্যাদি; উদাহরণ : তলোয়ারে ‘ধর্ম’ তীক্ষ্ণতা, আগুনের ধর্ম তাপ, তেমনই মানুষের ‘ধর্ম’ কতগুলো বিশেষ গুণ ধারণ করা, যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। এই গুণগুলোর সমন্বয়কে বলে ‘মনুষ্যত্ব’। বাংলায় ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ দু-রকম। কিন্তু বহুল ভাবে ‘ধর্ম’ শব্দটি উপাসনা-ধর্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে আমরা কাউকে যখন জিজ্ঞেস করি—“তোমার ধর্ম কী?” এটাই প্রত্যাশা করি, সে বলবে ‘হিন্দু’, ‘মুসলিম’, ‘বুদ্ধিস্ট’, ‘শিখ’—এমনি কোনও উপাসনা ধর্মের নাম।

ইংরেজিতে এই ধরনের কোনও গোল পাকানো ব্যাপার নেই। এখানে ‘উপাসনা ধর্ম’ ও ‘গুণ’ বোঝাতে দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি হল religion অর্থাৎ উপাসনা ধর্মে বিশ্বাস। অপর শব্দটি হল property যার অর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। শব্দ দুটিতে বিভেদ রেখা স্পষ্ট। উপাসনা-ধর্মহীন নৈতিক সততা মানুষের গুণ।

বিভিন্ন ভাষার অভিধানে প্রায় প্রতিটি সংস্করণেই নতুন নতুন শব্দ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। নতুন শব্দের অন্তর্ভুক্তি সেই ভাষার অভিধানেই বেশি দেখা যায়, যে ভাষা বেশি গতিশীল, বেশি সমৃদ্ধ। ইংরেজি ভাষা যতটা গতিশীল, বাংলা ভাষা ততটাই স্থবির। তাই আমরা আজও ‘ধর্ম’ নামক শব্দের জট পাকানো অর্থ বহন করে চলেছি। কিন্তু আর কত দিন?

অচল সংজ্ঞাকে সচল করতে

এগিয়ে থাকা বাংলাভাষীদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কি ‘ধর্ম’ শব্দটির অর্থভেদ অনুসারে দুটি নতুন শব্দ ব্যবহার করব? এমন দুটি শব্দ, যা ইংরেজি religion ও property শব্দের মতো ‘ধর্ম’-এর দুটি পৃথক রূপকে স্পষ্ট করবে। দুটি পৃথক সংজ্ঞাকে স্পষ্ট করবে। কোনও কিছু ‘সংজ্ঞা’ মানুষই তৈরি করে। প্রচলিত সংজ্ঞা আবার মানুষের ইচ্ছেয় পাল্টেও যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, চেতনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা পাল্টায়। এভাবেই পাল্টে গেছে ‘সতী’র সংজ্ঞা, ‘মা হওয়ার মধ্যেই নারী-জন্মের সার্থকতা’-র বোকা-বোকা ধারণা। এগিয়ে থাকা মানুষরাই চিরকাল সংজ্ঞা পাল্টেছে। আজও এগিয়ে থাকা মানুষদেরই ঠিক করতে হবে ধর্মের সংজ্ঞা। মানুষের ‘ধর্ম’ বা গুণ কি শুধুই সর্বশক্তিমানে খাঁটি বিশ্বাস ও তাঁকে পূজাপাঠ হওয়া উচিত? নাকি মানবিক গুণাবলির প্রকাশকেই ‘মনুষ্যোচিত’ ধর্ম বলে বিবেচিত হবে? আসুন আলোচনাকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার আগে দেখি ঈশ্বর আদৌ শক্তি কিনা? অনেক ‘শিক্ষিত’ মানুষও কথায় কথায় আমাদের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন—“ঈশ্বর যে একটা শক্তি, তা তো মানবেন?”

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, ঈশ্বর যদি শক্তি হন, তবে তাকে পূজা করার প্রয়োজন কী? বিজ্ঞানের সৌজন্যে আমরা আটটি শক্তির কথা জানি। তাপ, তড়িৎ, চৌম্বক, পারমাণবিক, শব্দ, রাসায়নিক এবং দুটি যান্ত্রিক শক্তি যথা স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি। কই, আমরা তো এই শক্তির কোনোটির কাছে প্রার্থনা করি না? ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের বিশ্বাস মতো ঈশ্বর একটা শক্তি হলেই বা তার পূজা করতে হবে কেন?

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল সংজ্ঞা নিয়ে। ‘মনুষ্যত্ব’-এর সংজ্ঞা কী হবে? অর্থাৎ কাকে বলবো ‘মানবিক গুণ’? ‘মানবিক গুণ’-এর সংজ্ঞা পঞ্চাশ বছরে অনেক পাল্টে গেছে।

এক সময় ‘মানবিক গুণ’-এর মধ্যে পড়ত, মা-বাবা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি। আজকের এগিয়ে থাকা মানুষ মনে করে—মা-বাবা অথবা বয়সে বড় বলেই কাউকে শ্রদ্ধা করতে নেই। কারণ অশ্রদ্ধেয় কাজ, অপরাধমূলক কাজ যারা করে তারও কারও না কারও মা-বাবা-বয়োজ্যেষ্ঠ হতেই পারে।

‘সতী’-র সংজ্ঞাও পাল্টে গেছে। স্বামীর দাসী হয়ে, পায়ের ধুলো হয়ে পড়ে থাকাকে ‘ব্যক্তিত্বহীন’ বলে ‘সতী’ বলে না। লম্পট স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে পূজার দিন শেষ। নারী জন্মের সার্থকতা কখনই সন্তানের জন্ম দেওয়া হতে পারে না। যে আত্মমর্যাদা ও

স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বেঁচে আছে সেই মানুষ। তা সে নারী বা পুরুষ—যে-ই হোক না কেন। আর ‘সৎ’ বা ‘সতী’ হতে যা একান্তই প্রয়োজন তা হল—নৈতিক সততা। সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়।

আমরা এবার মানুষের ‘গুণ’ বা ‘ধর্ম’ হিসেবে কোন কোন বিষয়কে গণ্য করব, তা নিয়ে আলোচনায় যাই।

- ❖ মানুষ তার প্রজাতির অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবে।
- ❖ নিজেকে জাত-লিঙ্গ-ভাষা-বর্ণ-উপাসনা ধর্ম-প্রাদেশিকতা, দেশের ভিন্নতার উপেক্ষা নিয়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিবেশী দেশের মানুষকে ঘৃণা করতে অজুহাত খোঁজেন—তবে সেই আচরণ হবে অমানবিক।
- ❖ স্বার্থপরতার উপেক্ষা ওঠার আর এক নাম ‘মানবিকতা’। পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে ‘পক্ষ-নিরপেক্ষ’ করে নিজেকে গড়ে তুলুন, দেখবেন, স্বার্থপরতার মতো অমানবিকতা দোষ থেকে আপনি মুক্ত।
- ❖ সাম্যকামিতা একটি মহৎ মানবিক গুণ।
- ❖ প্রতিটি মানুষের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার আছে।
- ❖ প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া নয়। ভালোবাসতে জানতে হবে।
- ❖ অপরের ভালো কাজকে আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রশংসা করতে জানতে হবে।

এই তালিকা আপনারা আরও বাড়াতে পারেন। একসময় ‘ক্ষমা’, ‘দয়া’ ইত্যাদিকে মানবিক গুণ বলে ধরা হত। আজ সময় এসেছে—কাকে ক্ষমা করব, কাকে করব না, তা বিচার করার। যে ফ্ল্যাট বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড একটি ফ্ল্যাটের কিশোরী কন্যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে, সে ক্ষমা পাওয়ার অনুপযুক্ত। তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াটাই জরুরি। মনে হতেই পারে, সভ্য দেশগুলোতে যখন মৃত্যুদণ্ড নেই, তখন আমাদের দেশে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ করা কি ঠিক হবে?

আমাদের দেশটা আদৌ সভ্য দেশ নয়। এদেশের নাগরিকদের বিনা বিচারে আটকে রাখে সরকার। নাগরিকদের ধর্ষণ করে ‘রক্ষক’ পুলিশ ও সেনা। যে গার্ড সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য মাস শেষে মাইনে পায়, সেও নিজেই ধর্ষক ও খুনির ভূমিকা নেয়। ওদের কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে আরও বেশি বেশি করে রক্ষকরা ভক্ষক হতে উৎসাহিত হবে।

যে দয়া মানুষকে পরনির্ভরশীল করে, শ্রম না দিয়ে রোজগার করতে উৎসাহিত করে, সে দয়া সমাজকে ধ্বংসের দিকে কিছুটা এগিয়ে দেয়। পরনির্ভরশীল ভিথির মানসিকতা কখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। কখনও বিপ্লব করে না।

এতো আলোচনার পর এখন আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই। আমরা ‘ধর্ম’ শব্দটির অর্থকে স্পষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধতে এবার থেকে দুটি শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করি। উপাসনা-ধর্ম ও গুণগত-ধর্ম। ব্যাপারটা ঠিক ইংরেজি শব্দের মতো। উপাসনা-ধর্ম অর্থে religion এবং গুণগত ধর্ম অর্থে property শব্দটি আমরা ব্যবহার করতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত কথাটা বাংলা অভিধানে উঠে আসবেই।

সভ্য সমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

এবার আসছি—সভ্য সমাজ গঠনে ধর্মের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা প্রসঙ্গে। আমরা ধরে নিতেই পারি, প্রশ্নটিতে ‘ধর্ম’ শব্দটি উপাসনা ধর্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলীক বিশ্বাস, কর্মহীন করে তুলতে চাইলে উপাসনা-ধর্মের তুলনা নেই। ভাবুন তো সেই সমাজের ছবি, যেখানে মানুষ রাত-দিন আর কোনও ‘কাজের কাজ’ না করে শুধুই ঈশ্বর, আল্লাহর পূজা-অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত। এরা জাগতিক কোনকিছুর মধোই নেই। খাদ্য-শয্যের চাষ করে না। ইট-সিমেন্ট-বক্স কোনো জাগতিক উৎপাদনে নেই। কোনো সৃষ্টিতেও নেই। তাহলে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায়, শুধুমাত্র খাদ্যের অভাবেই মনুষ্য প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবেই। মানুষই থাকবে না এই পৃথিবীতে। সুতরাং যখন মানুষ একটু ‘সভ্য’ হয়ে উপাসনা ধর্মে আন্তরিক হবে তখনই মানব প্রজাতির শেষের ঘণ্টা বেজে যাবে। ঈশ্বর-আল্লাহর পূজায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তা তো জলে ঢালারই শামিল। এই অর্থ যে কোনো উৎপাদনে ব্যয়িত হলে সমাজ এগোতো। আরো ভাল উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীদের মাথা খাটত। এরপর নিশ্চয়ই বলতে পারি সভ্য সমাজ গঠনে উপাসনা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা শূন্য।

আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। সেখান থেকে আজকের যে অগ্রগতি, তা মানুষই এনেছে, উপাসনা-ধর্ম নয়। এনেছে মানুষেরই প্রচেষ্টা, যা মানুষের ‘গুণগত ধর্ম’। সভ্য সমাজ গঠনে ‘গুণগত ধর্মের’ প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং থাকবে।

উপাসনা-ধর্ম কতটা মানবিক

পূর্বে প্রকৃতির অনেক কিছুই মানুষের কাছে ছিল রহস্যময়। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ ভয় বা শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। জল, জড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, আগুন, পাহাড়-পর্বত, মাটি সমস্ত কিছুই প্রাণ আছে বলে বিশ্বাস করেছে, বসিয়েছে দেবত্বের আসনে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি জড় নক্ষত্র ও গ্রহগুলোর পূজা করেছে জীবন্ত দেবতা হিসেবে। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করেছে বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শূয়ার আরও নানা ধরনের গৃহপালিত জন্তু। এরাও দেবতা হিসেবে পূজা পেয়েছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষের কাছে এইসব দেবতারা দেবত্ব হারালেও সবার কাছে হারায়নি।

প্রাচীন মানুষ জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকার দরুন অসুখকে কখনও বলেছে পাপের ভোগ, কখনও-বা বলেছে অশুভ শক্তির ফল। তন্ত্র-মন্ত্র, মাদুলি, যাগ-যজ্ঞ, জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়ফুক, স্বপ্নাদিষ্ট ঔষুধ রোগের চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজও এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুন্নত দেশে এবং কিছু কিছু পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। রোগ না সারলে কারণ হিসেবে ডাইনি ঘোষণা করে হত্যা করার ইতিহাস ক্ষীণতর হলেও স্তব্ধ হয়নি।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে। গোষ্ঠীর শক্তিমান ও বুদ্ধিমানকে বরণ করেছে নেতার পদে। শক্তিমান হয়েছে শাসক, বুদ্ধিমান হয়েছে ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতারা বুদ্ধির জোরে শাসকদের ওপরও প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। নিজেদের ঘোষণা করেছে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত হিসেবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, নবরূপে ঈশ্বর হিসেবে। বিভিন্ন কৌশল সৃষ্টি করে সেইসব কৌশলকে সাধারণের সমানে হাজির করেছে অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে। নিজেদের এইসব অলৌকিক কীর্তিকথা প্রচারের জন্য কখনও সাহায্য নিয়েছে কিছু সুবিধভোগী সম্প্রদায়ের, কখনোবা কিছু অন্ধবিশ্বাসীর। পরবর্তীকালে সেইসব অলৌকিক কীর্তিকথার কিছু কিছু পল্লবিত হয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মগুরুরা নিজস্ব ধারণাগুলোকে ঈশ্বরের মত বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব অভ্রান্ত ঈশ্বরের মতগুলো একে একে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় শাসকেরা যে-সব ধর্মগ্রন্থ রচনা করে গেছে, সেগুলো বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছে। যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই সংখ্যাগুরু মানুষ যুগ যুগ ধরে মেনে চলেছে ধর্মীয় ধারণাগুলোকে। শাসক সম্প্রদায় ও পুরোহিত সম্প্রায় পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হয়ে শোষণ করেছে অন্ধ-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষদের। বিশ্বের বহু দেশেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুমনেই রোপিত হচ্ছে অবাস্তব অলৌকিক ধ্যান-ধারণার বীজ। দেব-দেবী ও সাধক-সাধিকাদের মনগড়া অলৌকিক কাহিনী পড়ে ও শুনে যে বিশ্বাস শিশু মনে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তাই পরিণত বয়সে বিস্তার লাভ করছে বৃক্ষরূপে। এই হল অতি সংক্ষেপে ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস।

বর্তমান বিশ্বে বেশিরভাগ মানুষই কোনও না কোনও উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাস করে। প্রত্যেকটা উপাসনা-ধর্মেই ধর্মীয় নেতা ছিলেন, আছেন। পৃথিবীর প্রধান ‘ধর্ম’গুলোর আছে ধর্মগ্রন্থ। এতে থাকে ‘ধর্ম’ পালন পদ্ধতি, আচার-আচরণ উপদেশ ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে কোরান-হাদিস, হিন্দুদের গীতা-বেদ, খ্রিস্টধর্মে বাইবেল, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ইত্যাদি। বিশ্বাসীরা মনে করেন, এইসব গ্রন্থের স্রষ্টা স্বয়ং সর্বশক্তিমানের প্রেরিত পুরুষ। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই যখন সর্বশক্তিমান-প্রেরিত পুরুষের তখন প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের কথা একই রকম হবে—এটাই প্রত্যাশিত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আল্লাহ বা যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন, তিনি এক ও অভিন্ন হবেন—এটাই যুক্তির কথা। এরপরও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোর উপদেশ ও বিধানে এত পার্থক্য কেন?

সভ্য সমাজ গড়তে, সভ্যতার অগ্রগমনকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন শিক্ষার, উপাসনা-ধর্মের নয়। বিশ্বের যে অঞ্চলে শিক্ষার বিকাশ যত কম, সেই অঞ্চলে উপাসনা-ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা তত বেশি।

শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো উপাসন-ধর্মের অন্ধকারকে দূর করে। তাই সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে জ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি একান্তই প্রয়োজনীয়। উপাসনা ধর্মের অসারতার বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তির আক্রমণ সভ্য সমাজ গড়ে তোলার আবশ্যিক শর্ত।

সভ্য সমাজ গঠনে উপাসনা-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আসুন আমরা ধর্ম ও সমাজের দিকে তাকাই। সমাজের অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী। সমাজের উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারী—দু’য়েরই উন্নতির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপাসনা-ধর্মের ভূমিকা হওয়া উচিত নিরপেক্ষ—যা নারী-পুরুষের সাম্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আজও পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর বহু মানুষ বিশ্বাস করেন—সব ধর্মই মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বিরোধী। সরল মানুষরা বিশ্বাস করেন, কারণ এ’কথা বলেছেন বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মের গুরুরা।

গুরুদের এইসব কথা কতটা সত্যি—আসুন একটু দেখি। মুক্ত মনে বিচার করলেই দেখতে পাব নারীদের মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় আইন, ধর্মগুরু বা ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ যে এক বিশাল বাধা। তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ অবৈধ সঙ্গমের ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বিভেদমূলক শাস্তির বিধান। ইসলামে ‘জিনা’ বা অবৈধ সঙ্গমের ক্ষেত্রে নারীকে ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘জিনা’র শাস্তি সাধারণভাবে নারীকেই ভোগ করতে হয়, যদিও সঙ্গম পুরুষ বিনা হয় না। আর তারই ফলে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসী দেশগুলোতে নারীরা ভয়ংকর রকম অমানবিকতার শিকার। উদাহরণ হিসেবে সাফিয়া বিবির ঘটনা এবং মাত্র একটি ঘটনারই উল্লেখ করছি। সাফিয়া বিবির নিবাস ছিল পাকিস্তানে। বাবা গরিব চাষী। সাফিয়া অন্ধ। বাবা ওকে জমিদার বাড়িতে দাসীর কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন এই আশায়, দুইবেলা পেট তো ভরবে। জমিদার বাড়িতে সাফিয়াকে বেঁচে থাকার ভা-রুটির বিনিময়ে শুধু ক্রীতদাসীর শ্রম নয়, দেহটাকেও তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল ধর্ষক জমিদার-তনয় ও জমিদারের কাছে। ফলে সাফিয়া জন্ম দিল একটি সন্তানের। সাফিয়ার বাবা জমিদার এবং জমিদারপুত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। শরিয়ত আইনের বিধি অনুসারে বিচারক অন্ধ-ধর্ষিতা সাফিয়াকে ব্যতিচারের অপরাধে দণ্ডিত করে ঘোষণা করেন, সাফিয়া ইসলামি আইন অমান্য করেছে। শাস্তি—প্রকাশ্যে ১৫টি বেত্রাঘাত, ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা জরিমানা। শরিয়ত আইনের বিধি মতই বিচারক ধর্ষক দু’জনকে মুক্তি দিলেন। (কে. মমতাজ ও এফ. শহীদ, পাকিস্তানের নারীর মর্যদায় আইনগত অবনতি, প্রকাশকাল ১৯৮৯, প্রকাশক—সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫১-৫২)।

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, সৌদি আরবে আজও ব্যাভিচারিণী হিসেবে চিহ্নিতের জন্য শাস্তি—নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর মৃত্যু। একজন মোল্লার নেতৃত্বে ব্যাভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। তবে ব্যাভিচারের জন্য পুরুষকে সাধারণভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। পুরুষের দণ্ড হয় এক পুরুষের সম্পত্তির উপর অন্য পুরুষের অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য। অর্থাৎ নারী হল কোনও না কোনও পুরুষের সম্পত্তি। এরচেয়ে ভয়ংকর নিষ্ঠুর পুরুষতন্ত্র কল্পনা করা যায়?

শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বিশ্বজুড়ে মানুষকে নানাভাবে বিভাজনের চেষ্টা চলছে, চলবে। ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে যে বিভাজন চলছে তার ফলে, শোষিত মানুষ যত বেশি করে বিভাজিত হবে, ততই শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিতদের ক্ষুদ্ধতা, প্রতিরোধ, সংগ্রাম ভেঙে টুকরো টুকরো হতে হতে অণু-পরমাণুতে পরিণত হবে। উপাসনা ধর্ম ও জাতপাতের বিভাজনকে কাজে লাগাতে শোষক ও শাসকগোষ্ঠী যেমন ধর্মীয় মৌলবাদ বা গভীর ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছে, তেমনই মানুষকে বিভক্ত করতে, নারী-পুরুষ বৈষম্যকে দৃঢ়বদ্ধ করতে, ধর্মীয় মৌলবাদকে ব্যবহার করছে।

হিন্দু ধর্মীয় বিধানে নারী জন্ম-পরাদীন, চির-পরাদীন। মনুর বিধানে (৯:৩) আছে :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা না স্ত্রী স্নাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অর্থাৎ নারীকে পিতা রক্ষা করবে কুমারীকালে, স্বামী রক্ষা করবে যৌবনে। বার্ষিক্যে রক্ষা করবে পুত্ররা, স্ত্রী স্বাধীনতার যোগ্য নয়।

মনুর বিধান হিন্দু ধর্মীয় বিধান, যেমন মুসলিম ধর্মীয় বিধান কোরান ও হাদিস। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন, মনু কোনও রমণীর গর্ভজাত নন, ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। এই হেতু তিনি ব্রহ্মা-পুত্র বলে বিবেচিত হওয়ার পাশাপাশি ‘স্বয়ম্ভু’ মনু বলেও পরিচিত। মনু স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ব্রহ্মার কাছে। এই স্মৃতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র বা প্রাচীন আইনের বিধান। অর্থাৎ হিন্দু আইনের বিধান ছিল সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারই চিন্তার ফসল। মনুর বিধানে মানুষ বিভক্ত হয়েছিল সরাসরি দুটি ভাগে—‘পুরুষ’ ও ‘নারী’। পুরুষকে প্রভুর ভূমিকায় এবং নারীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও অধম, ধর্মিতার চেয়েও অত্যাচারিত এবং গৃহপালিত পশুর চেয়েও হীন ভূমিকায় নামিয়ে এনেছিল মনুর আইন অর্থাৎ হিন্দু ধর্মীয় আইন। মনুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো একইভাবে নারীকে চূড়ান্তভাবে শোষণ করতে নানা উপদেশ প্রয়োগ করেছে, নানা নীতিকথার নামে দুর্নীতি ছড়াতে চেয়েছে।

শিক্ষা আনে চেতনার মুক্তি, যা দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বিবেচনায় মনুষ্যত্বের ও মানুষের চরম শত্রু মনু বিধান দিলেন মনুসংহিতায় (২:৬৭) : ‘বিয়েই নারীর বৈদিক উপনয়ন। পতিসেবাই গুরুগৃহবাস, গৃহকর্মই হোমস্বরূপ অগ্নিপর্যায়।’

মনু বলেছেন (৫:১৫৪), ‘পতি সদাচারহীন, পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কযুক্ত বা গুণহীন হলেও সতী স্ত্রী সেই পতিকে দেবতার মতই পূজা করবে।’ তাহলে হিন্দু নারীর বিনোদন কি শুধুই নানা ব্রতপালন ও উপবাস ঘিরেই আবর্তিত হবে? ব্রতপালন, উপবাসের স্বাধীনতা নারীকে দেননি মনু। তাঁর বিধানে আছে (৫:১৫৫) স্ত্রীর স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, পতির অনুমতি ছাড়া ব্রত বা উপবাস নেই। নারী স্বর্গে যেতে পারে কেবলমাত্র স্বামী-সেবার সাহায্যেই।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিধানে পদে পদে পুরুষের লাম্পট্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পুরুষের লাম্পট্যকে নীতিগতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬/৬/৮/৫) বলা হয়েছে, ‘যজমান, দীক্ষার দিনে গণিকাসাহচর্য বর্জন করবেন, তার পরদিন পরস্ত্রীর সাহচর্য এবং তৃতীয় দিন নিজ স্ত্রীর সাহচর্য বর্জন করবেন।’ অর্থাৎ দীক্ষার দিনেও পরস্ত্রীর সাহচর্য বৈধ ছিল। দীক্ষার দিন ছাড়া অন্যান্য দিন গণিকা গমনও বৈধতার ছাড়পত্র পেয়েছিল এবং গণিকাগমন পুরুষের কাছে কখনই দোষণীয় বা লজ্জার বলে চিহ্নিত হয়নি; বরং চিহ্নিত হয়েছিল পৌরুষের প্রতীক হিসেবেই।

মনুর বিধানে (৯:৪) বলা হয়েছে, ‘নিঃসন্তান স্ত্রীকে বিয়ের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাকে ত্যাগ করা যায় বারো বছর পরে, মৃত সন্তানের জন্মদানকারী স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় পনের বছর পরে।’ সন্তানের জন্ম দেওয়ার অক্ষমতার কারণে স্বামীকে ত্যাগ করার কোনো বিধান নেই হিন্দু শাস্ত্রে। তখনকার মুনি-ঋষিদের এটাও জানা ছিল না, কন্যা সন্তান জন্মের জন্য পুরুষরাই শতভাগ দায়ী।

মনুকে ব্রহ্মার অংশ হিসেবে চিত্রিত করে মনুর বিধানকেই আইনের বিধান বলে মেনে নেবার কথা বলেছেন হিন্দু শাস্ত্রকাররা, যারা মানুষ ছিলেন না অবশ্যই। তাঁরা ছিলেন পুরুষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। যাঁদের হাতে ধর্মের আর এক নাম কখনই মনুষ্যত্ব হয়ে ওঠেনি। বরং যাঁদের হাতে মনুষ্যত্ব হয়েছে খণ্ডিত, লাঞ্চিত, ধর্মিত।

এত শত-সহস্র বছর পরে যখন এই ধর্মের নামে অধর্মের দিন শেষ হয়ে, মানুষের ধর্ম শুধু ‘মনুষ্যত্ব’ হওয়ার কথা, আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী জুড়ে ভোগবাদী তীব্র ক্ষুধা জাগিয়ে তোলার চেষ্টার পাশাপাশি ভাববাদী চিন্তা, মনুষ্যত্বের ধর্মণ্ডে উপাসনা-ধর্ম চিন্তাকে জনপ্রিয় করে তোলার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চলছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায়।

বৃহত্তর ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম এসেছে সবচেয়ে পরে, অর্থাৎ আধুনিকতম। ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছিল কিছু অধিকার যা হিন্দু, খ্রিস্ট বা ইহুদি ধর্ম দেয়নি। তারপর শত শত বসন্ত এসেছে, বিদায় নিয়েছে। ইসলামি পুরুষতন্ত্রের ফাঁস আলগা না হয়ে আরও বেশি করে চেপে বসেছে। নারী আরও বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছে। ইসলামি সমাজের

বিবর্তনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রগতির পরিবর্তে সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আবর্তে। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফে আছে : “পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন... স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।” (সুরা নিসা, ৪:৩৪)। কেন প্রহার? স্ত্রী কি পুরুষের ক্রীতদাসী? নারী পুরুষকে সমান চোখে দেখে কোরান নারীকে এক সঙ্গে চারটি পতি গ্রহণের অনুমোদন দিতে পারেনি। অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে কোরান বলছে : “বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার।” (সুরা নিসা, ৪:৩)। ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে, ভোগের সামগ্রী হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয়। তারই পথ নির্দেশ রয়েছে কোরানে : “তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পার।” (সুরা বাকারা, ২:২২৩)।

মুসলিম শরিয়া আইনে নারীকে কিছু আর্থিক ও সম্পত্তির অধিকার দিয়ে কেড়ে নিয়েছে নারীর মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার। মুসলমান স্বামী চারটি স্ত্রীর উপর যখন-তখন যৌন অধিকার ফলাতে পারে, যার আর এক নাম অবশ্যই ধর্ষণ, মানবিকতার উপর ধর্ষণ। মুসলমান স্বামীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে কোনো কারণ না দেখিয়ে যে কোনো স্ত্রীকে শুধু তিনবার ‘তালাক’ দেওয়ার। মুসলমান স্বামী এক সঙ্গে চার স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করার অধিকারী, তাই এক পুরনো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী ঘরে এনে ধর্মীয় আইনি লাম্পটি চালাতেই পারে। এমন তালাকের সুযোগে পুরুষ সম্মেলগ করতে পারে বহু নারী। এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার পুরুষসুলভ অধিকার যে ধর্ম দেয়, সে ধর্ম অবশ্যই সুন্দর পৃথিবী গড়ার ধর্ম হতে পারে না।

ধর্মের সূত্র ধরে মরক্কোর সংবিধানে স্ত্রীকে স্বামীর আইনি ক্রীতদাসী করা হয়েছে। ঐ দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে—স্ত্রী বাধ্য ও বিশ্বস্ত থাকবে স্বামীর কাছে, স্বামীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের সম্মান করবে। স্ত্রী যদি তার মা বাবাকেও দেখতে চায়, তবে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ‘The Sisterhood of Man’ by Newland Kathleen : W.W. Norton & Co., New York: 1979, Page-24)।

ইসলামে বিয়ে একটি চুক্তি এবং বিয়েতে নারীর সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই সূত্র ধরে ইসলাম ধর্মে শ্রদ্ধাবান বহু মানুষকে বলতে শুনেছি—ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছে কিছু অধিকার, যা অন্য উপাসনা ধর্ম দেয়নি। এ-কিন্তু বাস্তব সত্য নয়। ইসলামে বিয়েতে পাত্র-পাত্রী যে চুক্তিতে আসে তা পাত্র-পাত্রী ঠিক করে না। চুক্তি সম্পাদন করে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গে একজন গোলামের চুক্তি ভিন্ন যে কিছুই নয়, তা মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসনে নারীদের অবস্থান নিয়ে সামান্য যে আলোচনা করেছে তাতেই যথেষ্ট বেশি বোঝা গেছে।

মুসলিম বিয়েতে নারীর সম্মতির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে এই সম্মতি একটি নিয়মরক্ষা বা অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়। অভিভাবকরা বিয়ে ঠিক করে ফেলার পর আমন্ত্রিতদের সামনে পাত্রীর সম্মতি, একটি আচারের চেয়ে বাড়তি গুরুত্ব পায়নি।

এমন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যের ধনীদেব মধ্যে ব্যাপকভাবে তালাক দেওয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে। তালাক দিয়ে নিত্য-নতুন মনপসন্দ নারীদের চুক্তি করে বিয়ে করেই চলে ধনী লম্পটরা। তারা যে স্ত্রীকে বন্ধুর পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য বা রক্ষিতা বই কিছু মনে করে না, এ কঠোর বাস্তব। ইসলামে বিয়ে যেহেতু চুক্তি, তাই তা যে কোনো সময় বাতিল হতে পারে। তবে বাতিল করার একমাত্র অধিকার রয়েছে পুরুষের; নারীর নয়।

মুসলমান পুরুষ যে কোনো ধর্মের নারীকেই বিয়ে করার অধিকারী। কিন্তু মুসলমান নারী বিধর্মীকে বিয়ে করার অধিকারী নয়। কী বিচিত্র সাম্য! যে ধর্ম মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সে ধর্ম কখনও মানুষের ধর্ম হতে পারে না। প্রতিটি অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাস নির্ভর ধর্ম নিয়ে সামান্য পড়াশুনো করলেই দেখতে পাবেন এরা কী প্রচণ্ড রকমের মানবিকতার শত্রু। এরা মানুষে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে ঘৃণা। খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্ম একইভাবে নারীকে শয়তানের আসনে বসিয়েছে। আর তাই শোষণ শ্রেণীর কাছে ‘ধর্ম’ আজ এক শক্তিশালী অস্ত্র, যার সাহায্যে শোষিতদের ভেঙে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায় পরম নিশ্চিন্তে, বিনা প্রতিবাদে, বিন প্রতিরোধে। মুসলিম দুনিয়ার বহু দেশেই ‘নারী-খৎনা’ নামের এক বীভৎস-বর্বোরোচিত প্রথা, যে প্রথা মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বই কিছু নয়; যে প্রথা পুরুষকে মানুষ থেকে শয়তানে পরিণত করেছে, আর নারীকে পরিণত করেছে পশুতর জীবে। ‘খৎনা’ প্রথা আজও প্রচলিত আছে যানা, গিনি, সোমালিয়া, কেনিয়া, তাজিকিস্তান, নাইজিরিয়া, মিশর, সুদানসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। এইসব দেশে নারীদের যৌনকামনাকে অবদমিত করে যৌন-আবেগহীন যৌন-যন্ত্র করে রাখতে পুরুষশাসিত সমাজ বালিকাদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে। নারীর যৌন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যৌনির প্রবেশ মুখে পাপড়ির মতো বিকশিত ভগাঙ্কুর। নারীদের খৎনা করা হয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সাধারণভাবে সাত-আট বছর বয়সে। খৎনা যারা করে তাদের বলা হয় ‘হাজামি’। দু’জন নারী শক্ত করে টেনে ধরে বালিকার দুই উরু। দুই নারী চেপে ধরে বালিকার দুই হাত। ‘হাজামি’ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে ভগাঙ্কুর। এই সময় উপস্থিত নারীরা সুর করে গাইতে থাকেন, “আল্লাহ মহান, মুহাম্মদ তাঁর নবী, আল্লাহ আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে।”

পুরুষ শাসিত সমাজ ওইসব অঞ্চলে নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের রক্তে রক্তে এই বিশ্বাসের বীজ রোপন করেছে, কাম নারীদের পাপ, পুরুষদের পুণ্য। খৎনার পর সেলাই করে দেওয়া হয় ঋতুস্রাবের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে যৌনিমুখ। খোলা থাকে মূত্রমুখ। খৎনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বালিকার দুই উরুকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হয়, যাতে যৌনি মুখ ভালমতো জুড়ে যেতে পারে। বিয়ের পর সেলাই কেটে যৌনিমুখ ফাঁক করা হয়, স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্য; কারণ নারীর কাম তো ওরা পাপ বলে

চিহ্নিত করে নারীকে করতে চেয়েছে কাম-গন্ধহীন যৌন-যন্ত্র। সন্তান প্রসবের সময় সেলাই আরও কাটা হয়। প্রসব শেষে আবার সেলাই। তালাক পেলে বা বিধবা হলে আবার নতুন করে সেলাই পড়ে ঋতুস্রাবের সামান্য ফাঁক রেখে। আবার বিয়ে, আবার কেটে ফাঁক করা হয় যোনি। জন্মের চেয়েও অবহেলা ও লাঞ্ছনা মানুষকে যে বিধান দেয়, সে বিধান কখনই মানুষের বিধান হতে পারে না। এ তো শুধু নারীর অপমান নয়, নারীর অবমাননা নয়, এ মনুষ্যত্বের অবমাননা।

ইসলামে বেহেস্তের বর্ণনা শুড়িখানা আর বেশ্যাপল্লীর মতই শোনায। এখানে যৌনসুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার অধিকারী পুরুষ। বেহেস্তের ছুরেরা সৌন্দর্যে সূর্য, চন্দ্রকেও মলিন করে। পুরুষদের জন্য বেহেস্তের সুখ বিষয়ে কোরান বলছে : “ওদের সঙ্গিনী দেব আয়তনয়না হর।” (সুরা দুখান, ৪৪:৫৪)। “সাবধানীদের জন্য রয়েছে সাফল্য; উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিদযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপত্র।” (সুরা নাবা, ৭৮:৩১-৩৪)। এই আয়তনয়না অসামান্য সুন্দরী ছুরদের সঙ্গে বেহেস্তে আসা পৃথিবীর পুরম্বদের মিলন ঘটাবার লোভ দেখানো হয়েছে কোরানে। (সুরা আত-তুর, ৫২:১৭-২০); বেহেস্তে আসা জীবনের প্রথম পুরম্বদের কাছে এইসব স্বর্গসুন্দরীরা হবে অনাঘ্রাত ফুল—সে নিশ্চিততার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে কোরানে। (সুরা রহমান, ৫৫:৫৬)। কল্পিত স্বর্গ বেহেস্তে নারীদের কোনো স্থান হয়নি। বরং মুসলিম নীতিনির্দেশক গ্রন্থ হাদিসে বলা হয়েছে : ‘নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়।’

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোও একইভাবে নারীকে শয়তানের রূপেই চিহ্নিত করেছে। মহাভারত অনুশাসনপর্ব : ৩৮-এ বলা হয়েছে—তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান সমান হবে। দেবীভাগবত-এ বলা হয়েছে (৯ঃ১), নারীরা জাঁকের মতো সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মূর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পত্নী মনে করে, সেই পত্নী সুখভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে। মনুসংহিতায় নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে (৯:১৫) : ‘পুরুষ দেখামাত্রই তারা মেতে ওঠে বলে তারা চঞ্চলচিত্ত ও স্নেহশূন্য; তাই সুরক্ষিত রাখা হলেও তারা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।’ এমনতর নারীকে বশে রাখতে প্রয়োজন স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা নয়, প্রয়োজন নির্দয় প্রহার—এ কথা হিন্দু শাস্ত্রবাক্যে উচ্চারিত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে (১:৯:২:১৪) : “লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপরে আর কোনো অধিকার না থাকে।” মনু বলেন, নারী নির্গুণ। “নদী যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলনে নোনা হয়, নারীও তেমন; যেমন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়, তেমন পুরুষের গুণযুক্ত হয়।” (মনুসংহিতা, ৯:২২)। হিন্দু ধর্মের বিধানে পুরুষতন্ত্র বিধবা নারীকে যেভাবে গ্রাস করতে উদ্যত তেমনটি পৃথিবীর আর কোনো প্রধান

ধর্মগুলোর মধ্যে দেখা যায় না। মনুসংহিতা নির্দেশ দিচ্ছে (৫:১৫৭) : “পতির মৃত্যুর পর পত্নী ফলমূলের স্বল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষয় করবে, তবু পর-পুরুষের নাম করবে না।” পত্নীর মৃত্যুর পর পতি কী করবে, তারও নির্দেশ রয়েছে (৫ঃ১৬৮) : ‘পত্নীর মৃত্যু হলে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে পুরুষ আবার বিয়ে করবে।’

আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষদের প্রধান ধর্ম ইসলাম ও হিন্দু বলে এই দুটি ধর্ম নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। অন্য প্রধান ধর্মগুলোতেও একইভাবে পুরুষ দ্বারা নারীকে অবদমিত রাখার প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবেই উপস্থিত। একটি-দুটি উদাহরণে আলোচনায় ইতি টানবো এবার।

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বলা হয়েছে : ‘নারী থেকেই পাপের জন্ম।’ আরও বলা হয়েছে, ‘নারী হল সমাজের নিকৃষ্ট জীব।’ খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে রয়েছে, ‘তারাই ভালো মেয়ে, যারা স্বামী অনুগত, বিশ্বাসী, সন্তান পালনের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক।’ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ নারীদের নির্বাণ লাভের যোগ্য বলে মনে করতে না। নারী সংসর্গে থাকলে পুরুষরাও নির্বাণ লাভে বঞ্চিত হবে।

হাজার পাঁচেক বছর আগে উপাসনা-ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে। বৌদ্ধ, খ্রিস্ট, ইসলাম, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মের আবির্ভাব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থাকে। প্রায় দুই হাজার বছর আগে যিশুর ১২ জন অনুগামী নিয়ে খ্রিস্ট-ধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ৩৬৮ কোটিরও বেশি। উপাসনা-ধর্মে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের সংখ্যা ৯৩ কোটির বেশি। হিন্দু উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ৮২ কোটি ৮১ লক্ষ। (সূত্র: এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা)।

১৯৯৩ সালের ১০ ডিসেম্বর ৫৪ জন Religion কলামে ‘মানবতাবাদী’ লেখার আইনি অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ভারতের মানবাধিকার সমিতি। বছর বারো আগেও যে Humanist ও Atheist-দের সংখ্যা ছিল নগণ্য, বর্তমানে তারাই পৃথিবীর মোট জনসমষ্টির প্রায় ২২% হয়ে গেছে। এই অতি দ্রুত বৃদ্ধির হারের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। সংখ্যাটা খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের পরেই।

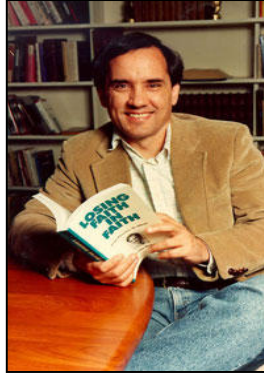
জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-যুক্তিবাদ ও মুক্তমনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে উপাসনা-ধর্মের প্রতি মানুষের অন্ধ-বিশ্বাসও হ্রাস পেতেই থাকবে। একদিন উপাসনা-ধর্ম সভ্য সুশিক্ষিত সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবেই।

ঈশ্বরবাদ খণ্ডন

মূল : ড্যান বার্কার*

অনুবাদ : সৈকত চৌধুরী

ঈশ্বরবাদীরা বা আস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবি করেন। নাস্তিকেরা তা করেন না। ধর্মবাদীরা প্রায়ই নাস্তি দেন ‘ঈশ্বর নেই’—প্রমাণ আলোচনার বিষয়বস্তুর দাবি করেন—ঈশ্বরের তারা বলেন না যে প্রমাণিত হয়েছে।’ (যা মিথ্যা প্রমাণের প্রয়োজন তা-ই এর যথেষ্ট)। আর যে কোনো বা প্রমাণের দায়িত্ব এর কিছুই অস্তিত্ব দাবি করেন, বর্তায়। (এবং কোন কিছুই এর অনস্তিত্ব প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রাখেন)। একজন লোক যদি দাবি করেন তিনি antigravity device বা অভিকর্ষ-বিরোধী যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তবে



* Dan Barker আমেরিকার মুক্তচিন্তা এবং সেকুলার আন্দোলনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ। তিনি Freedom From Religion Foundation-এর Public Relation Director। একসময়কার খ্রিস্টান মিশনারিজের সদস্য (দীর্ঘ উনিশ বছর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত), পরবর্তীতে অনেক ঘটনাবল্হ পথ অতিক্রম করে মুক্তচিন্তা আর যুক্তির পতাকাতে সহযাত্রী। তাঁর লেখা *Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist* গ্রন্থের পাতায় পাতায় সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রার কথাই বর্ণিত হয়েছে, জয়ধ্বনি করেছেন মানবতাবাদের। আলোচ্য প্রবন্ধটি Dan Barker-এর স্বহস্তে পাঠানো *Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist* (FFRF, Inc. Wisconsin, USA, 2003) গ্রন্থ থেকে অনুমতিক্রমে ‘Refuting God’ পরিচ্ছেদের অনুবাদ। উল্লেখ্য ‘Refuting God’ পরিচ্ছেদটি লেখকের গোটা বইটিরই সারসংক্ষেপ। সংস্কৃতকারণেই এই পরিচ্ছেদে অনেক আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে; এবং লেখক অন্য পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তৃত পরিসরে পেশ করেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটিকে যুক্তির পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য-বোধগম্য করার জন্য অনুবাদক প্রথম বন্ধনীর ভিতরে নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেছেন।

‘এর অস্তিত্ব বাস্তবে অসম্ভব’—তা প্রমাণের দায়িত্ব অন্য কারো উপর পড়ে না। (দাবিকারক নিজে যদি প্রথমে বিষয়টিকে প্রমাণ করতে না পারেন তবে তা-ই একে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে)।

কিছু নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ‘ঈশ্বর’ বিষয়টি প্রমাণিত বা বোধগম্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ নিয়ে বিতর্কের কোন মানে হয় না। ‘আত্মা’ এবং ‘অতিপ্রাকৃত’—এগুলোর মত বিষয়গুলো বাস্তবে অর্থপূর্ণ কিছুই প্রকাশ করে না, এবং ‘সর্বজ্ঞানী’ ও ‘সর্বশক্তিমান’ ধারণাদ্বয় পরস্পরবিরোধী (অমূলক); কেন অর্থহীন বিষয় নিয়ে আলোচনা।

তথাপি আস্তিকতামূলক যুক্তি ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অনেক লিখিত-অলিখিত বক্তব্য পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঐগুলোকে সংক্ষেপে উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করা হয়েছে। নাস্তিকতা হল একটি নির্দিষ্ট অবস্থান যেখানে এ ধরনের আস্তিকতামূলক দাবি নাকচ হয়ে যায়।

ঐশ্বরিক পরিকল্পনা

“এগুলো সব কোথা থেকে এসেছে? আপনি কিভাবে মহাবিশ্বের এ জটিলতা ব্যাখ্যা করবেন? আমি বিশ্বাস করি না প্রকৃতির সৌন্দর্য শুধুমাত্র দুর্ঘটনার মাধ্যমে হতে পারে। শিল্পকর্মের জন্য একজন শিল্পীর প্রয়োজন।”

এ থেকে অনুমান করা যায় বক্তা কী প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। কোন কিছু প্রমাণের জন্য এর চেয়ে উচ্চতর সঙ্গতিপূর্ণ ‘বর্ণনা প্রসঙ্গ’ আনলেই উক্ত বিষয়টি বোধগম্য হতে পারে। একটি মহাবিশ্বের ব্যাখ্যার জন্য একটি ‘উচ্চতর মহাবিশ্ব’ প্রয়োজন। কিন্তু মহাবিশ্ব হল সবকিছুর মিলিত রূপ যার চেয়ে উচ্চতর কিছু নাই। আর সমস্যার বিষয় হল, মহাবিশ্বের জন্য যদি একজন স্রষ্টা প্রয়োজন হয় তবে স্রষ্টার জন্যও অপর একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হবে—যা এমনভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। ঈশ্বরের মন অন্ত ত প্রকৃতির মত জটিল হতে হবে এবং তা কিছু প্রশ্নের উদ্বেক করে—যেহেতু যে কোন জটিলতার জন্য একজন স্রষ্টা প্রয়োজন তাই ঈশ্বরের মন তথা ঈশ্বরেরও একজন স্রষ্টা প্রয়োজন। আর যদি ঈশ্বর অসৃষ্ট হতে পারেন তবে মহাবিশ্ব অসৃষ্ট হতে পারবে না কেন?

প্রকৃতিতে শিল্পকর্ম রয়েছে, কিন্তু যখন তা বলা হয় তখন আস্তিকেরা বা ঈশ্বরবাদীরা ভিন্ন অর্থে এটি গ্রহণ করেন। প্রকৃতিতে উপলব্ধ শিল্পকর্মের জন্য বুদ্ধিমান কিছুই অস্তিত্ব কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। জীবন হল নিজীব ‘Natural Selection’-এর ফসল; এর কোন উচ্চতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। (প্রকৃতি কোন ঘটনার জন্য যতটা উপযুক্ত, ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা ততটাই। পৃথিবীর পরিবেশ জীবকূলের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য অত্যনুকূল হওয়ায় তা-ই ঘটেছে আবার কোন বিরূপ ঘটনায় তা সহজেই ধ্বংস হয়ে

যেতে পারে। প্রাণীকূলের উৎপত্তি, বিকাশ, ধ্বংস, বৃদ্ধিমত্তা কোনটাই চেতনাহীন প্রকৃতির কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। মানুষের বৃদ্ধিমত্তা বা সভ্যতা নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, প্রকৃতির কাছে নয়—এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আর মহাবিশ্বকে শৃঙ্খলাপূর্ণ বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। মহাবিশ্বের সিস্টেমকে Chaotic System বা বিশৃঙ্খলতন্ত্র বলা হয় আর প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছু শৃঙ্খলা এমনিতেই দেখা যেতে পারে যা ঐ বিশৃঙ্খলারই অংশ।)

ঈশ্বরবাদী বা আস্তিকদের ‘শিল্পকর্ম বিতর্ক’টি দাঁড়িয়ে আছে অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, বাস্তবতার উপর নয়। প্রকৃতির কোনো জটিলতাকে ব্যাখ্যা করতে না পারার মানে এই নয় যে এর কোনো উত্তর নেই। হাজার বছর ধরে মানুষ বজ্র ও উর্বরতার রহস্য বর্ণনার জন্য পৌরাণিক বা কাল্পনিক ব্যাখ্যা তৈরি করেছে। কিন্তু যত বেশি আমরা জানতে পারছি, ততই ঈশ্বরের প্রয়োজন কমে যাচ্ছে। (যেমন, ইদানীং ‘পানিচক্র’ ব্যাখ্যার জন্য এখন আর কেউ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন না)। ‘ঈশ্বর বিশ্বাস’ হলো একটি রহস্য ব্যাখ্যার জন্য আরেক রহস্যের অবতারণা, এবং তাতে কোনো রহস্যেরই সমাধান পাওয়া যায় না। (আমরা যদি প্রকৃতির কোনো ঘটনা না বুঝি তবে যথাযথ নিয়মানুসারে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে অথবা অপেক্ষা করতে হবে, বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কী বলেন। অবশ্য বিজ্ঞানীকেও বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গবেষণা ও তা ব্যাখ্যা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ঘটনার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া যায় ততক্ষণই আমাদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হবে, হতে পারে এ অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ আবার তা হতে পারে স্বল্প। কিন্তু পূর্বেই যদি কেউ ‘ঈশ্বর’ বা অনুরূপ কোনো অতিলৌকিক অনুকল্পের অবতারণা করে ব্যাখ্যা করতে চান তবে এই অতিলৌকিক অনুকল্পটি প্রমাণের দায়িত্ব তারই; আর যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন তবে তা অগ্রহণযোগ্য এবং দাবিটি ভিত্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য এখনো কেউ ঈশ্বর বা অনুরূপ কিছু অস্তিত্বের স্বপক্ষে কোনো নিখুঁত যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি। প্রমাণের নামে যা উপস্থাপিত হয়েছে তা শুধুই বাজে কথা।)

“এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক বিধান দ্বারা পরিচালিত। বিধানের জন্য প্রয়োজন একজন বিধান দাতা বা বিধাতা। তাই নিশ্চয়ই একজন ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রক রয়েছেন।”

প্রাকৃতিক নিয়ম একটি বর্ণনা-মাত্র, তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিধান বা নির্দেশ নয়। (A natural law is a description, not a prescription)। মহাবিশ্ব কোনোক্রমে দ্বারা বা নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে না। ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ মানুষের তৈরি ধারণা মাত্র, যা প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলী মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলে; এটি সামাজিক নিয়মকানুনের মত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণগত নির্দেশনা নয়। (আজকে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা যেভাবে ঘটে থাকে, যেমন পৃথিবীর আফ্রিক গতি বা বার্ষিক গতি, ঐ ঘটনা যদি ভিন্নভাবেও ঘটতো—তবে আমরা তাকেও বলতাম ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’)। যদি

ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ধারণা সঠিক হয় তবে তা সমভাবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঈশ্বরকেও কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। (তা না হলে ঈশ্বর একটি ‘বিশৃঙ্খল ধারণায়’ পতিত হবে)।

“এটি অপ্রমাণিত যে জীবনের জটিলতা দুর্ঘটনার মাধ্যমে উদ্ভূত; এবং তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুসারে সকল সিস্টেম বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হয় তা বিবর্তনকে অসম্ভব করে তুলে। তাই অবশ্যই স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে।”

এই ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক আপত্তি বিজ্ঞানের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে। কোনো জীববিজ্ঞানীই দাবি করেননি, বর্তমানের প্রাণীগুলি হঠাৎ করে সংঘটিত এক ধাপ দুর্ঘটনাজনিত ‘মিউটেশন’-এর ফলে উদ্ভূত হয়েছে। বিবর্তন দীর্ঘ সময় ধরে ছোট ছোট ক্রমপরিবর্তনের ফসল, যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি পরিবেশের সাথে খাপ খেয়েছে; যেমন মানুষ বিকশিত না হয়ে অন্য সহস্র-কোটি সম্ভাবনার একটি হতে পারত যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের নির্মমতার মধ্যে হয়ত টিকে থাকতে সমর্থ হত। সম্ভাবনার নিয়মানুসারে এবং বাস্তবতার নিরিখে, ধর্মবাদীদের বিষয়টি এরকম যেন, কোন লটারি বিজয়ী বলছে, ‘লটারি বিজয়ের সম্ভাব্যতা খুবই কম, তাই আমি তা জিততে পারি না।’

সৃষ্টিবাদীরা প্রায়ই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটিকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করে থাকেন। এ সূত্রানুসারে ‘বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় একটি বদ্ধ সিস্টেমের মধ্যে।’ কিন্তু সাধারণভাবে পৃথিবী একটি মুক্ত ব্যবস্থা। তা সূর্য থেকে শক্তি পাচ্ছে। পৃথিবীর ব্যবস্থাগুলো সৌরশক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছে, শক্তির রূপান্তর হচ্ছে। শেষে আবার ঐ শক্তি ভিন্নরূপে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। (তাই পৃথিবীকে বদ্ধ সিস্টেম ভেবে একে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের সাথে তুলনা করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়)। কখনো হয়তো সূর্য ঠাণ্ডা হবে এবং পৃথিবীর জীবজগত বিলীন হয়ে যাবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

“লক্ষ লক্ষ লোক ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে আত্মিক অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি দ্বারা জানে।”

বেশিরভাগ ঈশ্বরবাদী দাবি করেন তাদের স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে ধ্যান বা প্রার্থনা দ্বারা জানতে পারা যায়; কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (বিভ্রম) ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীন্দ্রিয়বাদকে জটিল করার প্রয়োজন নেই। অনেকে এমনিতেই গুজব তৈরি করতে পছন্দ করেন, অলীক শব্দ শুনতে পান, কল্পিত বস্তু দেখা অথবা কাল্পনিক কারো সাথে কথা বলার দাবি করেন। এগুলো বাস্তব কিছু নয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পরিমাণ অসংখ্য কিন্তু এটি মানুষের ব্যাপার, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত নয়। ‘সত্য’ জনসমর্থন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ধর্মগুলো উদ্ভূত হয়েছে মুহূর্ত, দুর্বলতা, স্বপ্ন এবং অজানার প্রতি ভয়কে কেন্দ্র করে।

“নাস্তিকদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অভাব রয়েছে তাই তাদের কাছে আস্তিকদের ঐশ্বরিক অনুভূতি বোধগম্য নয়। এটি একজন বর্ণাঙ্ক ব্যক্তির রঙের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মত।”

অনেক আস্তিক বা ঈশ্বরবাদী দাবি করেন ঈশ্বরকে বিশেষ ‘আধ্যাত্মিক’ উপলব্ধির দ্বারা জানা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের উপলব্ধি কী ভিন্ন কোন জগৎ হতে আসে কিংবা যা বোঝার জন্য ‘ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়’-এর প্রয়োজন? সংশয়বাদীরা এ ধরনের বিশ্বাসকে নাকচ করে দেন। বর্ণাঙ্করা কখনো রঙের উপস্থিতিকে অস্বীকার করেন না তাই ধর্মবাদীদের তুলনাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্ণাঙ্ক ও বর্ণদৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির একই পৃথিবীতে বসবাস করে এবং উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে আয়ত্ত্ব করে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বর্ণালী দ্বারা দৃষ্টি ব্যতীতই ‘বর্ণ’ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। (তাছাড়া দেখা যায়, অনেক নাস্তিক জীবনের প্রথমাংশে আস্তিক ছিলেন। কোনো কোনো নাস্তিক তখন আস্তিকদের মতোই তথাকথিত আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধি করতেন যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে মনোবিজ্ঞানে। আস্তিক-নাস্তিক উভয়ের উপলব্ধি ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া একই ধরনের এবং কারোই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অতিরিক্ত কোন দৈহিক বা মানসিক ইন্দ্রিয় নেই। নাস্তিকেরা যুক্তিবাদী আর আস্তিকেরা পরিবার বা সমাজ তথা পরিবেশ থেকে ধর্মীয় অর্থোডক্স ধারণা পেয়ে থাকেন ও যাচাই-বাছাই না করেই তা গ্রহণ-পালন ও চর্চা করে থাকেন। বিধায় আস্তিকদের ‘বৌদ্ধিক অন্ধ’ বলা যায়—যে অবস্থা থেকে পরিদ্রাণের জন্য প্রয়োজন মুক্তবুদ্ধির চর্চা। এছাড়া আস্তিকদের অভিযোগটি যদি ঠিক-ও হত তবে নাস্তিকদের কোনভাবেই অপরাধী বলা যেত না—যা ধর্মীয় ধারণার সাথে সংঘর্ষিক।)

কোন ধর্মবাদী ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির কোনো নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করেন না, ফলে তা প্রথমেই দার্শনিক বৈধতা হারায়। কোন সংশয়বাদী ‘মানসিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে’ অস্বীকার করেন না কিন্তু তারা জানেন তা শুধু অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসের ফলেই ঘটেছে, যার ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞান দিতে পারে। আর আস্তিকেরাই শুধু ‘সম্পূর্ণ মানুষ’ এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক, উদ্ধতপূর্ণ ও হাস্যকর।

নৈতিকতা

“আমাদের সবারই ভালো ও মন্দের ধারণা তথা বিবেকবোধ আছে যা আমাদের উচ্চতর আইনের অধীন করে দেয়। বিশ্বজনীন নৈতিকতার আকাঙ্ক্ষা মানবতার উর্ধ্বে কিছু ইঙ্গিত করে। এটি ঈশ্বরের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ যা অদৈহিক এবং আমাদের ঐরকম মহিমাম্বিত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে।”

আরেকটি ‘অজ্ঞতাভিত্তিক ভুল যুক্তি’। নৈতিক প্রক্রিয়া মানুষের জীবন ধারণের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে : যা জীবনকে সমৃদ্ধ করে তাই ভালো আর যা জীবনকে ব্যাহত করে তাই মন্দ। মিথ্যা বলা বা চুরি করা অপরাধ—তা বোঝার জন্য দৈব নির্দেশের প্রয়োজন নেই। কোন আচরণ যৌক্তিক অথবা সদয়চিত্ত তা বোঝার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে।

‘বিশ্বজনীন নৈতিকতা বোধ’ বলতে আসলে কিছু নেই এবং সব নৈতিকতা পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বহুবিবাহ, নরবলি, নরমাংসভোজন, স্ত্রী পেটানো, অঙ্গহানি করা, যুদ্ধ, খৎনা, খোজাকরণ এবং অজাচার অনেক জাতির সংস্কৃতিতে যথারীতি নৈতিক এবং প্রচলিত। তাহলে ঈশ্বর কি বিভ্রান্ত?

ঈশ্বরকে ‘অদৈহিক’ বলা অসঙ্গতিপূর্ণ। সময় এবং স্থানের মধ্যে যে কোন কিছুকেই কোনো এক রূপে থাকতে হয়। (দৈহিক আকার ব্যতীত কোনো সচেতন সত্তা আমাদের ধারণায় অসম্ভব, তাই ঈশ্বরের এরূপ ধারণা আমাদের কাছে অমূলক এবং দার্শনিকভাবে অবাস্তব)। নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের দৈহিক মস্তিষ্কে নিরূপিত, তাই নৈতিকতা যদি ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করে তবে আমরাই ‘ঈশ্বর’। ঈশ্বরের ধারণা কেবল একটি মানবিক প্রক্ষেপণ মাত্র।

“যদি কোনো পরম নৈতিক আদর্শ না থাকে তবে চূড়ান্ত অর্থে কোনো ন্যায় বা অন্যায় থাকবে না। ঈশ্বর ব্যতীত নৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়বে।”

এটি ঈশ্বরকে ‘বিশ্বাসের’ জন্য করা উক্তি, ঈশ্বরের ‘অস্তিত্ব’ প্রমাণের জন্য নয়। পরম নৈতিকতার দাবি আসে বিপদজনক ধর্মবাদীদের কাছ থেকে। প্রাগুবয়স্ক সচেতন লোকেরা মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তার প্রতি ঝোঁক প্রদর্শন করেন, কেননা এটাই সঙ্গতিপূর্ণ, যৌক্তিক এবং নৈতিক মানবিক গঠন কাঠামোর প্রতি দিক নির্দেশ করে, দৈব অস্তিত্ব ছাড়াই। (আর কোনো ভালো কাজ করার জন্য আমাদেরকে যদি স্বর্গের প্রলোভন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য নরক বা ঈশ্বরভীতির প্রয়োজন হয়—তবে কিসের মনুষ্যত্ব?)

কোনো ধর্মগ্রন্থ কোনো একটি ভালো আইনকে সমর্থন করতে পারে কারণ ঐ ধর্মগ্রন্থ তৈরির সময় অনেক মানবিক আইন ও মূল্যবোধের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। এখানে বাইবেলের তথাকথিত দশটি আদেশের কথা বলা যায়। উন্নত দেশগুলোর আইন ও সংবিধান সংগত কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ (এবং অনেক ধর্মের ধর্মীয়-বাণীর তুলনায় বেশি মানবিক)।

এমন কোনো প্রমাণ নেই যে আস্তিকেরা নাস্তিকদের চেয়ে অধিক নৈতিক। বাস্তবিকক্ষেত্রের উল্টোটাই বোধ হয় সঠিক; যা শতবর্ষ ধরে ধর্মীয় হিংস্রতা ও নাস্তিকদের মানবতাবোধ থেকে টের পাওয়া যায়। অধিকাংশ নাস্তিকই সুখী, সৃজনশীল ও নৈতিক ব্যক্তি। (সকল ধর্মের যেহেতু নিজস্ব ঈশ্বর রয়েছে এবং প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা ভিন্ন তাই তা শৃঙ্খলার পরিবর্তে সমাজে শুধু বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে।)

আস্তিকদের দাবি যদি সঠিক হতো তারপরও তা খুব একটা প্রয়োগসিদ্ধ হত না। ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রবিশ্বাসীরা শাস্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একমত হন না। বিশ্বাসীরা প্রায়ই শাস্ত্রবাদ, গর্ভনিরোধ, পশু অধিকার, পরিবেশ রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমকামীদের অধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিরোধিতা করেন। আস্তিকদের নৈতিকতার টানা পোড়ন দেখে এটাই মনে হয় হয়তো তাদের বহু সংখ্যক ঈশ্বর রয়েছে যারা নৈতিক উপদেশ প্রদানের ব্যাপারে দ্বন্দ্বে রয়েছেন অথবা মাত্র একজন ঈশ্বর রয়েছেন যিনি নৈরাশ্যজনকভাবে বিভ্রান্ত।

আদি কারণ

“সব কিছুই কারণ আছে এবং সব কারণ এর পূর্ব কারণেরই ফল, তাই সবকিছুর একটি আদিকারণ আছে। ঈশ্বর হলেন সেই আদি কারণ, বিশ্বের স্রষ্টা ও ধারক”।

বিতর্কের মূল ভিত্তি বা শর্ত হল—‘সবকিছুর কারণ আছে’ এবং শর্ত দ্বারা (আস্তিকদের) সিদ্ধান্ত বা ফলাফল—‘ঈশ্বরের কোনো কারণ নেই’-এর সাথে সাংঘর্ষিক। বিতর্কের ভিত্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, কারণ সবকিছুর যদি কারণ থাকতেই হয় তবে অবশ্যই কোনো ‘আদিকারণ’ দাঁড় করানো যায় না। যদি ঈশ্বরের কোনো কারণ বা স্রষ্টা নেই ভাবা যায় তবে মহাবিশ্বের কোনো কারণ বা স্রষ্টা নেই ভাবতে সমস্যা কোথায়? (আমরা প্রতিটি ক্রিয়া বা ঘটনার অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখতে পাই। একটি ঘটনার একটি মাত্র কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাহলে বহুসংখ্যক আদিকারণের ধারণা একইভাবে উত্থাপন করা যায়। এছাড়া ‘মহাবিশ্বের কারণ’ বিষয়টি বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এ ব্যাপারে ভাবতে হলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যখন যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমাদেরকে তা বুঝতে হবে)। এমন কোনো সত্তা আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই যিনি ‘অকারণিত কারণ’ হতে পারেন। তাই আমরা ঈশ্বরের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্তে যেতে পারি না কারণ আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নেই বা নিতে পারি।

প্যাসকেলের বাজি

“ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকে তাহলে বিশ্বাসীরা সব কিছু পেয়ে যাবেন (Heaven বা স্বর্গ) আর অবিশ্বাসীরা সব কিছু হারাতে হবে (Hell বা নরক)। ঈশ্বর যদি না থাকেন তবে সেজন্য বিশ্বাসীরা কিছুই হারাতে হবে না এবং অবিশ্বাসীরাও কিছু পাবে না। সুতরাং ঈশ্বরকে বিশ্বাসের মাধ্যমে সবকিছুই অর্জন করা যায় এবং তাতে কিছুই হারানোর নেই।”

আর্গুমেন্টটি প্রথমে প্রদান করেছিলেন ফরাসি দার্শনিক ব্লেইস প্যাসকেল, যা কোনো যুক্তি নয়, শ্রেফ হুমকি মাত্র। এটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নয় বরং তার অস্তিত্বে

বিশ্বাসের জন্য অযৌক্তিক ভয়ের উপর ভিত্তি করে গঠিত ভুল ধারণা। এ ধরনের উক্তি দ্বারা আমরা ধর্মকে শুধু ‘নরকের মন্দ ধারণা’র সাথে গুলিয়ে ফেলি।

এটি সত্য নয় যে বিশ্বাসীরা কিছুই হারায় না। প্রমাণের পূর্বেই বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পরকালের মিথ্যাগুলোকে ধারণ করে জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিই, এবং মিথ্যাকে বজায় রাখার জন্য সত্যকে জলাঞ্জলি দিই। ধর্ম প্রচুর মূল্যবান সময়, শক্তি এবং অর্থ নষ্ট করে। (একটিবার নির্মোহ হয়ে হিসেব করে দেখুন, মুসলমানরা মসজিদ বানাতে, অথবা প্রতি বছর হজের সময়, কোরবানি দিতে কিংবা হিন্দুরা মন্দির বানাতে, ঝাঁকঝমক করে দুর্গা পূজা করতে কি পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটিয়ে থাকেন। ভয়াবহ রকমের এত অর্থ খরচের কি বিকল্প পথ খোঁজা নেই? এই অর্থ কি নিজেদের মানবিক চাহিদা পূরণ, জ্ঞান চর্চা করা অথবা গরীবকে সহযোগিতা করার জন্য ব্যয় করা যেত না?)। ধর্মীয় জগতকে সমৃদ্ধ করার জন্য অনেক মূল্যবান জীবনের অপচয় ঘটে। ধর্মবিশ্বাস মানুষকে নিপীড়নের হাতিয়ার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি হুমকিস্বরূপ।

এটাও ঠিক নয় যে অবিশ্বাসীরা (তাদের অবিশ্বাসের জন্য) কিছুই অর্জন করেন না। ধর্মকে প্রত্যাখানের মাধ্যমে তারা একটি ইতিবাচক উদার ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেন এবং স্বাধীন অন্তর্দৃষ্টির সুযোগ পান। নাস্তিকেরা সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির বিষয়ে সর্বদাই অগ্রবর্তী। (একজন নাস্তিক মনে করেন আমরা মানুষেরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা, পৃথিবীতে বসবাসকারী আরো মিলিয়ন মিলিয়ন প্রাণীর মত আমরাও এই পৃথিবী থেকে রঙ, রূপ, রস, খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে আছি। এই পৃথিবী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটা আমাদের সকলের। জন্মেছি এই সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা এই ধরণীতে, মৃত্যুর পর অন্য কোন স্থান নেই, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এখানেই জীবনের সমাপ্তি, তাই এই পৃথিবীকে আমাদের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ-সুন্দর করে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই। বলাবাহুল্য নাস্তিকেরা এই চেতনার বিপরীতে অবস্থান করেন।)

কোন ধরনের মানুষ অনন্তকাল নরক ভোগের উপযুক্ত—একজন সত্যের পথের পথিক? ঈশ্বর যদি এমন অবিচারী-অবিবেচক হন তবে নাস্তিকেরাও এখানে নাস্তিকদের মতই বিপদের মধ্যে রয়েছেন। এমন কী হতে পারে না, ঈশ্বর সকলকে নরকে পাঠাতে চাচ্ছেন বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী নির্বিশেষে। অথবা ঈশ্বর শুধু তাদেরই রক্ষা করবেন যারা অবিশ্বাস করার মত সাহস রাখে।

প্যাসকেল একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান এবং অনুমান করেছিলেন যে ঈশ্বর বলতে শুধু খ্রিস্টানদের ‘ঈশ্বর’ বোঝায়। তবে যদি অন্য কোনো ধর্মের ঈশ্বর সঠিক হয় তাহলে সুবিধা লাভের জন্য যে ঝুঁকি প্যাসকেলের বাজির মধ্যে রয়েছে তা আশাতীতভাবে ব্যর্থতায় প্রতিপন্ন হয়।

যে কোন দৈব বিশ্বাস যদি ভয়ের উপর নির্ভরশীল হয় তবে তা প্রকৃত ভক্তির উদয় করে না এবং এরকম একটি বিষয় উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। (আর একজন ব্যক্তি যদি মুক্তভাবে গভীর চিন্তার পর ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করেন তবে ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তবুও তার কোন অধিকার থাকবে না ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের, যদি তিনি ন্যায় বিচারক হন যেমনটি ধর্মগ্রন্থে বলা হয়।)

সত্তা সংক্রান্ত প্রমাণ

“ঈশ্বর হল এমন ধারণা, যার চেয়ে উর্ধ্বে আর কিছু কল্পনা করা যায় না। ঈশ্বর যদি বাস্তবে না থাকেন তাহলে তিনি হয়তো বিদ্যমান ধারণার উর্ধ্বে। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।”

সত্তাসংক্রান্ত প্রমাণের ডজন খানেক রূপ আছে কিন্তু খ্রিস্ট পুরোহিত আনসেল্‌ম একে উপরোক্ত রূপ দিয়েছেন। এই যুক্তিবিন্যাসের ক্রটি হল তা বিমূর্ত গুণকে বাস্তবে আরোপিত করেছে। কোন কিছুই অস্তিত্ব সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ‘মহান’ বা ‘উৎকৃষ্ট’ হতে পারে না। কিন্তু এ যুক্তিতে তাই করা হয়েছে বা ধরা হয়েছে।

যে কোন ‘অস্তিত্ব’কে ‘ঈশ্বর’-এ প্রতিস্থাপন হল এ ধরনের যুক্তিবিন্যাস প্রদর্শনের একটি উত্তম উপায়। আপনি এভাবে নিখুঁত শূন্যতাকেও প্রমাণ করতে পারেন যেখানে কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। যুক্তিটি নিজে নিজেই ভেঙ্গে পড়ে। কারণ ঈশ্বরকে সবদিক থেকে অসীম ধরা হয় যা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় নেই; তাই এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ দার্শনিকভাবে ভুল। যেমন আপেল ও কমলা একটি অপরটির মতো, এমন ধারণা পোষণ করার মানে এটা নয় যে বিষয়টির কোন বাস্তবতা আছে। তুলনাটি রেখে বলা যায়, অস্তিত্বটি ধারণায় না হয়ে বাস্তবে হল কিভাবে? এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন সত্তাসংক্রান্ত প্রমাণটি ভুল ব্যাকরণের ফসল।

প্রত্যাদেশ

“আমাদের ধর্মগ্রন্থ ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য। এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলোর উপর সন্দেহ পোষণ করা যায় না। ঈশ্বর বাস্তবে রয়েছেন কেননা তিনি এগুলোর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন।”

ধর্মগ্রন্থগুলো অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় একেবারেই সাধারণ, শুধু এটাই যে ধর্মগ্রন্থগুলোতে ‘অলৌকিকতা’ আরোপ করা হয় আর অন্যান্য গ্রন্থে তা করা হয় না। শাস্ত্রগুলোকে বিশ্বাস করতে হলে অনেক অলৌকিক বিষয় চলে আসে; যেমন দেবদূত ঈশ্বরের কাছ থেকে তা নিয়ে এসে আরেকজনের কাছে তা পৌঁছে দিচ্ছেন যা একজন বাস্তববাদী মেনে নিতে পারেন না। টমাস পেন ‘দ্য এইজ অফ রিজর্ন’-এ উল্লেখ করেছেন ধর্মশাস্ত্র প্রত্যাদেশ হতে পারে না। প্রত্যাদেশ (যদি বাস্তবে থাকত) কিছু মানুষের সাথে সরাসরি দৈব যোগাযোগ, যদি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির তা বর্ণনা করে তবে তারা এতে দ্বিতীয়

ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবেন। কেউই তা মানতে বাধ্য নন বিশেষত যদি তাতে উদ্ভট কাল্পনিক বিষয় থাকে। আর শাস্ত্রগুলো ঐতিহাসিকভাবে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কিছু কিছু শাস্ত্র ধর্মপ্রচারকের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তখন তার নানা অংশ বাদ পড়েছে, নতুন অনেক কিছু সংযোজিত হয়েছে এবং অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়গুলো পোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা মানতে নারাজ এমনকি এর ঐতিহাসিক দলিল থাকলেও। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রগুলো তৈরি হওয়ার সময়কালীন প্রচলিত সমস্যা, কাহিনী ও গল্পে ভরপুর, আধুনিককালে যার কোনো প্রয়োজনই নেই। ধর্মগ্রন্থের অনেক কথা পরস্পরবিরোধী এবং বিজ্ঞানবিরোধী—শাস্ত্রগুলোকে নির্ভুল দেখানোর জন্য ধর্মব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন ব্যাখ্যা আবিষ্কারে সিদ্ধহস্ত। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ‘অলৌকিকতা’ প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকে লঙ্ঘন করে এবং এগুলো বাস্তবে অসম্ভব সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য। ধর্মগুলোতে বর্ণিত কোন জ্ঞান কিংবা বর্ণিত কোন ইতিহাসকেও গ্রহণ করা যায় না কারণ এগুলোর স্বপক্ষে যথেষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া শাস্ত্রগুলোতে অনেক ব্যাকরণগত ও তথ্যগত ভুল পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান

“অনেক বিজ্ঞানীই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর বেশিরভাগ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরই যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তবে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস যুক্তিসম্মত।”

এটি কর্তৃত্বের দোহাই মাত্র; নাস্তিকরা ঐ বিষয়ে তাদের চেয়ে উর্ধ্বে বলতে হয়। বিদ্বান শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে সচরাচর কম ধার্মিক হন। ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী খোঁজে পাওয়া গেলেও তাদের কেউই তাদের বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারেন না। বিশ্বাস (পেশা থেকে বিছিন্ন) একটি সাংস্কৃতিক বা ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং কেউই এমন কী একজন বিজ্ঞানীও ধর্মের অযৌক্তিক ও মায়াবী প্রলোভন থেকে সুরক্ষিত নন।

“কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে দেখানো হয় যে বাস্তবতা অনিশ্চিত এবং কমই মূর্তমান। এখানে অলৌকিকতা চলে আসছে। আস্তিকদের জগৎ বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।”

এটি অর্থহীন কথাবার্তা। অলৌকিকতাকে ধরা হয় প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে, যা অতীন্দ্রিয় জগতকে নির্দেশ করে। যদি নতুন বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব করে ফেলে (একটি স্ববিরোধী ধারণা) তাহলে কোনো অতিপ্রাকৃত জগৎ বা ঈশ্বর নেই। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে ‘অনিশ্চয়তা’কে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় না; বরং বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আস্তিকতা অতীন্দ্রিয় জগতকে ইঙ্গিত করে আর বিজ্ঞান নিজেকে প্রাকৃতিক জগতে সীমাবদ্ধ করে। তাই আস্তিকতা কখনো বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না—সংজ্ঞা অনুসারে।

বিশ্বাস

“ঈশ্বরে বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তিক নয়; এর ‘যুক্তি’ সীমাবদ্ধ। ঈশ্বরের সত্যতা শুধু বিশ্বাসের মাধ্যমে জানা সম্ভব, তা যুক্তিকেও ছাড়িয়ে যায়; তবে যুক্তির সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে না।”

এটি কোনো যুক্তি নয়। এখানে স্বীকার করা হচ্ছে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক নয় তা আলোচ্য জগৎ ছেড়ে ভিন্ন জগতে (নির্বুদ্ধিতায়) চলে যায়। আর ‘যুক্তি’ সীমাবদ্ধ; তা বাস্তবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন তবে আপনি কল্পনা বা স্বপ্নচারিতার দ্বারাই প্রচারিত হবেন।

বিশ্বাস হল অপরিপাক বা স্ববিরোধী প্রমাণ সত্ত্বেও কোনো কিছুর বিবরণ শুনেই তা গ্রহণ করা, যা বাস্তবতার সাথে কখনো সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। বিশ্বাসের সকল দোহাই সত্ত্বেও এটি পরিষ্কার যে ধর্মীয় দাবি কখনো নিজের দু’পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে না। ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রে বলেছেন ‘বিশ্বাস হল এটা জানা যে আপনি বিশ্বাস করেন আর আপনি বিশ্বাস করেন এটা জানার মানে হল অবিশ্বাস করা।’

যদি কখনো এমন হয় যে আস্তিকতার একটি সঙ্গতিপূর্ণ অনুকল্প রয়েছে (বস্ত্তত যা নেই এখনো) তাহলে এটা এখনো প্রমাণ হবার প্রয়োজন রয়েছে। তাই অধিকাংশ আস্তিক প্রমাণ ও যুক্তিকে দূরে রেখে বিশ্বাসের প্রতি জোর দেন।

আত্মিক ক্ষমতা

“আত্মিক ক্ষমতা, পুনর্জন্ম এবং এ রকম অনেক কিছুর দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে এখানে ভিন্ন কিছু একটা রয়েছে।”

অধিকাংশ বিজ্ঞানী (বা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি) এরকম দাবির অনুকূলে কোন প্রমাণ রয়েছে বলে মনে করেন না। যখন সতর্কভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এগুলো পরীক্ষা করা হয় তখন এই ধরনের দাবি ভুল ব্যাখ্যা বা অবৈধ প্রচারণা বলে প্রতীয়মান হয়। (এ বিষয়ে প্রবীর ঘোষের ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’, চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)।

যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর নিখুঁত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিতে হবে। এ রকম বিষয়ে সংশয়বাদীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে ঝাঁপ না দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ অব্যাহত রাখেন এবং যৌক্তিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, যদি আস্তিকদের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো ঈশ্বরকে প্রমাণ করতো—তারপরও ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসেবে ব্যক্তিগত, মহোত্তম, সদয়, অথবা বর্তমানে জীবন্ত বা সক্রিয় প্রমাণ করা যায় না। এগুলোর কোনোটিই বিশৃঙ্খলা, কদর্যতা, দুঃখ,

দুর্দশা, বেদনা ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিতে পারে না বরং তার জন্য আরেকজন মন্দগুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ আস্তিক বা ঈশ্বরবাদীরা যখন উপলব্ধি করতে পারেন তাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলো ব্যর্থ; তখন তারা গৎবাঁধা আক্রমণের পথ বেছে নেন। নাস্তিকদের সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়, তারা অসুখী, অনৈতিক, রাগী, খ্যাপাটে, দানবীয়, নির্দয় লোক—তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য এবং অন্যায্য। তবে, অভিযোগটি যদিও ‘সত্যি’ হত, তাতেও কিন্তু আস্তিকদের দাবিগুলির কোনটিই সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

এখন পর্যন্ত সতর্কতামূলক পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে ঈশ্বরবাদীদের দাবি সর্বৈব অসত্য, নাস্তিকতাই যৌক্তিক অবস্থানে বিদ্যমান।

সংজ্ঞা

ধর্ম : চিন্তা প্রক্রিয়া বা চর্চা যা দাবি করে অতিপ্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব এবং যা কোনো মতবাদ, ধর্মশাস্ত্র এবং পবিত্রতায় আস্থা রাখতে, উপাসনা করতে বা অনুসরণ করতে বলে।

ঈশ্বর : যিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন বা পরিচালনা করেছেন বলে আস্তিকরা বিশ্বাস করে। একে সাধারণত বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ভালোবাসা এবং ঘটনার মত মানবীয় এবং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞতা, অমরতা, পরম দয়ালুতা, সর্বব্যাপ্তিতার মত অতিমানবীয় গুণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই সত্তাকে প্রায়ই মানুষের সাথে কথপোকথন, বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্কিত বলে চিত্রায়িত করা হয়। আবার কখনো কখনো অব্যক্তিগত ‘শক্তি’ বা স্বয়ং ‘প্রকৃতি’ বলেও ধরা হয়।

আস্তিকতা : ঈশ্বরে বিশ্বাস।

নাস্তিকতা : ঈশ্বরে বিশ্বাসহীনতা।

অজ্ঞেয়বাদ : যা প্রমাণ বা যৌক্তিক প্রতিপাদন অপরিপাক, সে প্রস্তাবনাকে সত্য বলে স্বীকারে অসম্মতি। অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদী ঈশ্বরে বিশ্বাস নাকচ করে দেন।

মুক্তচিন্তা : ধর্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে যুক্তির উপর নির্ভর করে এবং কর্তৃত্ব বা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, প্রথা, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস নিরপেক্ষ হয়ে মতামত গঠন প্রক্রিয়া।

সত্যতা : কোন মাপকাঠি অথবা প্রক্রিয়ার স্তর বা পর্যায়, যার সাথে বাস্তবতা এবং যুক্তির সামঞ্জস্যতা আছে।

বাস্তব প্রমাণ : সুগভীর চিন্তার উপায় যা কোন প্রস্তাবনার সত্যতাকে নিম্নোক্ত পরীক্ষণ দ্বারা যাচাই করে :

- I. প্রতিপাদন : প্রমাণ বা বারবার পর্যবেক্ষণযোগ্য পরীক্ষণ একে নিশ্চিত করেছে কি?
- II. মিথ্যাপ্রতিপন্নকরণ যোগ্যতা : সম্পূর্ণ মুক্তভাবে কোন বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যায়ণ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ সম্ভব কি-না এবং এরকম সকল প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে কি-না?
- III. হিসেবী : কোন বক্তব্যের সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যা কি-না, এবং এর জন্য সবচেয়ে কম অনুমানকরণের প্রয়োজন রয়েছে কি?
- IV. যুক্তি : কোন বক্তব্য-সিদ্ধান্ত স্ববিরোধিতা, অবয়ববিরুদ্ধ অনুমান থেকে মুক্ত কি?

সেক্যুলার মানবতাবাদ : সেক্যুলার মানবতাবাদ হল যৌক্তিক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানবতাবোধকে সব ধরনের মূল্যবোধের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে।

অতিরিক্ত পাঠের জন্য :

- 1) *The Age of Reason*, Thomas Paine.
- 2) *An Anthology of Atheism and Rationalism*, edited by Gordon Stein, Prometheus Books, New York, 1980.
- 3) *A Second Anthology of Atheism and Rationalism*, edited by Gordon Stein, Ph.D., Prometheus Books, New York, 1987.
- 4) *Atheism: The Case Against God*, George Smith, Prometheus Books, New York, 1979.
- 5) *Atheism: A Philosophical Justification*, Michael Martin, Temple University Press, Philadelphia, 1991.
- 6) *Bertran Russell on God and Religion*, edited by Al Seckel, Prometheus Books, New York, 1986.
- 7) *Critiques of God*, edited by Peter Angeles, Prometheus Books, New York, 1976.
- 8) *Ten Common Myths about Atheists*, Annie Laurie Gaylor, Freedom From Religion Foundation, Madison, Wisconsin (booklet), 1987.

নারী জাগৃতির প্রান্তিক সমীক্ষায় রোকেয়া ও তসলিমা

রণজিৎ কর*

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ‘সময়’ ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক ও অতীত-ভবিষ্যতের সেতুবন্ধক। যদিও সেতুবন্ধন কার্যের মধ্যে ‘বর্তমান’ নামক একটি সময় বা কালের উল্লেখ আছে, এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ‘বর্তমান’-এর প্রয়োগ আক্ষরিক অর্থে, এর স্থায়িত্ব দুর্নিরীক্ষ্য; সুতরাং ইতিহাসের উপযোগিতায় তার ভূমিকা গৌণ।

আবার বলা হয়ে থাকে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যুগ-যুগব্যাপী কর্মকাণ্ডে প্রাণীজগতের একমাত্র জীব মানুষ ইতিহাসের মূল উপাদান। কিন্তু কথাটাকে সর্বতোভাবে মেনে নেয়া সমীচীন বোধযুক্ত নয়। যেহেতু সময়ের কাঁধে চড়ে ইতিহাসের চলৎশক্তি ত্রিাশীল সেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের সবকিছুই ইতিহাসের উপাদান হওয়ার দাবি রাখে। নচেৎ সে রচনা হবে একপেশে, অনিরপেক্ষ ও পক্ষাপতদুষ্ট। জীবজগতে মানুষ গুরুমস্তিষ্কের অধিকারী বিধায় ইতিহাস তার হাতেই রচিত হয়, অন্যরা তা পারে না। সে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতকে সাজিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করতে পারে; যদিও এই পরিকল্পনা কখনো হয় সফল, কখনোবা ব্যর্থ। এরপরও একথা বলতেই হবে, আগাম পরিকল্পকদের বদান্যতায় পৃথিবী নিরন্তর এগিয়ে যাচ্ছে। ‘কোটিতে বুটি’ হলেও এরাই ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হন। উদ্ভাবনীর অমিত শক্তি ও আত্মনির্মাণের অভূতপূর্ব সম্ভাবনার মূর্তপ্রতীক এই ক্ষণজন্মরা সময়ের গতির চেয়ে এককদম এগিয়ে থাকেন।

কিন্তু তাদের সব মহতী উদ্যোগ কী সর্বদাই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে এগিয়ে যেতে পারে? মোটেও নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভিতরের বাইরের হরেক রকম বাধা তাদের যাত্রাপথে বারবার বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এই ধারা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমন আছে। সভ্যতার চরম উৎকর্ষে পৌঁছার দাবিও এক্ষেত্রে নিতান্ত হাস্যকর বলে প্রতীত হয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তার মাত্রা আদিমতাকেও হার মানায়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা

* রণজিৎ কর : লেখক, প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *সনাতন ধর্মের মত ও মতান্তর* (সূচিপত্র, ২০০৫), *উপমহাদেশে ভাগ্যবাদ* (আগামী প্রকাশনী, ২০০৭), *প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকজন* (সূচয়ণি পাবলিশার্স, ২০০৯)।

অপশিক্ষায় জর্জরিত আম-জনতা কয়েমি স্বার্থবাদীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভাটির শ্রোতে গা ভাসায়, কখনোবা সৃষ্টি করে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির। হিংস্রতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা হয় এদের আচরণিক ভাষা; যুক্তিবাদ অপঘাতে প্রাণ হারায়। রাষ্ট্রীয় পরিপোষণায় ধর্মীয় আবেগকে এমন উত্তুঙ্গে প্রতিস্থাপিত করা হয় যেখানে চড়ে প্রবঞ্চিত মানুষের বোধশক্তির বিলয় ঘটে, বিবেকী আবেদন পর্যুদস্ত হয়। মনীষী শিবনারায়ণ রায় তাঁর ‘বন্য গোলাপের সুগন্ধ’ প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন : “ভয়, লোভ, ঈর্ষা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, মানসিক আলস্য ইত্যাদি বৃত্তি ও প্রবণতা মানুষের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, প্রেম, সহযোগ, বিরোধিতা ও যুক্তিশীলতাকে গুণ্য দুর্বল করে না, অত্যাচার, সংঘর্ষ ও সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।” এই প্রতিক্রিয়াশীলদের কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প শিক্ষিতজনের দেশে সভ্যতার অগ্রতির চাকা বারবার মুখ খুবড়ে পড়ে।

আশার কথা হল, যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার নাগপাশ ছিন্ন করে যুগে যুগেই কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা মনুষ্যত্বের অমিত সম্ভাবনার উজ্জ্বল আলো সর্বজনীনভাবে দেখতে চান; নিজেদের উপলব্ধিজাত ধারণাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশকে নিরঙ্কুশ করতে প্রয়াসী হন। এই কৃতবিদ্যার সময়ের ফলিত সন্তান। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এদেরকে গতানুগতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিপরীতে অবস্থান নিতে প্রণোদিত করে। এদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সমাজে যে আপাতিক যুগান্তরের সূচনা হয় তার নাম রেনেসাঁস বা নব-জাগৃতি। উনিশ শতকের বাংলায় আমরা এরকম একটি জাগৃতির অস্তিত্ব অনুভব করি। ঠিক পশ্চিমা-ধাঁচের না হলেও এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত করেছিল। চতুস্পাটি-মস্তকের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে অন্তত কিছু মানুষ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। রাজা রামমোহন ছিলেন এই অভিযাত্রার অগ্রপুরুষ। স্বার্থসৈন্ধিক ভাবনাপ্রসূত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির জাতীয় জীবনে এই অভিযাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম।

এরপরও কথা থাকে উনিশ শতকী রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বাঙালির সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ও মানস-চেতনায় কোন প্রভাব ফেলতে আদৌ সমর্থ হয়েছিল কী না? উত্তরটা হতাশাজনক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিত্তবান উনজনরা যেমন সবকিছুর সুবিধাতোগী হয়, বাংলার নবজাগরণের সুফলও তাদের ঘরে উঠে; সহায়-সম্পদহীন অধিজনরা বরাবরের মত বঞ্চিতই থাকে। সমাজতাত্ত্বিকরা নবজাগরণের সুফল ভোগ-বঞ্চার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করলেও উনজনের অধিসম্পদ ও অধিজনদের উনসম্পদকে মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সম্পদের প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্য দুই সমাজকে পরস্পর বিপরীত প্রান্তে টেনে নিয়ে গেছে। যে আধুনিক শিক্ষার সুবাদে বাংলার এতদিনকার বদ্ধসমাজে ভাঙা-গড়ার উথাল-পাথাল চলছিল শুধুমাত্র আর্থিক অসমর্থতা হেতু অধিজনরা সে শিক্ষা গ্রহণের অযোগ্য হয়ে গেল। অর্থের দাপটে সরস্বতী দেবী বিত্তবান উনজনের গৃহে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য হলেন। বিত্তমান বলতে বুঝতে হবে তৎকালীন বাঙালি

হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে, মুসলমানের সংখ্যা এই বিশেষণের অধিভুক্ত নয়। সে অর্থে এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বললেও—যা অনেকেই বলে থাকেন, অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার নবজাগরণ যাদের হাত ধরে সূচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে যেমন রয়েছেন শাসক ইংরেজজাতের লোক, তেমন আছেন বাঙালি হিন্দু। উইলিয়াম কেরি, ডেবিড হেয়ার, জে.ই.ডি বেথুন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও—এরা সবাই ভিনদেশি এবং শেযোক্তজন বাদে ইংরেজ শাসনের সুবাদেই তাদের এদেশে আগমন। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছাড়াও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। বলা যায় এদের হাত ধরেই বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের উন্মেষ ঘটেছিল। চালু হওয়া শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও ক্রমে নারীদেরকে এর আওতায় আনার চেষ্টা চলে। এদুদ্দেশ্যে এতদিনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থার বদলে সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি এবং নারীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে অসংখ্য অবৈতনিক বিদ্যালয়তন। নারীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে প্রথমদিকে কথিত ভদ্রঘরের মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেত না; ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ‘ব্রাহ্ম’ মতের নারীরাই এক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আজকে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হয়, খ্রিস্টান, বাঙালি, ব্রাহ্ম ও তথাকথিত নীচুতলার নারীদের অগ্রণী ভূমিকার কারণেই এদেশে নারীশিক্ষার রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত হয়েছিল। নতুবা নারীকে শিক্ষিত হওয়ার জন্য আরো কতকাল অপেক্ষা করতে হত কে জানে? এখানেও সময় ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ফরাসি বিপ্লবের সূচনাপর্বে ইংরেজি ভাষায় দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। টমাস পেন রচনা করেন ‘রাইটস অব ম্যান’ (প্রথম খণ্ড ১৭৯১, এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৯২); আর মেরি ওয়েলস্টোনক্রাফট লিখেন ‘এ ভিনডেকেশন অফ দ্য রাইটস অব ওম্যান’ (১৭৯১-৯২)। প্রথমটি অত্যন্ত সময়ের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার বীজগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। এদেশে রেনেসাঁসের অভিযাত্রীদের কাছে টমাস পেন-এর রচনাবলী ছিল প্রেরণার উৎসস্থল। ওয়েলস্টোনক্রাফট-এর রচনাটি তাঁর জীবদ্দশায় মূল্যায়িত না হলেও একশত বছর পরে নারী অধিকারের মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বইয়ের মাধ্যমে নারীরা নিজেদেরকে নতুন করে চেনা-জানার সুযোগ লাভ করেন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীরা পুরুষের চাইতে কোনভাবেই হীন নয়—এটাই হল ওয়েলস্টোনক্রাফট-এর বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। কিছুটা সময় নিয়ে হলেও পাশ্চাত্য সৃষ্ট নারী আন্দোলনের চেউয়ে বাঙালি নারী সমাজ তরঙ্গায়িত হয়েছিল। আস্তে আস্তে তারা শিক্ষাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের কাছাকাছি চলে আসতে থাকেন। অবশ্য

এই অগ্রসরতার জন্য তৎকালীন র্যাডিকেলদের নারী-শিক্ষা সহায়ক বিপ্লবী ভূমিকাকেও উপযুক্ত বিবেচনা আনা যেতে পারে। তবে সব কিছু মূলে ছিল শিক্ষা গ্রহণে বাঙালি নারীদের ঐকান্তিক আগ্রহ। গোলাম মুরশিদ প্রণীত 'রামসুন্দরী থেকে রোকেয়া' গ্রন্থে নারীদের ধাপে ধাপে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চমৎকার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে।

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে শুধু বাঙালি হিন্দুর কথা উঠে এসেছে, অপরাংশ অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা এখানে গরহাজির। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনগ্রসরতাই এজন্য দায়ী, তবে ঐতিহাসিক কিছু কারণও ছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এক বিশ্বাসঘাতকী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব বিদেশি মুসলমান শাসকের হাত থেকে বেনিয়া ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ক্ষমতার হাত বদলে আপামর বাঙালির ভাগ্যের কোন ইতরবিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অথচ এক বিদেশি শাসকের পরাজয় ও অন্য দেশের শাসকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িকভাবে বাংলার পরাধীনতা বলে ভাবার মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়। স্বীকার করি, উপনিবেশিক আমলের মতো নবাবি আমলে বাংলার ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার হত না, কিন্তু নবাবরা বাংলার সম্পদ দ্বারা বাংলার মানুষের কোন হিতকর কাজ সম্পাদন করেছে? নিরুপদ্রব শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কিছু চোখ ধাঁধানো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, তাও তাদের স্মৃতিচিহ্নরূপ তৈরি করে বাকি সম্পদ হেরেমখানা ও রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের বিলাসী জীবনযাপনে ব্যয়িত হত। এরপরও এই অদৃশ্য ক্ষমতা চলে যাওয়ায় এ দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি ও তজ্জাত হীনমন্যতাবোধের জন্ম নেয়। বিধর্মীদের কাছ থেকে নিস্তার পাবার লক্ষ্যে তারা নিজেদেরকে খোলসে আবদ্ধ রেখে আত্মরক্ষা ও শুদ্ধতারক্ষার প্রয়াস চালায়; ঠিক যেমনটি করেছিল হিন্দুরা, মুসলমান কর্তৃক এদেশ জয়ের পর। আর এই কাজে সবচেয়ে বেশি প্রণোদনা যুগিয়েছিল ওয়াহাবি, ফরাজি ও তরিকায় মুহাম্মদীর মত আরবিয় ভাবধারায় পুষ্ট কতিপয় সংগঠন। এরা কথিত স্বাধীন (!) নবাবের পরাজয়কে মুসলমানদের পরাজয় বলে এক উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং এই মতবাদ সাধারণে বিকৃতাকারে ছড়িয়ে দিয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার উন্মেষ ঘটায়। হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার যদি এ সমস্ত সংগঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হত তাহলে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করাই যথার্থ ছিল। অথচ তাদের পরিচালিত আন্দোলনের রূপ জঙ্গি হলেও চরিত্র ছিল সাম্প্রদায়িক; বক্তব্য-আচরণে ইংরেজদের চাইতেও বেশি প্রকটিত ছিল প্রতিবেশী ভিন্নধর্মী বিদ্বেষ। ইংরেজ শাসিত এলাকাকে 'দারুল হরব' ঘোষণা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শত্রুজ্ঞান করা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এর ফলে শাসকদের নিকট হতে সুবিধা পাওয়া অংশটি যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারা প্রমাদ গুণে; এবং এক পর্যায়ে শাসকদের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উপর-নীচ প্রতি আক্রমণে জেরবার হয়ে আন্দোলন অচিরেই স্তিমিত হয়ে যায়, প্রাণ হারান জেহাদিগোষ্ঠীর নেতা

তিতুমীরসহ অসংখ্য সদস্য। অন্যান্য সংগঠনের নেতারা বয়োবৃদ্ধিজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করায় এবং পরবর্তীতে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সকল আন্দোলনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু এসব আন্দোলনের অজুহাতে সাম্প্রদায়িকতাকে এক পক্ষীয় বিষয় বলে বিবেচনা করাও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। এর জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষই সমভাবে দায়ী।

যাহোক আন্দোলন-জেহাদ থেমে গেলেও প্যান-ইসলামি ধারণায় বৃদ্ধ হয়ে থাকে বাঙালি মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে আরব-ইরান-তুরস্কের বাসিন্দা বলে আত্মতৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। ভাগ্য পরিবর্তনের সময়-সোপান ইংরেজি ভাষাকে তারা অবহেলা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই ভাষাশিক্ষাকে রহিত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা বলতেই হচ্ছে, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা দুর্ভাগা—এর অধিবাসীরা কেউ-ই নিজেদের এদেশীয় বলে পরিচয় দিতে চান না, পাছে তাদের আভিজাত্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, এই আশঙ্কায়। তাই দেখি এদেশের হিন্দুরা যেমন নিজেদেরকে বহিরাগত আর্যদের উত্তরসূরি হিসাবে পরিচিতি করতে চান, মুসলমানরাও নিজেদের শিকড় খোঁজেন মরু-বিয়াবানে। ১৯৫২ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা মুসলমানদের কাছে যেমন ঘৃণাই ছিল, আদিকালের হিন্দুরাও তাকে কম কটাক্ষ করেনি। যাহোক তৎকালীন সমাজের উঁচুতলার মুসলমানরা উর্দুকে আপন ভাষা বলে মনে করতেন। খান্দানি রক্ষার অবলম্বন হিসাবে এই বাতিক বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। এ সময়ে হাতে গোনা যে দু-চারজন বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় জড়ত্ব কাটিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের উঁচুস্তরে আসীন হয়েছিলেন, আভিজাত্যের সূচক উর্দুভাষাই সে সকল পরিবারে আদৃত হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য বেগম রোকেয়ার পারিবারিক বলয় ছিল এমনই, যদিও বিশ শতকের মধ্যপাদে জন্ম নেয়া তসলিমা নাসরিনের পরিবারটি ছিল খাঁটি বাংলাভাষী।



বেগম রোকেয়ার জন্ম লক্ষণীয় বিষয় হল এই নারীরা কেবল শিক্ষিত নিজেদের শিক্ষালব্ধ সংগঠিত করার লক্ষ্যে তুলে নিয়েছিলেন। প্রয়াস শতাব্দীর শেষভাগে পৌঁছে। বেগম রোকেয়ার কালে নারী প্রগতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত গতিতেই চলছিল, বিশেষত হিন্দু সমাজে। কিন্তু গৌড়া পরিবারে জন্ম নেয়ায় মুসলিম সমাজে নারীর

উনিশ শতকের শেষপাদে। শতকের শুরু থেকেই হয়ে তৃপ্ত থাকতে চাননি, জ্ঞানকে অন্যের কাছে তাঁরা কাগজ-কলম হাতে সময়ের আনুকূলে তাদের এসে পূর্ণতর অবস্থানে

অবমূল্যায়ন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এজন্য মুখ্যত দায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও তাদের সৃষ্ট ধর্মসমূহ। তাই তাঁর কলম এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল।

মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বসূরি বা সমসাময়িক এমন কাউকে পাননি যার প্রভাব তাঁর উপর বর্তে ছিল। সংগত কারণে তাঁকে পথ চলতে হয়েছে একা একা। জ্যেষ্ঠ বোন করিমুননেসা ও ভাই ইব্রাহিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে যতটুকু ইংরেজি শিক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল তার বদৌলতেই তিনি রচনা করেছিলেন ‘Sultana’s dream’। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি বেগম রোকেয়ার অশ্রদ্ধা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই বইয়ে। কল্পিত নারী-রাজত্বে পুরুষকে অকেজো করে লেখিকা স্বস্তিবোধ করেননি, তাদেরকে ‘দাস’ হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। আবার যে ধর্ম নারীকে ভোগ্যা বানাবার বিধান দেয় সেই ধর্মকেও এক হাত নিয়েছেন তিনি। রোকেয়ার এই উদ্ধৃত্য পুরুষ শাসিত সমাজ মানবে কেন? তাই তো দেখি ‘নবনূর’-এ প্রকাশিত ‘আমাদের অবনতি’ (যা পরে ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ শিরোনামে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে) নামক প্রবন্ধের ২৩ হতে ২৭ পর্যন্ত পাঁচটি আপত্তিজনক (!) অনুচ্ছেদ সম্পাদকের ধারালো কাঁচি দ্বারা ছেটে দেয়া হয়েছে। কী ছিল ছেঁটে দেয়া অনুচ্ছেদ পঞ্চকে? নিম্নে সেগুলো উদ্ধৃত করা হল :

“আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের বা শাস্ত্রের বচনরূপ অজ্ঞাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য একথা নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অনুমানে ঐরূপ মনে হয়। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই শুনিতে পাই; ‘প্যাট! তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।’ সুতরাং আমাদের আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া যায়।

“শিশুকে মাতা ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন : “ঘুমা শীগগির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু”; ঘুম না পাইলেও শিশু অন্তত চোখ বুজিয়া থাকে। সেইরূপ আমরা যখন উন্নত মস্তকে ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : “ঘুমাও ঘুমাও, ঐ দেখ নরক”; মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

“আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তার দেখা যায়।

“তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতো পান, কোন স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুনি-ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা, তাহা কেহ নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপ যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া ‘রমণী জাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে’ ঈশ্বরের এই আদেশ শোনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় তাহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বর প্রদত্ত জলবায়ু ত সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অথবা প্রভুত্ব সহ্য উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ⁺। যেখানে ধর্মের বন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। এস্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।

“কেহ বলিতে পারেন যে, ‘তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?’ তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, ‘ধর্ম’ শেষে

⁺ একজন কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহার শতাধিক পত্নী সহমৃতা হইতেন কি?

আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই ধর্ম লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন।

(বিঃদ্র: লেখিকার হয়ত রমণী শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জানা ছিল না, তাই তিনি বারবার এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন)। ক্ষুরধার এ সমস্ত লেখার প্রতিবাদও হয়েছে। নবনূর-এ এস. এ. আল-মুসাভী লেখেন ‘অবনতি প্রসঙ্গে’। তাতে বলেন—‘নারীরা কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমুতল্য হইতে পারে না, তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।’

এই পত্রিকাতে নওশের আলী খান ইউসুফজী লেখেন ‘একেই কি বলে অবনতি?’ তিনি বলেন, ‘পাঠিকাগণ! সত্যই কি আপনারা দাসী? ...অলংকারগুলি কি সত্যই আপনাদের দাসত্বের নির্দর্শন? ...পোষাকগুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না?’

ধর্মকে সমালোচনার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন ‘এ অনাভূত গর্হিত কথাগুলি কি প্রয়োজন ছিল? এ অবাস্তব কথাগুলি না লিখে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধান কোন ব্যাঘাত জন্মিত?’

আরো অনেকেই বেগম রোকেয়ার লেখার সাথে সহমত পোষণ করতে পারেননি, তাঁরাও প্রতিবাদ করেছেন। তবে সেই প্রতিবাদের ভাষা ছিল যুক্তির বদলে যুক্তি, লেখার বিরুদ্ধে লেখা। অধুনা মত লাঠি হাতে নিয়ে রাস্তায় লাফলাফি, অশ্লীল শ্লোগান, মাথার মূল্য ঘোষণা ইত্যাদির মত হিংস্রতা, ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা ও জঙ্গিপরায়ণতা ছিল না যে উৎকট প্রতিক্রিয়া তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হল। প্রতিবাদকারীগণ অত্যন্ত সম্মানার্থ ভাষায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সভ্যতার দাবি কি ‘বাত কা বাত’ মাত্র; একশত বছর পরে আমরা কি আরো পিছিয়েছি? এর উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে দু’ভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমত বেগম রোকেয়া ও তসলিম নাসরিনের লেখাগুলোর পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয়ত সংস্কৃষ্ণগণের মানসিকতা।

পর্যালোচনায় বলা যায়, বেগম রোকেয়া ও তসলিমা নাসরিনের লেখালেখির মধ্যে সময়ের ব্যবধান শত বছরের। পূর্ববর্তী হাজার বছরের তুলনায় এই সময়ে মানুষ সামগ্রিক অর্থেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই সাফল্যের দরুন মানুষের জীবনের গতির চাকা অধিকতর বেগবান হয়েছে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার তাকে করে তুলেছে আরো দুর্নিবার, নতুন পথের সন্ধানী সৈনিক। অবাধ তথ্য প্রবাহের বদৌলতে এত বড় পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি ছোট্ট গ্রামে। গতিশীলতার চেউয়ে বাংলাদেশও প্রাবিত হয়েছে; তবে তাতে স্নাত হওয়ার মত মানুষের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার-কুপমণ্ডকতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও ধর্মের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য বিশাল জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, যেখান থেকে বের হতে হলে সুশিক্ষা ও আত্মসচেতনতার বিকল্প নাই। এর অভাবে তারা পিতৃপুরুষের ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করে নতুনের শরণ নিতে অনীহাবোধ করে। যে দু/চারজন ব্যক্তি পরিবর্তিত বিশ্বের সুবাতাসকে আত্মস্থ করে স্বীয় ব্যক্তিস্বাভিত্ত সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তসলিমা নাসরিন তাদেরই একজন।

শত বছর আগে রোকেয়ার আমলে সাহিত্যের ভাব-ভাষায় যতটুকু জড়তা অবশিষ্ট ছিল তসলিমার আমলে সে বন্ধনদশা যুচে গিয়ে ভাষা আরো সাবলীল, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরভাবে পাঠকের সামনে হাজির হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বেগম রোকেয়া ‘তৃতীয় পুরুষে’ যা বলতে চেয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন তাই বলেছেন ‘উত্তম পুরুষে’ এবং অতি জোরালোভাবে। রোকেয়া কোন বিশেষ ধর্মকে আক্রমণ করেননি; উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কৌশলী ভাষা যেমন ঈশ্বর, দেবতা, পয়গম্বর, দূত ইত্যাদি সর্বজনীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিকভাবে ধর্মের সমালোচনা করাও তার লক্ষ্য ছিল না, ধর্মের যে সমস্ত সামাজিক বিধান নারীমুক্তির প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তিনি সেগুলোকে পুরুষদের রচিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের রচনায় এ রকম গোমরাহি নেই। তিনি কোনো রাখঢাকের আশ্রয় না নিয়ে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে স্বীয় ধর্মের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরে তার সমালোচনা করেছেন। বর্তমানে ধর্মের বিধানবলী অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের প্রবঞ্চনা করার মানসে সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করছে দ্বিধাহীন চিন্তে ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা উপস্থাপন করেছেন। তিনি অন্যের ধর্মকে নয়, নিজের ধর্মপুস্তককেই জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট, ‘আমি নিজের দোষত্রুটি নিয়ে বাঁচি..., অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাবার সময় নেই।’ (সূত্র : সাপ্তাহিক ২০০০, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, রোকেয়া আক্রমণ করেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে, পক্ষান্তরে তসলিমা আক্রমণ করেছেন সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীকে—যারা নিজেদের সুবিধা মত ধর্মের প্রতারকি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। রোকেয়ার দৃষ্টিতে ধর্মের সবকিছুই অকল্যাণকর নয়, কিন্তু তসলিমার দৃষ্টিতে ধর্ম শুধু নারীবাদের নয়, মানবতাবাদেরও হস্তা।

টমাস পেন বা মেরি ওয়েলস্টোনক্রাফট-এর বইগুলো বেগম রোকেয়া পড়েছিলেন কিনা জানি না, তবে এটুকু ধারণা করি বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে তসলিমার মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীবাদীর পক্ষে শুধু উক্ত লেখকদ্বয়ের পুস্তক নয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়াও কোন দুরূহ বিষয় নয়। তাছাড়া বিশ্ব রাষ্ট্রসংস্থাসহ উন্নত বিশ্ব নারী-শ্রুতির পক্ষে বর্তমান যে অনুকূল ভূমিকা পালন করছে—তা রোকেয়ার আমলে ছিল না। কাজেই কালিক সুবিধাপ্রাপ্ত তসলিমা পূর্ববর্তী যে কোন লিখিতের চাইতে অগ্রগামী থাকবেন, এটাই সময়ের চাহিতব্য। বলা যায় তিনি তা পূরণ করেছেন।

ফ্যাশন দুরন্ত এই দেশে ইদানীং বহু পুরুষ রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মী নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মাঠে নেমেছেন। এদের সবাই যে রোকেয়ার কাঙ্ক্ষিত ‘নারীস্থান’ বা তসলিমার ‘পুরুষের ন্যায় নারী অধিকার’-এর পূজক—এমন ভাবার কারণ নাই। এদের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে ত্রিস্বার্থযুক্ত। প্রথমত এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারীকে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অর্ধেক কাজ করিয়ে নিতে চায়; দ্বিতীয়ত নারীবাদীর ভেক ধরে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস চালায় এবং তৃতীয়ত নারীদের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার কৌশল হিসাবে নারী-প্রগতির বুলি কপচায়। নারীশ্রমে অল্প মজুরি প্রদান, তসলিমার নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘ক’ উপন্যাসে বিবৃত পুরুষের লাম্পটি ও স্বার্থসৈন্ধিক ভাবনাসঞ্জাত মানসে নারীকে পুরুষের স্থলাভিষিক্তকরণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই পুস্তকবাংলাদেশসহ প্রধানের দায়িত্ব ‘নারীনেত্রী’ বলে ভাবতে সরকার প্রধান নারীরা সবাই পুরুষতন্ত্রের নন, যোগ্য পুরুষের উত্তরাধিকারের ফাঁকা সৃষ্টি করে পুরুষতন্ত্র। তারা নারী হলেও পুরুষই। বেগম ছিল নারীরা যেন



সারা বিশ্বে সরকার পালনকারী নারীকে চায়। অথচ এই কেউ-ই নারীবাদী নন, প্রতিনিধি; এরা স্বয়ম্ভু যোগ্য পুরুষ জমিনটুকুতে এদের তাই দেহগতভাবে মনোগতভাবে রোকেয়ার অভীক্ষা অবরোধ প্রথার দেয়াল

ভেঙে প্রকৃত শিক্ষার্জনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ‘অবরোধবাসিনী’তে তিনি সাতচল্লিশটি গল্পে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন; অথচ নিজে বোরকা ত্যাগ করেননি। হয়ত এর ভিন্ন কারণও ছিল। নারীশিক্ষার লক্ষ্যে স্থাপিত ‘সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’-এর প্রতিষ্ঠাতা বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথা না মানলে রক্ষণশীল পরিবারগুলো সেই স্কুলে মেয়ে পাঠানো বন্ধ করে দিত—এমন আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। বরঞ্চ এতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হত। রোকেয়ার দ্বৈত ভূমিকার ব্যাপারে কবি আব্দুল কাদির-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি রোকেয়া রচনাবলীর ভূমিকায় বলেছেন : “রোকেয়া অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন; কিন্তু নারী পর্দা অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা বিসর্জন দিবে—এটা তিনি কোনদিনই কাম্য মনে করেননি। অতি আধুনিক রীতির বেলেগ্নাপনা তাঁর কাছে কিরূপ শ্লেষের বিষয় ছিল, তাঁর ‘উন্নতির পথে’ শীর্ষক রম্য রচনাটিতেও তাঁর অভিব্যক্তি ইঙ্গিতবহু ও তাৎপর্যময়।”

অপরদিকে তসলিমা নাসরিনের সময় সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির ঝড়ে টলটলায়মান। এ সময়ের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর পক্ষে ‘স্কিন টাইট’ পোষাক পড়ে ঘুরাফেরা করা সমালোচকদের খোরাক হতে পারে—অদৃশ্যপূর্ব কোন ঘটনা নয়। রোকেয়ার অভীক্ষিত

অবরোধ ভাঙ্গার জন্য তসলিমা যেন এক বিদ্রোহী নারীসত্তা। কোন কুপা-করণায় নয়, বিদ্রোহ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের এবং নারীর অধিকার আদায় করে নিতে চান। এ জন্যই আমরা মাঝে-মাঝে তাঁর চরিত্রের কথিত উৎস্রুপ প্রত্যক্ষ করি যা একজন দ্রোহীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। অভিযান-আন্দোলন চালাতে গিয়ে তাঁর সামনে যা কিছু নারী-প্রগতির পক্ষে বাধারূপ মনে হয়েছে তিনি সেটাকে ভেঙেচুরে মিসমার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। শুধু তাঁর লেখায় নয়, আচরণেও এই বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত। ঠিক এ জায়গাটিতেই তিনি রোকেয়াকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এখানেই তসলিমার অনন্যতা। আর প্রণোদনা যুগিয়েছে সময়।

এবারে লক্ষ্য করার বিষয় উভয়ের বক্তব্য-গন্ডব্য প্রায় অভিন্ন হলেও শতবছর আগেকার জরাবদ্ধ সমাজে রোকেয়ার বিরুদ্ধে কলমী যুদ্ধ ছাড়া কোন সামাজিক প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়নি। কিন্তু শতবছর পরে তসলিমা এমন কী করলেন যৎকারণে তাঁকে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে অনিকেত হতে হয়েছে? আমরা আগেই বলেছি রোকেয়ার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ধর্মের সেই বিধানবলী যেগুলো নারী-প্রগতির প্রতিকূল। কোন বিশেষ ধর্মের সমালোচনা তিনি করেননি বরং স্বীয় ধর্মের প্রতি তাঁর মৃদু অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের চাতুরী ও কৌশলী ব্যবহারে অতিশয় পটু মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে চিহ্নিত করার অপারগতায় তিনি সমগ্র পুরুষতন্ত্রকে দায়ী করে বসেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিচুতলার মানুষের দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা তাঁকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে, সমাজের সব শ্রেণীর পুরুষের চরিত্রই এক ও অভিন্ন। কিংবা এও হতে পারে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে যথার্থই চিনেছিলেন, বিপদজনক বিবেচনায় খোঁচা দেননি।

তাহলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে আমাদের চিনে নেয়া দরকার। ড. আনু মুহাম্মদ এদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন এটি একটি পিচ্ছিল ক্যাটাগরি, অনবরত যার মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও চেষ্টা দেখা যায়। (সূত্র : মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত যাত্রা, ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্ত, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)। এই প্রবন্ধেই তিনি মধ্যবিত্তের দশ-বিধ চরিত্র বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধের কলেবর কিছুটা বড় হয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা সত্ত্বেও তা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

- ১) এরা প্রত্যক্ষভাবে এবং সাধারণভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক নয়, যদিও এরা কিছু স্থাবর-আস্থার সম্পত্তির মালিক হতে পারে।
- ২) সরাসরি কায়িক শ্রম এদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এরা প্রধানত মানসিক শ্রম শক্তি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।
- ৩) শিক্ষা এসব পরিবারে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। কেননা এটি এদের সামাজিক অবস্থানের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- ৪) এদের আয়সীমা সাধারণভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট।

- ৫) এসব পরিবারে সচ্ছলতা দেখা যেতে পারে, তবে প্রাচুর্য দেখা যায় না। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটে থাকলেও অনাহারে থাকায় মত অবস্থা সৃষ্টি হয় না।
- ৬) বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য (দর্শন) ইত্যাদি চর্চা এসব পরিবারে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শ নির্মাণ ও তার বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্য থেকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধ ভাবাদর্শও উদ্ভূত ও বিকশিত হয়।
- ৭) জনমত সংগঠনে এদের মুখ্য ভূমিকা থাকে, সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশ এদের মধ্যেই প্রধানত কেন্দ্রীভূত থাকে।
- ৮) এদের (একটি অংশের) প্রধান আকাঙ্ক্ষা থাকে বৃহৎ বুর্জোয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ।
- ৯) পূঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত প্রধানত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে না, তাদের মুখ্য ভূমিকা থাকে বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ও ভাবাদর্শ নির্মাণে।
- ১০) উদ্বৃত্ত মূল্য এরা শোষণ করে না, এদের থেকে সাধারণত উদ্ধৃত্ত মূল্য সৃষ্টিও হয় না। তবে উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই এদের জীবিকা সংগঠিত হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও মধ্যবিত্তের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিবন্ধকার বলতে চাননি। সেগুলো হল, এরা সমাজের সবচাইতে সুবিধাবাদী শ্রেণী। কোন ঝঙ্কি-ঝামেলা, আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। তবে অর্জিত সুফলের সবটুকু উদরস্ত করতে চায়। আপাত দৃষ্টিতে এদেরকে নিরীহ মনে হতে পারে, কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগলে হায়েনার মত হিংস্র হয়ে ওঠে। কূর্মনীতি অনুসরণকারী এই শ্রেণীটি যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় ‘পেটি বুর্জোয়া’ বলা যায়—বাংলাদেশের সামাজিক স্তরে অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভোটের মাধ্যমে সরকারের উত্থান-পতনে এরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে; স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করে। সেজন্য ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলো এদেরকে সমঝে চলে।

রোকেয়া যাকে ঘাটাতে সাহসী হননি তসলিমা সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে আক্রমণ করতে ইতস্তত বোধ করেননি। তাই দেখি তসলিমা সমগ্র পুরুষতন্ত্রকে নয়, এই শ্রেণীটির চরিত্র বৈশিষ্ট্য নির্জলাভাবে উপস্থাপন করছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির কারসাজিতে রোকেয়ার প্রার্থী নারীমুক্তি অদ্যাবধি ভূতের পায়ে হাঁটছে। স্বার্থের আঁতে ঘা লাগায় এবং নিজেদের স্বরূপ জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় এরা হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে তসলিমার উপর ঝাপিয়ে পড়েছে; তাঁকে দেশ ছাড়া করে তবেই স্বস্তি পেয়েছে। এই কাজে তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তিকে সহযোগী হিসাবে কাছে পায়; যা বেগম রোকেয়ার আমলে দুঃসাধ্য ছিল। তখন উপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের

ক্ষমতায় ছিল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা, আর বর্তমানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল নামকাওয়াস্তে। বিশ শতকের প্রথমপাদে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। হিন্দু কলেজে থেকে পাশ করা মধ্যবিত্ত ঘরের তরণ ইয়ং বেঙ্গলদের দোর্দণ্ড প্রতাপে রক্ষণশীল হিন্দু মধ্যবিত্তরা তখন নিজেদের ঘর সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছিল। অন্যেরটা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুসরৎ কোথায়? আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রশক্তি নিরবচ্ছিন্ন শাসন-শোষণের স্বার্থে ধর্মীয় বিতণ্ডায় পক্ষভুক্ত হতে অনাগ্রহী ছিল। ক্ষীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির লক্ষ্যে না পেয়েছে ‘জুজু’র ভয় দেখিয়ে আমজনতাকে কাছে টানতে, না পেয়েছে পাশে সহযোগী হিসাবে রাষ্ট্রশক্তিকে। অথচ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণ বা ইন্ধন ব্যতিরেকে এই শ্রেণীটি ঘরের বাইরে এককদম পা ফেলতেও অভ্যস্ত নয়। পক্ষান্তরে তসলিমার কালে বাংলাদেশে এই শ্রেণীটির ক্ষমতার তেজ চৈত্রের মধ্যগণগণস্থিত সূর্যের চেয়েও প্রখর। এদের আবেদন-নিবেদন রাষ্ট্রশক্তি শাসন-ক্ষমতার স্বার্থেই উপেক্ষা করতে পারে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থকে সমুন্নত ও নিরপদ্রব রাখার লক্ষ্যে এদের কথা মত সরকার দেশে অদৃষ্টপূর্ব ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং সেগুলোকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সহায়তা দেয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হওয়া জনগোষ্ঠী বর্তমান আধুনিক সামাজিক উপযোগিতার সাথে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে না পেরে উদ্বৃত্ত জনবল হিসাবে সমাজে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রপাগান্ডায় এরাই হয় স্বার্থবাদীদের স্বার্থ হাসিলের তুরূপের তাস। ধর্মীয় উগ্রতাকে সম্বল করে এরা সমাজ-সংস্কারেও প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করে। এদের হাত দিয়েই মুক্তবুদ্ধিচর্চাকারীরা কাফনের কাপড়, মৃত্যুর পরোয়ানা পায়, তসলিমা নাসরিনদের দেশ ছাড়তে হয়।

অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে, কোন পুরুষ শাসকের আমলে নয়, তথাকথিত নারীনেত্রীর সময়েই পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাবার জন্য তসলিমাকে স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে চিরনির্বাসনে যেতে হয়েছে। এখানে তসলিমার জায়গা নেই। না সরকার প্রধান, না বিরোধী দলীয় প্রধান (যাদের উভয়ই নারী) কেউ তাঁর পক্ষ নিয়েছে। কথিত মুক্তবুদ্ধিদারী লেখকরাও এই দায় এড়াতে পারেন না। এদের কতক তো তসলিমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, মামলা করে নিজেদের মুক্তবুদ্ধির (!) প্রমাণ রেখেছেন, মৌলবাদের সহায়ক হয়ে সেক্যুলার সেজেছেন। এই দেশটি যারা চায়নি তারাই এখন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিরুদ্ধমতের প্রতিবাদের কৌশল আমরা যেন এদের আচরণেই খুঁজে পাই। এই গ্লানি আর কতকাল বইবে? আশার আলোর রাত পোহাতে আর কত দেরি? আমাদের মধ্যে এমন কারো কি আবির্ভাব ঘটবে না যে বলবে :

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধারে বিক্ষ্যাচলা॥

‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ!

সৈকত চৌধুরী ও অনন্ত বিজয় দাশ

‘মিরাকল’ (miracle) বা অলৌকিকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রত্যেকেই কম-বেশি অবগত আছেন। মিরাকল বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে, যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্রষ্টার কুদরতি শক্তি, স্রষ্টার যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা, স্বর্গ-নরকের ধারণা, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন, পুরস্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ধর্মের বাইরে খুব সামান্য পরিসরে আরও কিছু মিরাকল প্রচলিত আছে, যেমন ভিনগ্রহের প্রাণী, ইউএফও, টেলিপ্যাথি, রেইকি, অতিন্দ্রীয় দৃষ্টি ইত্যাদি। তবে এ ধরনের মিরাকল পশ্চিমা বিশ্বে যে মাত্রায় প্রচলিত আছে আমাদের দেশে এখনো সেই রেশ পৌঁছায়নি; কারণ হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের এখানে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। ভিনগ্রহের প্রাণী বা ইউএফও সম্পর্কে তথ্য প্রচারের সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সম্পর্ক আছে।

প্রতিটি ধর্মই মিরাকলে ভর্তি। কোনো ধর্মই তাদের নিজেদের লৌকিক দাবি করে না। আজকের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি মিরাকলের ওপর আলোকপাত করা। তবে আলোচনাটিকে সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যায় করার জন্য আমরা কোরান এবং ইসলাম ধর্মের বাইরের আরো কিছু বিষয়কে ছুঁয়ে যাব।

বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নিম্নমুখী হওয়ায় এ দেশ মিরাকল বিকাশের উর্বর ভূমি। এ দেশে ধর্ম এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এত বেশি অন্ধ-আনুগত্য-বিশ্বাসের বিষয় যে, ধর্ম ছাড়া তাদের পক্ষে এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অথচ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে বা জড়িয়ে কোনো কিছু শোনানো হলে, তারা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। জ্যোতিষী, পীর-ব্যবসা এ কারণেই টিকে আছে। শহরাঞ্চলে কম থাকলেও গ্রামে-গঞ্জে ভূত-পেত্নী-পরী-বাণ মারা-জাদু করা-মারণ-উচাটন-পানি পড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। নব্বইয়ের দশকে ইরাকের কুয়েত দখলের পর যখন আমেরিকার সাথে ইরাকের যুদ্ধ চলছিল, ঐ সময় একদিন খবর ছড়ালো আকাশে সাদ্দামকে দেখা যাচ্ছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকাশে সাদ্দামকে দেখার জন্য; রাস্তাঘাটে জ্যাম লেগে গেল, বাড়ির ছাদে লোকে-লোকারণ্য। ইরাক-আমেরিকার ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান যাই হোক, বাংলাদেশের বেশিরভাগ

মানুষ প্রায় সবাই ইরাকের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। সাদ্দাম হোসেনের জনপ্রিয়তা তখন বাংলাদেশীদের কাছে তুঙ্গে। মানুষের ঐ দুর্বল অনুভূতিকে পুঁজি করে যে বা যারাই এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল সাথে সাথেই এই খবর গণহিস্টোরিয়ায় আক্রান্ত করে। মানুষের প্রতিদিনকার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এক নিমিষেই রহিত হয়ে যায়। শুরু হয় উন্মাদনা। পরবর্তীতে (ইরাকের পরাজয় যখন আসন্ন) এমন গুজবও ছড়িয়েছিল ফেরেশতারা সাদ্দাম বাহিনীকে সহায়তা করা জন্য দলে দলে আকাশ থেকে ইরাকের দিকে ছুটে যাচ্ছেন!

প্রতিটি মিরাকলই গুজবের সমষ্টি। কাল্পনিক। অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। মূল তথ্য বা ঘটনার বিকৃতি হয়ে থাকে নানাভাবে। মিরাকলের প্রতি সাধারণ মানুষের পক্ষপাত থাকলেও বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই। যুগে যুগে কিছু মিরাকলের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন একটা সময় ছিল সূর্য ও চন্দ্রকে ‘জীবন্ত অলৌকিক সত্তা’ ভেবে পূজা করা হতো। কিন্তু চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণের পর অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী কতিপয় মানুষের এই ‘অলৌকিক চন্দ্র-সূর্য’ বিশ্বাসে হেঁচট লেগেছে; বাধ্য হয়েছেন গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত পূর্বের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসই হচ্ছে মিরাকল মেনে নেওয়া। বাংলা ভাষার একটি সাধারণ বাগধারা হচ্ছে ‘তিলকে তাল করা’। কিন্তু মিরাকল বাস্তবতাকে শুধু ‘তাল’ করে না, কুমড়ো বানিয়ে ছাড়ে! বিখ্যাত স্কটিস দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর ‘An Inquiry Concerning Human Understanding’ গ্রন্থে মিরাকল বা অলৌকিকতা বলতে বুঝিয়েছেন: “A miracle is a transgression of a law of nature by a particular volition of the Deity, or by the interposition of some invisible agent” মানুষ কেন মিরাকল বিশ্বাস করে, তার কারণ বহুমাত্রিক। একটি কারণ হতে পারে, যতদিন মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ধর্মগ্রন্থের বাণীকে অপৌরুষেয় বলে বিশ্বাস করবেন, ততদিন ‘মিরাকল’ ভাবনা মুলার মত মানুষের মনে ঝুলে থাকবে।

বিজ্ঞান কি ‘মিরাকল’ বা অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে? কিংবা বিজ্ঞান কি কোনো কিছুকে ‘মিরাকল’ বলে ঘোষণা করতে পারে? মোটেই না। সহজ কথায় যা লৌকিক নয়, তাই অলৌকিক। ‘মিরাকল’ বলতে স্পষ্টই বোঝায় প্রাকৃতিক নিয়মের (Laws of Nature) পরিপন্থী কোনো কিছু। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ লৌকিক, বস্তুবাদী। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে ঘটনা বা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে ‘লৌকিক’ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা মেথডের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান মানে কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে (পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূরত্ব, সূর্যের দূরত্ব, পৃথিবীর বয়স, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য, ইত্যাদি) জানা বা চিহ্নিত করা বোঝায় না; বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Nature of Science) সাথে সম্পর্কিত; যথা বৈধ-প্রমাণের বৈশিষ্ট্য (the criteria of valid evidence), অর্থবোধক গবেষণা নক্সা (the design of meaningful

experiments), সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় (the weighing of possibilities), গবেষণার জন্য গৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ (the testing of hypothesis), উপযোগী তত্ত্ব গঠন (the establishment of useful theories) ইত্যাদি—যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা সম্পর্কে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানই আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মের রাশি। বিজ্ঞান ছাড়া এই প্রাকৃতিক আইন বোঝার চেষ্টা অবাস্তব এবং ভ্রান্তও বটে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি (Method) রয়েছে, যেমন : অবরোধ (Deductive) পদ্ধতি, আরোহ (Inductive) পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফলে অভিন্নতা (Replicability), মিথ্যা প্রতিপন্যকরণ (Falsifiability) ইত্যাদি। বিজ্ঞানের এই প্রতিটি পদ্ধতিরই আবার কিছু মৌলিক নীতি (Principle) রয়েছে, যেমন : সংজ্ঞা নির্ধারণ, কার্য-কারণ সম্পর্ক (Cause and Effect relationship), গবেষণার জন্য সংগৃহীত ডেটা (Data) বা উপাত্তের মধ্যে স্ববিরোধিতা-আত্মবিরোধিতা না থাকা (Law of non self-contradiction), একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে (Law of uniformity of nature), কারণগুলো অবশ্যই বোঝা যাবে ইত্যাদি। উল্লেখ্য ধর্মগ্রন্থের বাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি মাত্র আয়াত বা শব্দগুচ্ছকে নিয়ে ডজন-ডজন ব্যাখ্যাকার ডজন-ডজন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, নিজস্ব ভিন্নমত ব্যক্ত করেন, ফলে একই আয়াতে বা শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ‘গড ইন দ্যা গ্যাপ্‌স’ পূরণ করে কেউ কেউ উত্তর দেন, ‘এর আসল অর্থ একমাত্র স্রষ্টাই জানেন, স্রষ্টাই সর্বজ্ঞ।’

কোনো একটি গবেষণার জন্য সংগৃহীত হাজার হাজার উপাত্তের মধ্যে যদি একটি উপাত্তের সাথে অন্যগুলোর আত্মবিরোধিতা থাকে, কোনো একটি উপাত্ত যদি বিশ্লেষণের সময় ভুল প্রমাণিত হয়, কিংবা উপাত্তগুলো এমন যে ‘মিথ্যাপ্রতিপন্যকরণ’ করার সুযোগ নেই তখন গোটা গবেষণাটাই খারিজ হয়ে যায়। ‘রিসার্চ প্রবলেম’ পরিবর্তন করতে হয়। আবার, গবেষণার জন্য যে প্রবলেম (গবেষণার বিষয়) বেছে নেওয়া হল, সেই প্রবলেমের টার্মগুলো যদি এমন হয় ‘কার্যকরী সংজ্ঞা’ (Operational definition) নির্ধারণ-ই করা যাচ্ছে না বা ভাসাভাসা-অস্পষ্ট থাকে তবে ‘গবেষণা’ প্রথম ধাপেই বাতিল হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ‘লৌকিক’ বলতে বুঝায় যে বিষয় বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালাকে অতিক্রম করে না এবং বিজ্ঞান তার পদ্ধতির মাধ্যমেই ঐ বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-উদ্ঘাটন করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন, তাই তাদের কাছে যে বিষয় বা ঘটনা সাধারণের অসাধ্য, (কাল্পনিক বক্তব্য) পূর্বের চেনা জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই ‘অলৌকিক’ বলে বিশ্বাস করেন। যেমন নবী মুহাম্মদের মিরাজে

গমন।

ইদানীং কিছু কৌশলী ধর্মবাদী তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের বাণী মেলানোর জন্য যত চালাকির দরকার হয়, সেগুলোর কোনোটাই বাদ রাখছেন না। কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনে এই আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে, ‘মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞান, অজানাকে জানার জন্য বিজ্ঞান ছাড়া কোনো উপায় নেই, বিজ্ঞান মানবীয় আবেগ নিরপেক্ষ, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।’ তাই ধর্মকে ভবিষ্যতের বাজারে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের কোলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বাণী বা অলৌকিকতা আর বিজ্ঞানের কর্মপ্রক্রিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী। একটার সাথে আরেকটার সমন্বয়ের কোনো সুযোগই নেই; সংঘাতের ইতিহাস তো খুবই পুরানো। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্তহীন জাড়াউড়া করে যাচ্ছেন কতিপয় অসাধু ধর্মবাদী। উদাহরণ, রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত কোরানের মিরাকল উনিশ।

এই প্রবন্ধে আল-কোরানের কথিত ‘উনিশ’ মিরাকল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যথাস্থানে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা আছে। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধটির বক্তব্য, তথ্য, যুক্তি গ্রহণ বা বর্জনের আগে অবশ্যই নিজে যথাসম্ভব যাচাই করে নিবেন; খোলা মনে বিচার করবেন। শুধুমাত্র ‘পূর্ববিশ্বাস বা আবেগের বশবর্তী হয়ে’ বর্জন করা কিংবা ‘বিরুদ্ধ মত’ হিসেবে আমাদের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করা এই প্রবন্ধের কাজক্ষিত উদ্দেশ্য নয়। জনমানসে যৌক্তিক চেতনা-বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশই উদ্দেশ্য।

(১) ইংরেজিতে ‘Pareidolia’ বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, অর্থ হল : এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা অস্পষ্ট (vague) ও এলোমেলো উদ্দীপনার (random stimulus) কারণে ভ্রান্ত অনুভূতি বা Illusion-এর সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোনো একটির জন্য ইলিউশন হতে পারে। তবে এই ইলিউশনের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানব মনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা যা দেখি বা উপলব্ধি করি, তা তৎক্ষণাৎ (অনেক সময় অজান্তেই) আমাদের চেনা জগতের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি-তুলনা করি। হঠাৎ করে নতুন কিছু দেখলে পূর্বের দেখা কোনো বিষয়ের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য খুঁজার চেষ্টা করি; যেমন দুটি বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে যদি এর নীচে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটি ছোট রেখা টানা হয়, অনেকের কাছেই একে ‘মানুষের মুখমণ্ডলের অবয়ব’ বলে মনে হবে। অথচ এই চিত্রে মানুষের মুখমণ্ডলের সাথে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রায়শই মানুষ চিন্তায় বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

তাই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা কোনো কিছু দেখলে অনেক সময় পরিচিত কোন জিনিস বা বিষয়ের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় তুলোর মত টুকরো টুকরো ভেসে বেড়ানো মেঘমালায় বুঝি কারো মুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। কখনোবা চাঁদের গায়ে দেখা যায় কারও ছবি। আকাশে ইউএফও কিংবা মঙ্গল গ্রহে মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে, এরকম প্রচুর বানোয়াট ছবি বাজারে রয়েছে। ২০০২ সালের ১৮ জুলাই ব্রাজিলের এক নাগরিক দাবি করলেন তার বাড়ির জানালার কাছে ‘কুমারী মাতা’ মেরির ছবি ফুটে ওঠেছে। বছর খানেক আগে কোন এক রাত্রিবেলা শুনা গেল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দাবি করছেন চাঁদের গায়ে ‘শিবের অবতার’ লোকনাথের ছবি দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কী হৈচৈ! ২০০৬ সালের পহেলা জুন রব নাভাস নামের এক পাকিস্তানি মৎসজীবী এক ধরনের সামুদ্রিক মাছের (rabbit fish) পেটের মধ্যে আরবি অক্ষরে ‘আল্লাহ’ লেখা দেখতে পেলেন। দুবাইয়ের বিখ্যাত মাছের বাজার Shindagha-এ পরবর্তীতে ঐ মাছটি প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসা হয়।^২ এর আগে ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে সহস্রাধিক মানুষ জড় হলেন একটি সদ্য-ভূমিষ্ট মেঘ শাবক দেখার জন্য। শাবকটির মালিক ইয়াহিয়া আতরাস দাবি করছেন, ‘সদ্য ভূমিষ্ট মেঘ শাবকটির গায়ের একদিকে আরবি হরফে ‘আল্লাহ’ লেখা এবং অন্যপাশে ‘মুহাম্মদ’ লেখা।’^৩ ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর এ্যালেন স্টোন নামের এক ব্যক্তি তার বাড়ির পিছনের আঙিনাতে একটি পাথর কুড়িয়ে পেলেন, পাথরের অস্পষ্ট খাজের মধ্যে আঁকাবাঁকা রেখা রয়েছে।^৪ অদ্রলোক দাবি করতে লাগলেন, এটা যীশুর প্রতিকৃতি! একই বছরের ১৫ অক্টোবর তারিখে ভ্যাটিকেন টিভি চ্যানেল দুটি ছবি পাশপাশি দেখিয়ে গুজব ছড়ালো : ‘কবরের পাশে আঙন জ্বলছে; সেই আঙনের লেলিহান শিখা বাতাসের কারণে এঁকেবেঁকে গেছে। আঙনের শিখাটি পোপ দ্বিতীয় জন পলের আবছায়া প্রতিকৃতি বলে মনে হচ্ছে।’^৫ উপরের এই সবগুলো ঘটনাই Pareidolia উদাহরণ। মানুষের দুর্বল অনুভূতির স্থান বলে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গুজব ছড়ায় বেশি, আর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে বেশিরভাগ সময় এই সব গুজবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয় না। জানুয়ারি পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি বা আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বরের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার ওপর রয়েছে ধর্মীয় উপাসনার রীতিকে অবুঝ মনের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ফলে শৈশবেই মানুষের মনে বা চিন্তায় ঈশ্বর-ভগবান-আল্লাহ সম্পর্কে এক ধরনের ‘প্যারাডাইম’ গড়ে ওঠে। অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব কস্মিনকালে না থাকলেও ‘পরিস্থিতির শিকার’ মানুষ বাধ্য হয় অলৌকিকতা দেখতে!

(২) Ernest Vincent Wright (১৮৭৩?-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক ‘Gadsby: Champion of Youth’ (Wetzel Publishing Co., 1939) নামে একটি

উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার একশত দশটি শব্দ দিয়ে গোটা উপন্যাস লেখা হলেও লেখক কোথাও একটি বারের জন্য ইংরেজি ‘E’ স্বরবর্ণটি ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ ইংরেজিতে ‘E’ অক্ষর ব্যবহার করে যত শব্দ (he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate, etc.) আছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি ২৫টি অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বাক্য তৈরি করেছেন; অথচ এর ফলে ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতা বা ঘাটতি কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। নীচে ‘Gadsby’ উপন্যাসটির প্রথম প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হল^৬ :

“If youth, throughout all history, had a champion to stand up for it; to show a doubting world that a child can think; and, possibly, do it practically; you wouldn't constantly run across folks today who claim that "a child don't know anything." A child's brain starts functioning at birth; and has, amongst its many infant convolutions, thousands of dormant atoms, into which God has put a mystic possibility for noticing an adult's act, and figuring out its purport.”

লেখকের এই কৃতিত্ব আর দক্ষতার জন্য তিনি কিন্তু এর জন্য কোনো ‘মিরাকল শক্তি’-এর বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেননি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অনেক ‘অসম্ভবকে’ই ‘সম্ভবের গণ্ডি’তে আবদ্ধ করা সম্ভব।

(৩) গণিত নিয়ে যাদের অল্প-বিস্তর লেখাপড়া আছে তারা অবশ্যই ‘ফিবোনাক্কি রাশিমালা’ সম্পর্কে অবগত আছেন। এই রাশিমালা আমাদের সামনে প্রকৃতি মাতার অপার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। ‘ফিবোনাক্কি রাশিমালা’র জন্মদাতা ইতালির নাগরিক Leonardo Pisano (১১৭৫-১২৫০) মৃত্যুর আগে একদা তাঁর তৈরি রাশিমালা নিয়ে জিজ্ঞাস্য হলে রহস্য করে বলেছিলেন, ‘প্রকৃতির মূল রহস্য এই রাশিমালাতে আছে।’^৭ কি সেই রহস্য? সেটা জানার আগে এক ঝলক রাশিমালাটা দেখে নিই : আমাদের প্রচলিত ডেসিমেল পদ্ধতির রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। এভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক রাশিমালা হচ্ছে ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ইত্যাদি। আর ফিবোনাক্কি রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭ ... ইত্যাদি। অর্থাৎ ফিবোনাক্কির রাশিমালাটা তৈরি হয়েছে প্রথম দুইটি রাশির যোগফল সমান পরবর্তী রাশি; ০ + ১ = ১, ১ + ১ = ২, ২ + ১ = ৩, ৩ + ২ = ৫, ৫ + ৩ = ৮, ৮ + ৫ = ১৩, ৮ + ১৩ = ২১ ইত্যাদি। এভাবে অদ্ভুত নিয়মে তৈরি এই রাশিমালার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা : এ রাশিমালার যে কোন চারটি সংখ্যা নেওয়া হলে প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফলের সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার

যোগফল বিয়োগ করা হলে ফলাফল অবশ্যই সবসময় ঐ চারটি সংখ্যার প্রথমটি হবে। ধরা যাক চারটি ফিবোনাচ্চি রাশি ২, ৩, ৫, ৮। প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফল (২ + ৮) ১০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল (৩ + ৫) ৮ বিয়োগ করলে বিয়োগফল হচ্ছে ২, যা কিনা আমাদের ধরে নেওয়া চারটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যা। আমরা সাধারণত ডেসিমেল পদ্ধতিতে হিসেব করে এতো অভ্যস্ত যে, কোন কিছু গণনায় ডেসিমেল সংখ্যা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) দ্বারাই কোন কিছু হিসেব করে থাকি; যেমন ঘড়ি দ্বারা সময় নির্ণয়, টাকা-পয়সার লেনদেন, বাজার-সদাই ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে প্রকৃতির নানা স্তরে ফিবোনাচ্চি রাশিমালার ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে, যেমন : সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি বিন্যাসে, ক্যাকটাস গাছের পুরুত্বে, পাইন গাছের মোচায় ফিবোনাচ্চি রাশিমালার সংখ্যা পাওয়া যায়। শামুকের খোলসে যে স্পাইরাল দেখা যায় সেখানেও ফিবোনাচ্চির রাশিমালার উপস্থিতি রয়েছে। শীতের সময় আমাদের দেশে সুদূর সাইবেরিয়া হতে ‘অতিথি পাখি’ ঝাকে ঝাকে আসে। পাখিদের নিজেদের অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দিলে স্থান পরিবর্তন করে তারা অন্য শৈত্য এলাকায় গমন করে। এই অতিথি পাখির ঝাক গণনা করে দেখা গেছে তাদের একেকটি ঝাকে ২১টি পাখি থাকে, ২২ বা ২৩টি পাখি থাকে না। মজার ব্যাপার ফিবোনাচ্চি সিরিজে ২১ সংখ্যাটি রয়েছে, ২২ বা ২৩ সংখ্যা নেই। মৌমাছির জীবনযাত্রায়ও রয়েছে ফিবোনাচ্চি রাশিমালার উপস্থিতি। মৌমাছির সাধারণত কলোনি করে থাকে। প্রতিটি কলোনিতে একটি পুরুষ মৌমাছির পিতা-মাতা ১ জন, দাদা-দাদী ২ জন, প্রপিতা-মাতা ৩ জন, প্রপিতা-মাতার পিতা-মাতা ৫ জন এবং এদের পিতা-মাতা ৮ জন। এভাবে ক্রমেই মৌমাছির বংশতালিকায় ফিবোনাচ্চি রাশিমালার সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়।

সুখের সংবাদ প্রকৃতির এতো বৈচিত্র্যময় স্থানে ফিবোনাচ্চি রাশিমালার উপস্থিতি দেখা গেলেও এখন পর্যন্ত এই রাশিমালাকে এর জন্মদাতা ফিবোনাচ্চি বা অন্য কেউ ‘অলৌকিক রাশিমালা’ বলে দাবি করেননি।

(৪) ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার পর সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে ‘১১’ সংখ্যাটি নিয়ে একটি অতিলৌকিক-আধোভৌতিক পটভূমি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। পটভূমির উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন ইজরাইলের সাবেক গুপ্তচর, সাবেক জাদুকর এবং বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সন্ধান হিসেবে (কু)খ্যাত ইউরি গ্যালার^৪; তিনি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরপরই সবাইকে (বিশেষ করে আমেরিকানদের) উপদেশ দান করেন প্রত্যেকেই যেন প্রতিদিন ১১ সেকেন্ড করে প্রয়োজন মত প্রার্থনা করেন।^৫ কারণ তাঁর মতে : ‘১১ হচ্ছে একটি রহস্যময় সংখ্যা, এর মধ্যে অপ্রাকৃত গোপন নানা তথ্য লুকানো রয়েছে এবং এ সংখ্যা দুনিয়ার পার্থিবতা এবং অপার্থিবতার সংযোগ সেতু।’ ইউরি গ্যালার শুধু বক্তব্য দান করেই ক্ষান্ত হননি, ৯/১১-এ ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার সাথে ‘১১’ সংখ্যাটির একটি সম্পর্ক আবিষ্কার

করেন। নীচে তাঁর আবিষ্কৃত সম্পর্কটির উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হল^৬ :

- ❖ সন্ত্রাসী হামলার তারিখ ৯/১১ : ৯+১+১=১১।
- ❖ ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিন : ২+৫+৪=১১।
- ❖ ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে।
- ❖ ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১+১+৯=১১। রাষ্ট্রীয় কোডটি উল্টো করে গণনা করলে হামলার তারিখটি আবার সামনে চলে আসে। [উপরোক্ত তথ্য মিথ্যা। ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৮ অর্থাৎ ৯+৮=১৭ এবং ইরাকের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৪ অর্থাৎ ৯+৬+৪=১৯, সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৬ অর্থাৎ ৯+৬+৬=২১]
- ❖ আক্রমণস্থল টুইন টাওয়ার দেখতে ইংরেজি ১১-এর মত।
- ❖ প্রথম আক্রমণকারী বিমান : ‘ফ্লাইট-১১।’ আমেরিকার এয়ারলাইনকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে ‘AA’ বলা হয়। এই ‘AA’ ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, পাশাপাশি সাজালে ১১।
- ❖ ইংরেজি ‘Afghanistan’ শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- ❖ ইংরেজি ‘New York City’ শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে। আমেরিকাতে ‘New York’ ১১তম রাজ্য। [নিউইয়র্কের সাথে ‘City’ শব্দ জুড়ে দিয়ে ১১টি অক্ষর গণনা করা হয়েছে, কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে ‘Country’ শব্দ ধরা হয়নি।]
- ❖ ইংরেজি ‘The Pentagon’ শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- ❖ এছাড়া ইংরেজি ‘George W. Bush’, ‘Bill Clinton’, ‘Saudi Arabia’, ‘Colin Powell’ শব্দগুলিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।

(৫) সংখ্যা দিয়ে বিন্যাস-সমাবেশ করে ধর্মগ্রন্থকে অলৌকিক দাবি করার অভ্যাস বেশ পুরানো। রুশ বংশোদ্ভূত গণিতবিদ এবং খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক ড. ইভান পেনিন (১৮৫৫-১৯৪২) একদা দাবি তুলেছিলেন বাইবেল ‘ধর্মগ্রন্থটি ৭ সংখ্যা দ্বারা চমৎকারভাবে আবদ্ধ।’^৭ বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) প্রথম আয়াত : ‘In the beginning God created the heavens and the earth.’ (সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করলেন)। (জেনেসিস, ১:১)। উক্ত আয়াতে হিব্রু ভাষায় ৭টি শব্দ আছে এবং ২৮টি অক্ষর আছে (৭×৪)। তিনটি বিশেষ্য (noun) রয়েছে যথা ঈশ্বর (God), আসমান (heavens), জমিন (earth)। হিব্রু ভাষায় যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই, বর্ণগুলোর যোগফলই হচ্ছে সংখ্যা মান (numeric value)। তাই এই আয়াতের তিনটি বিশেষ্যের সংখ্যামান হচ্ছে ৭৭৭ (৭×১১১)। আয়াতটির ক্রিয়াপদ ‘created’-এর সংখ্যা মান হচ্ছে ২০৩ (৭×২৯)। আয়াতটির Object হচ্ছে প্রথম তিনটি শব্দ ‘In the beginning’; ১৪টি বর্ণ দিয়ে গঠিত (৭×২) এবং বাকি চারটি শব্দও (Subject) ১৪টি

বর্ণে গঠিত। হিব্রু ভাষায় আয়াতটির চতুর্থ ও পঞ্চম শব্দদুটিও ৭টি বর্ণে গঠিত। ক্রিয়াপদ 'created'-এর প্রথম, মধ্যম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৩ (৭×১৯)। আয়াতের সব কটি শব্দের প্রথম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৯৩ (৭×১৯৯)। বাইবেলের মধ্যে লেখক হিসেবে ২১ জন ব্যক্তির নাম রয়েছে (৭×৩)। হিব্রু ভাষায় তাঁদের নামের সংখ্যা মান ৭ দ্বারা বিভাজ্য। এই ২১ জনের মধ্যে ৭ জনের নাম রয়েছে নিউ টেস্টামেন্টে, যথা : Moses, David, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea and Joel। এই ৭টি নামের সংখ্যা মান হল ১৫৫৪ (২২২×৭)। ডেভিড নামটি পাওয়া যায় ১১৩৪ বার (১৬২×৭)। বাইবেলে 'seven-fold' শব্দগুচ্ছটি (phrase) ৭ বার রয়েছে, '৭০' এসেছে ৫৬ বার (৭×৮), ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য ৭ দিন সময় নিয়েছেন, ইজরায়েলিরা ৭ দিনে ৭ বার মার্চ করেছে জেরিকোর দিকে। শেষ গ্রন্থ 'প্রকাশিত কালাম' (Revelation)-এ রয়েছে ৭ জন পবিত্র আত্মা ৭টি তূর্য (trumpet) নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাছাড়া রয়েছে ৭টি স্বর্ণের বাতির স্ট্যাণ্ড, ৭টি চার্চ, ৭টি তারা, ৭জন রাজা, ৭টি পাহাড়।^{১২} আবার Psalm 118 অধ্যায় সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে, এটি বাইবেলের মাঝের অধ্যায়। Psalm 117 অধ্যায়টি সর্বকণ্ঠি এবং Psalm 119 অধ্যায়টি সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়। Psalm 118 অধ্যায়ের আগে ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে এবং Psalm 118 অধ্যায় পরে আরো ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে।^{১৩}

স্বীকার করছি, আমরা এই প্রবন্ধের লেখক দুজনের কেউই হিব্রু ভাষা জানি না। তাই উপরোক্ত হিব্রু ভাষার দাবিগুলো যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খ্রিস্টানদের দাবিকৃত 'মিরাকল ৭' ভাষ্য তুলে দেওয়ার কারণ হল পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটানো, তাদের চিন্তার খোরাক যোগানো।

এক নজরে রাশেদ খলিফা^{১৪}

জন্ম : নভেম্বর ১৯, ১৯৩৫ (মিশর)

মৃত্যু : জানুয়ারি ৩১, ১৯৯০ (বয়স ৫৪)

জাতীয়তা : মিশরীয়-আমেরিকান

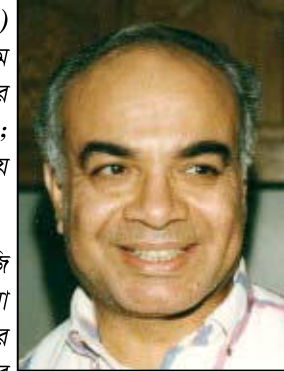
পেশা : জৈব-রসায়নবিদ

ধর্মীয় বিশ্বাস : ইসলাম, United Submitters International (USI)

জীবন-বৃত্তান্ত : রাশেদ খলিফা (Rashad Khalifa) কায়রোর এইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৫৯ সালে আমেরিকাতে আসেন এবং ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন জৈব-রসায়নবিদ্যায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি প্রায় বছর খানেক লিবিয়া সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে রসায়নবিদ

হিসেবে জাতিসংঘের অধীনে ভিয়েনাতে শিল্পউন্নয়ন সংস্থায় যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯৮০ সালের দিকে সিনিয়র রসায়নবিদ হিসেবে আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের সরকারি রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশটির মত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, নিজে কোরান অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে এবং ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থের নাম : 'The Computer Speaks: God's Message to the World'। রাশেদ খলিফার লেখা গ্রন্থ, আর্টিকেল বা গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ঠিকানায় : International Community of Submitters (ICS), P.O. Box 43476, Tucson, AZ 85733 এবং ওয়েব সাইট <http://www.submission.org>।

রাশেদ খলিফা ইসলাম ধর্মে 'United Submitters International' নামে নতুন একটি ধর্মীয় গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অনুসারীরা নিজেদের 'মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দেবার পরিবর্তে 'Submitter' এবং ইসলাম শব্দের পরিবর্তে 'Submission' শব্দ ব্যবহার করেন। রাশেদ খলিফা ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস : (১) আল-কোরানই একমাত্র গ্রহণীয় ধর্মগ্রন্থ। তবে এটিও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। (২) নবী মুহাম্মদের সূন্নাহ পুরোপুরি বাতিল; ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) যে হাদিসগুলো সূন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ সেগুলোও বাতিল। (৪) মুহাম্মদের পরে ইসলাম (৫) তাঁরা নবী ইব্রাহিমের প্রার্থনা করে থাকেন^{১৫}; বিশ্বাসযোগ্য উৎস নেই যে প্রার্থনা করতেন।



রাশেদ নিজের ইংরেজি 'সুরা ফুরকান', 'সুরা 'সুরা তাক্বির'-এর ঢুকিয়ে তাঁর বক্তব্যের

আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কোরানের আয়াতগুলি হচ্ছে : We have sent you (Rashad) as a deliverer of good news, as well as a warner. [25:56]^{১৬} Most assuredly, you (Rashad) are one of the messengers. [36:3]^{১৭} Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!?" If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts. [42:24]^{১৮} এবং Your friend (Rashad) is not crazy. [81:22]^{১৯}। অথচ ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির-এর মত বিশ্বখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক^{২০} ও আমাদের দেশের বাংলা

অনুবাদের কেউই এই আয়াতগুলিতে ‘Rashad’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি দাবি করেন : “ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ ‘শেষ নবী’ (last Prophet) হলেও শেষ রসুল (last messenger) ছিলেন না। কোরানের ৩৩ নং সূরা আহজাবের ৪০ নম্বর আয়াতে মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী বলা হলেও ‘শেষ’ রসুল বলা হয়নি। আল্লাহ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্যে থেকে রসুল মনোনীত করেন। (সূরা ২২, হজ, আয়াত ৭৫)।” এরপর নিজেকে ‘রসুল’ বলে দাবি করে কোরানের সূরা আল-ই-ইমরান-এর ৮১ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করেন, যেখানে আল্লাহ ভবিষ্যতে একজন রসুল পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আর সূরা তওবার শেষের দুটি আয়াতকে (১২৮ ও ১২৯) ‘মিথ্যা দাবি’ করে তাঁর নিজের অনুবাদের কোরান থেকে বাদ দিয়ে দেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, রাশেদ খলিফার এসব দাবি-বক্তব্য সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে কটরপন্থীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে রাশেদ প্রথাগত মুসলমানদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছান।

১৯৬৯ সালের দিকে রাশেদ খলিফা কোরান শরিফের শব্দমালা, অক্ষর-বর্ণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে ঘোষণা করেন : তিনি কোরানের ৭৪ নং সূরা মুদাছির-এর ৩০ নং আয়াতে উল্লিখিত ‘১৯’ থেকে এমন একটি গাণিতিক খিওরি আবিষ্কার করেছেন যা কোরানকে একদম ‘অলৌকিক’ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে; যেমন তাঁর দাবি হচ্ছে : ‘কোরানের সূরা সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬০৪৬, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। কোরানে উল্লেখ করা ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ শব্দের মধ্যে ১৯টি অক্ষর রয়েছে। কোরানের প্রথম ওহি ৯৬ নং সূরা আলাক-এ ১৯টি শব্দ রয়েছে, ঐ সূরা আলাকটি শেষের দিক থেকে গণনা করলে ১৯তম অবস্থানে রয়েছে; এবং সর্বশেষ ওহি (১১০) সূরা নাসর-এর প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।’ ইত্যাদি।^{১১}

রাশেদ খলিফার এই দাবি প্রথম দিকে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ‘Scientific American’-এ ‘কোরানের কৌশলী পাঠ’ বলে প্রথম মন্তব্য করেন আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ-বিজ্ঞানী মার্টিন গার্ডনার (Martin Gardner)। মার্টিন গার্ডনার পরে আরও বিস্তারিতভাবে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন।^{১২} তিন বছর পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে কানাডার ‘Council on the Study of Religion’ তাদের ‘Quarterly Review’ পত্রিকায় রাশেদ খলিফার আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করে : “an authenticating proof of the divine origin of the Quran.”

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রথম মিশরের ‘Akher Sa’a’ ম্যাগাজিনে রাশেদ খলিফার গবেষণার খবর প্রথম প্রকাশ করে। একই পত্রিকায় নভেম্বর ২৮, ১৯৭৩ এবং ৩১

ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ঐ গবেষণার আপডেট প্রকাশ করা হয়। এরপর সারা বিশ্বেই বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইয়ে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে ‘ইসলাম ধর্মের রসুল’ দাবিকারী রাশেদ খলিফার বিরুদ্ধে ১৬ বছরের এক মেয়েকে ‘যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ-উত্যক্ত’ করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিণীর দাবি, জাতিসংঘের একটি গবেষণা প্রজেক্টে কাজ করার সময় রাশেদ খলিফা তাঁর উপর ‘যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ’ চালিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে রাশেদ খলিফা আমেরিকার ‘National Academy of Science’-এর বিরুদ্ধে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের মামলা করেন ‘Science and Creationism’ নামক বিবর্তন তত্ত্বের ওপর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য, যে গ্রন্থে বলা হয়েছে, “Evolution is a Godless process.” পরবর্তীতে অবশ্য রাশেদ খলিফার এ মামলা কোর্টে টেকেনি।

১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারি আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের টুকসন মসজিদের ভিতর ৫৪ বছর বয়সী রাশেদ খলিফার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর সারা শরীরে ছুরি দিয়ে ২৯ বার জখম করা হয়েছিল এবং চেহারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে মুখমণ্ডল দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। রাশেদের হত্যাকারী হিসেবে আমেরিকার ‘জামাতুল ফুরকা’ নামের একটি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে।

কোরান সম্পর্কে রাশেদ খলিফার অভিমত হচ্ছে :

“কোরান হলো আল্লাহর ‘ফাইনাল টেস্টামেন্ট’। নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কোরানে মিথ্যা আয়াত ঢুকিয়ে বিকৃত করা হয়েছে, সময়ানুসারে কোরানের সূরা সাজানো হয়নি। খলিফা ওসমান কোরান সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন সাহাবিদের দিয়ে, তাঁরা ভুল করেছেন। হজরত আলী কোরান সংকলন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কোরানকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। তারপর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মারওয়ান ইবনে আল হাকাম (মৃত্যু ৬৫ হিজরি/৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) হজরত ওমরের কন্যা হাফসার কাছে রক্ষিত নবী মুহাম্মদের নিজ হাতে লেখা ‘প্রকৃত কোরান’ ধ্বংস করে ফেলেন। আজকে সারা বিশ্বে মোটামুটি একই স্ট্যান্ডার্ডের কোরান অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা তৈরি হয়েছিল মিশরের কায়রোতে ১৯২৪ সালে। হজরত ওসমানের সময়কার সংকলিত কোরানের দুটি কপি পাওয়া গেছে উজবেকিস্তান (তাশখন্দ শহর) এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর থেকে; এগুলি থেকে দেখা গেছে এখানেও মনুষ্যকৃত ভুল রয়েছে। ১৯২৪ সালের মিশরীয় সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হয়। এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ কোরানের আরেকটি সংস্করণ বের করেন। আজকে কোরানের সকল মাসহাফকে যে একই রকম বলে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। বিভিন্ন পার্থক্য নিয়ে পৃথক

রকমের কোরানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল।”^{২৩}

তাই বিকৃত হয়ে যাওয়া কোরানকে উদ্ধার করে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর জন্য নিজ উদ্যোগে রাশেদ কোরানের নতুন একটি অনুবাদ তৈরি করেন।

রাশেদ খলিফার কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য, নতুন ধর্মমত তৈরি, নিজেকে রসুল বানানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্টই ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও উনিশ মিরাকল সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি চমৎকার। কোরানে অলৌকিকতা রয়েছে বলে যে ‘হিসাব’ তিনি দেখিয়েছেন তা প্রথম দেখাতে মুসলমান-অমুসলমান অনেককেই বিভ্রান্ত করতে পারে। ছুট করে এই মিরাকলের পিছনের কারিগরি বোঝা কষ্টকর। রাশেদ খলিফার কোরানের ১৯ মিরাকল নিয়ে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যেমন : মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত ‘আল-কোরআন দ্য চ্যালেন্জ’ নামক দুই খণ্ডের বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম চ্যালেন্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল।^{২৪} লেখকের উচ্চ প্রশংসা করে বইটির প্রথমেই একটি অভিমত দিয়েছেন মাসিক *মদীনা*’র সম্পাদক, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন। ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত ‘কমপিউটার ও আল কুরআন’ নামক বইটিতে স্থান পেয়েছে ১৯-এর ম্যাজিক।^{২৫} আল-কোরআন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কোরানের একটি বাংলা অনুবাদ করেছেন।^{২৬} কোরানের বাংলা অনুবাদের প্রথমে তিনি রাশেদ খলিফার ১৯ ম্যাজিক হাজির করেছেন ভক্তিতে আপ্ত হয়ে। এছাড়া বিভিন্ন মফস্বল শহরের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, চটিবইয়ে এই ১৯ ম্যাজিকের গল্প বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের একটি মফস্বল শহরে বিজ্ঞান আন্দোলন করতে গিয়ে কত শতবার এই ‘১৯ ম্যাজিক’ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের এই প্রবন্ধটিতে রাশেদ খলিফা ঘোষিত ‘কোরানের উনিশ ভোজভাজি’ নিম্নোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করা হবে, যুক্তি দিয়ে উদ্ঘাটন করা হবে ‘কোরানের গ্রেট মিরাকল’ ৭৪:৩০ নং আয়াতের যথার্থতা।

রহস্যের চাবিকাঠি : কোরানের ৭৪:৩০ নং আয়াত

দাবি : “সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল-কোরানে উনিশ সংখ্যার ফর্মুলার কথা বলা হয়েছে।”

৭৪:৩০ নম্বর আয়াত : “আ’লাইহা তিসআ’তা আ’শারা”—অর্থাৎ ইহার উপর উনিশ। এ বাক্যাংশে ‘ইহার’ বা ‘তাহার’ কথাটি রয়েছে। এখন ‘ইহার’ বা ‘তাহার’ দ্বারা কী বা কাকে বোঝানো হচ্ছে জানতে হলে অবশ্যই এর আগের-পরের বাক্যগুলোতে ফিরে যেতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। মনে রাখতে হবে এ আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে নাখিল হয়নি। আর বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটা আয়াতকে এভাবে উপস্থাপন করলে কি দাঁড়ায়, দেখা যাক : ‘নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’ (১০৩:২)। এই আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে এর অর্থ যা দাঁড়ায় তা অর্থহীন এবং ঐ সুরার মূলভাবের

সাথে সাংঘর্ষিক। এবার এর আগের ও পরের আয়াত দেখি : ‘শপথ যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে।’ অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে সকল মানুষ নয় বরং যারা আল্লাহতে ঈমান আনেনি তারাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে কোরানের আয়াতগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে তা অনেক ক্ষেত্রেই কোরানের মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা যদি সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতটির অর্থ বুঝতে চাই তবে অবশ্যই এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াত আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে বিস্তারিতভাবে এখানে সুরা মুদাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ ও সেই সাথে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসিরকারকদের তফসির তুলে ধরা হলো :

(১) আল-কোরানের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির সুরা মুদাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত অনুবাদ করেছেন এভাবে :

074.027

YUSUFALI: And what will explain to thee what Hell-Fire is?

PICKTHAL: Ah, what will convey unto thee what that burning is!

SHAKIR: And what will make you realize what hell is?

074.028

YUSUFALI: Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!

PICKTHAL: It leaveth naught; it spareth naught

SHAKIR: It leaves naught nor does it spare aught.

074.029

YUSUFALI: Darkening and changing the colour of man!

PICKTHAL: It shrivelth the man.

SHAKIR: It scorches the mortal.

074.030

YUSUFALI: Over it are Nineteen.

PICKTHAL: Above it are nineteen.

SHAKIR: Over it are nineteen.

074.031

YUSUFALI: And We have set none but angels as Guardians of the Fire; and We have fixed their number only as a trial for Unbelievers,- in order

that the People of the Book may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith...

PICKTHAL: We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number have We made to be a stumbling-block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith...

SHAKIR: And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the book may be certain and those who believe may increase in faith...

ইংরেজি অনুবাদকগণ স্পষ্টই বলেছেন সুরা মুদাচ্ছিরে ৩০নং আয়াতটিতে শুধুমাত্র দোজখের উনিশজন ফেরেশতার সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

(২) উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আশরাফ আলি খানভী রচিত ‘বয়ানুল কোরআন’-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে রয়েছে^{১৭}:

“আপনি জানেন কি দোজখ কি বস্তু? (২৭) উহা (কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করার পর অদক্ষ) থাকিতে দিবে না—এবং (অনাগত কোনও কাফেরকে বাহিরে) ছাড়িবে না। (২৮) উহা (পোড়াইয়া) দেহের সৌষ্ঠব বিকৃত করিয়া দিবে। (২৯) উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন। (৩০) আর আমি দোজখের কর্মচারী কেবল ফেরেশতাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর আমি তাহাদের সংখ্যা এইরূপে রাখিয়াছি যাহা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, (আর এই জন্য) যেন বিশ্বাস করে—কিতাবীগণ এবং ঈমানদারদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। (৩১)।” (সুরা ৭৪, মুদাচ্ছির, আয়াত ২৭-৩১)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নং আয়াতের অনুবাদে উল্লেখ করা আছে : ‘উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন।’ অর্থাৎ দোজখের বর্ণনার মধ্যে যে ‘উনিশ’ রয়েছে তা কোনো কোরানের অলৌকিক ফর্মুলা বা কোনো কোড নয় বরং দোজখের শাস্তিপ্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যা ৩১নং আয়াত পড়লেই বুঝা সম্ভব।

এবার এই আয়াতগুলির শানে নুজুল লক্ষ্য করি :

“৩০নং আয়াতটি শ্রবণ করিয়া আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফের বলিয়া উঠিল, হে কোরাইশ জাতি! তোমরা

ইহাতে ভীত হইও না। আমি দশজন ফেরেশতাকে ডান বাহু দ্বারা এবং নয়জনকে বাম বাহু দ্বারা পরাজিত করিয়া দিব। অন্য রেওয়াজে আছে, এই আয়াতটি শুনিয়া আবু জাহাল বলিল, ভয় কিসের? ফেরেশতার মাত্র উনিশজন। তোমরা সংখ্যায় অনেক রহিয়াছ। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফেরেশতাকে হঠাইয়া দিতে পারিবে না? এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়। (দ্রষ্টব্য: ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৯৪২)।

শানে-নুজুল থেকে এটা পরিষ্কার যে রাশেদ খলিফা প্রদত্ত ‘মিরাকল উনিশ’ আয়াতটিতে দোজখের শাস্তিপ্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথাই বলা হয়েছে এবং এটা বলার জন্যই এ আয়াতগুলো রচিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কোরানে যদি কোনও সংখ্যার ফর্মুলা (মিরাকল বা ম্যাজিক ইত্যাদি) থাকে তবে তা দোজখের মধ্যে বর্ণিত হবে কেন? এটা তো একটি সুসংবাদ, যা বেহেশতের বর্ণনাতে থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

(৩) আলহাজ্জ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী ‘বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ’-এ সুরা মুদাচ্ছির-এর ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে^{১৮} :

“(২৭) তুমি কি বুঝ?—এই ছাকার কি? (২৮) এমন আশুন—যা কিছুই বাকী রাখবে না, এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে ঝলসে দেবে। (৩০) সেখানে উনিশ জন রয়েছে। (৩১) ফেরেশতাদের ছাড়া কাউকে জাহান্নামে মোতায়ন করিনি। আমি তাদের সংখ্যা স্থির করেছি-শুধু কাফিরদের পরীক্ষার জন্য!”

(৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত ‘তফসীর মাআরেফুল কোরআন’-এ সুরা মুদাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে^{১৯} :

“(২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে দক্ষ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছেন উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি।”

এখানেও দেখা যাচ্ছে অনুবাদক স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, এখানে ‘উনিশ’ দ্বারা কোনো

ফর্মুলা নয় বরং উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে।

তফসিরকারক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, “তফসিরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহলের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশজন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদের সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশজন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুন্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশজনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিসসা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।” (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল ক্বারআন, পৃষ্ঠা ১৪২১)।

অর্থাৎ ‘উনিশ’ সংখ্যাটা যে ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

(৫) নাসিম উদ্দিন আহমদ অনুদিত কোরান শরিফের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে ‘উনিশ’-এর ব্যাখ্যায় (পাদটীকায়) বলা হয়েছে^{১০} : ‘জাহান্নামের উনিশ জন রক্ষক।’— ‘Nineteen guardians of the Fire.’

(৬) সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী-এর ‘তাহফহীমুল কুরআন’-এ সূরা মুদ্দাছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে^{১১} : “(২৭) আর তুমি কি জান, সেই দোষখটি কি? (২৮) উহা কাহাকে জীবিত রাখে না আবার মৃত্যুবস্থায়ও ছাড়িয়া দেয় না। (২৯) চামড়া বলসাইয়া দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা উহা দোষখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদিগকে বানাইয়াছি। আর তাহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছি।”

তফসিরে বলা হয়েছে : “লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর মুখে শুনিতো পাইয়াছিল যে, দোষখের কর্মচারীর সংখ্যা হইবে মাত্র উনিশজন। এই কথা শোনামাত্রই তাহারা এই কথার উপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, এই কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, একদিকে আমাদের কাছে বলা হইতেছে যে, আদম (আ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ কুফরী ও নাফরমানী করিয়াছে তাহারা সকলেই দোষখে নিষ্কিণ হইবে। আবার সেই সঙ্গেই আমাদের কাছে বলা হইতেছে যে, এতবড় একটা বিশাল-বিরাত দোষখে এত

অসংখ্য মানুষকে আযাব দেওয়ার কাজে মাত্র ১৯ জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে! এই কথায় কুরাইশ সরদাররা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভাঙিয়া পড়িল। আবু জেহেল বলিল : ‘ভাই সব! তোমরা কি এতই দুর্বল ও অর্থব হইয়াছ যে, তোমরা দশ-দশ জন লোক মিলিয়াও দোষখের এক একজন কর্মচারী ও সিপাহীর মুকাবিলা করিতে পারিবে না?’ বনু জুমাহ গোত্রের একজন পাহলোয়ান বলিয়াই ফেলিল : ‘১৭ জনের সহিত তো আমি একাকীই মুকাবিলা করিব, অবশিষ্ট দুই জনকে তোমরা কাবু করিয়া লইবে।’ এই ধরনের অত্যন্ত হাস্যকর কথাবার্তার জওয়াবে এই বাক্যটি একটি মধ্যবর্তী কথা হিসাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।” (দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, ১৮শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)।

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোরান শরিফের অনুবাদে সূরা মুদ্দাছির এর ২৭-৩১ নম্বর পর্যন্ত আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে এ রকম^{১২} : “(২৭) তুমি কি জান সাকার কী? (২৮) উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। (২৯) ইহা তো গাত্রচর্ম দঙ্ক করিবে। (৩০) সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী। (৩১) আমি ফিরিশতাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি।”

(৮) সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসির ‘তাহফহীমুল ফী যিলালিল কোরআন’-এ এই আয়াতগুলো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে^{১৩} : “দোষখের প্রহরী থাকে ‘উনিশ জন’। এই ফেরেশতার ব্যক্তি না গোষ্ঠী, তা আমরা জানি না।” (পৃষ্ঠা ২৩৩)। “মোশরেকরা যে উনিশজনকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করেছিল তার রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আমি দোষখের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিযুক্ত করিনি।” (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখলাম সকল ইসলামি চিন্তাবিদ, তফসিরকারকের মতানুসারে সূরা মুদ্দাছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত ‘উনিশ’ কোনো ফর্মুলা বা কোড নয়। বরং তা দ্ব্যর্থহীনভাবে দোষখের (সাকার) প্রহরী উনিশজন ফেরেশতার কথা বোঝাচ্ছে।

কোরানের সূরা সংখ্যা

দাবি : “কোরানের সূরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।”

বর্তমানে বহুল প্রচলিত কোরানের সূরা সংখ্যা ১১৪ হলেও অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ খলিফা উসমানের ‘কোরান সংকলন কমিটি’ কর্তৃক প্রণীত কোরানের সূরা সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে আসছেন। তাঁরা সূরা ফালাক ও নাস কোরানের অংশ বলে মনে করেন না। তারা বলেন : “একটা কেশে কয়েকটি গ্রন্থি দিয়ে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) ন্যায় মহারাসুলের দিব্যজ্ঞানের বিকার ঘটানো যদি লাবীদের ন্যায়

একজন নগণ্য ইহুদির পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহলে জগতের অভিধান হতে ‘অসম্ভব’ কথাটা চিরকালের জন্য মুছে যাওয়া উচিত। কোরানের একটি আয়াতে এই মতের সমর্থন হচ্ছে—সূরা ফোরকানে বর্ণিত হয়েছে ‘এবং অত্যাচারী (কাফের)গণ (মুসলমানদিগকে সম্বোধন করে) বলে, তোমরা তো একজন জাদু ও মায়াবিষ্ট লোকের অনুসরণ করছ মাত্র। দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ উপমার সৃষ্টি করেছে, এর ফলে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং তারা আর পথ পেতে সমর্থ হবে না।’ (১ম রুকু) এই আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, ‘হজরতকে কেউ যে জাদু করেছে’, আরবের কাফেরগণই এরূপ কথা বলত। এই আয়াতে ঐ প্রকার উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করে ঐ মিথ্যাপ্রচারকদিগকে অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট বলা হচ্ছে। কোরানে ‘তা-হা’ সূরায় হজরত মুসা এবং ফেরআওনের জাদুকরদিগের ঘটনা বর্ণনার পর বলা হয়েছে-জাদুকরগণ কুত্রাপি সফলতা লাভ করতে পারে না।”^{৩৪}

অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদকে জাদু করা হয়েছিল এবং এ জাদু থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাজিল হয়েছে, এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। মাওলানা আকরাম খাঁ হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব হওয়া সম্পর্কে বলছেন : “এই সূরা দুটিকে (ফালাক ও নাস) অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গেছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ এবন-মাছউদ এ সূরা দুটিকে কোরানের অংশ বলে স্বীকার করেননি। নিজের মুসাবিদায় সূরা দুটি লিপিবদ্ধ করেননি এবং সমস্ত সাহাবীর মতের ও স্পষ্ট হাদিসগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন দৃঢ়ভাবে নিজের মত কায়ম রেখেছেন।” (দ্রষ্টব্য : ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক, পৃষ্ঠা ১৯৪)। তাহলে সূরা ফালাক ও নাসকে সঙ্গত কারণেই বর্জন করে আমরা কোরানের সূরা সংখ্যা ১১২টি বলতে পারি।

সূরা ‘ফাতিহা’ কী কোরানের অংশ, এ নিয়ে অনেক মুসলমানের মধ্যে সংশয়-দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি হচ্ছে, সূরা ফাতিহা পাঠে বুঝা যায় এটা আল্লাহর কথা নয়, এটা মানুষের কথা; আল্লাহ কখনো বলবেন না, ‘আমাকে সরল পথ দেখাও’ অথবা ‘আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।’

নবম সূরা ‘তওবা’ সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রচিত বয়ানুল কোরানে রয়েছে : “এই সূরাটি ইহার পূর্ববর্তী সূরা সূরায় আনফালের অংশ হওয়ার এবং স্বতন্ত্র সূরা না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার দরুন ইহার প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা হয় নাই।” (দ্রষ্টব্য : ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৩০৩)। এ প্রসঙ্গে ‘তফসীর মাআরেফুল কোরআন’-এ উল্লেখ আছে : “একটি সূরা সমাণ্ড হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হত, অতঃপর অপর সূরা শুরু হত। কোরআন মজীদে সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু

সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাযিল হয়, না রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্যে ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইস্তিকাল হয়। কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সূরা নয় বরং অন্য কোনো সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।” (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৫২)।

“সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা।” (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৫৩)।

তাহলে সূরা তওবা ও সূরা আনফাল একই সূরার অংশ না-কী দুটি ভিন্ন সূরা তা অমীমাংসিত।

সূরা ফীল ও সূরা কোরাইশ নিয়েও রয়েছে এরকম বিতর্ক। ‘তফসীর মাআরেফুল কোরআন’-এর ১৪৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : “এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা (কোরাইশ) সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু’টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু’টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু’টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর তৈরি এ কপিকে ‘ইমাম’ বলা হয়।” অর্থাৎ সূরা ফীল ও সূরা কোরাইশ একই সূরা না-কী দুটি ভিন্ন সূরা তা নিয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, কোরানের সূরা সংখ্যা যেমন হতে পারে ১১৪টি, তেমনি তা হতে পারে ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২ বা ১১৩টি এবং সবগুলোর পক্ষেই দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে; এবং এগুলো কোনোটাই (১১৪ ব্যতীত) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। তাই যারা কোরানের সূরা সংখ্যা ১১৪টি বলেন এবং একে স্থির ধরে শুধুমাত্র ১৯ দিয়ে বিভাজ্যতার কারণে এর পিছনে অলৌকিকত্ব খুঁজেন তাদের এ ধরনের অপচেষ্টার উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি থাকে না।

কোরানের আয়াত সংখ্যা

দাবি : “কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৩৩৪=৬৩৪৬) এবং এ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬+৩+৪+৬=১৯)।”

মিশরীয় বংশোদ্ভূত রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত ‘উনিশ সংখ্যার মোজেয়া’র অনেক একনিষ্ঠ অনুরাগী বাংলাদেশে আছেন। তাঁরা কেউবা ‘কোরানিক ১৯ সংখ্যার’ মিরাকলে আপ্ত হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কোরানের অলৌকিকত্ব প্রচারের জন্য, কেউবা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কোরানকে ‘অলৌকিক’ দাবি করে। বাংলাদেশের এরকম একজন অনুরাগী হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও কোরান বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। আমরা হিসেব করে দেখেছি তাঁর অনূদিত কোরানে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনূদিত কোরানের সরল বঙ্গানুবাদেও একই সংখ্যক আয়াত রয়েছে। ইউসুফ আলীর অনূদিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৯। হাফেজ মুনির উদ্দীন বা বাংলাদেশে ১৯-মিরাকল প্রচারকারীরা কী জানতেন রাশেদ খলিফা কোরানের নিজস্ব অনুবাদের নবম সূরা তওবা’তে শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) কেটে বাদ দিয়েছেন? কারণ (রাশেদ খলিফার মতে) : “উক্ত আয়াত দুটি মিথ্যা। সূরা তওবা মদিনাতে নাথিল হয়েছিল আর ঐ শেষের আয়াত দুটি অনেক আগে মক্কায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে এই আয়াত দুটি সূরা তওবার শেষে গেল কিভাবে? আবার এই আয়াতের সাক্ষী হিসেবে দুজনের কথা জানা যায়, যারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নন।”^{৩৫} ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকিরসহ স্বনামধন্য কোরানের ইংরেজি অনুবাদকেরা সূরার তওবা’র আয়াত সংখ্যা ১২৯ দিয়েছেন। তাদের অনূদিত আয়াত দুটি নীচে তুলে দেওয়া হলো^{৩৬} :

009.128

YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.

PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.

SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129

YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"

PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

রাশেদ খলিফার অনূদিত কোরানে নবম সূরা তওবা’র আয়াত সংখ্যা ১২৭টি।^{৩৭} হাফেজ মুনির উদ্দীনের কোরানেও সূরা তওবার শেষের আয়াত দুটি আছে : “(১২৮) (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। (১২৯) এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহতায়াল্লাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।”

রাশেদ খলিফা যে কোরানকে ‘আল্লাহর বাণী’ বলে দাবি করলেন এবং সেই কোরানই তাঁর মতে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিকৃতি থেকে উদ্ধারের জন্য দুটি আয়াত কেটে কমিয়ে নিজেই নতুন করে ‘ইচ্ছেমত’ কোরান অনুবাদ করছেন। পনেরশত বছর পর এই ধরনের অভিযানের গুরুতা-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে। তবে মূলে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা হল—এ রকম না হলে কোরানের অলৌকিকতা, ‘১৯ মিরাকল’ দেখানো যাচ্ছে না।

হাফেজ মুনির উদ্দীন কোরানের আয়াত সংখ্যার যে হিসাব দিয়েছেন, তা হলো : “হজরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হজরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হজরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হজরত আয়েশার (রা.) গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।” (দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)।

দেখা যাচ্ছে কোথাও (রাশেদ খলিফা প্রদত্ত) কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলা হয় নাই।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম কোরানের আয়াত সংখ্যার বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তা এরকম^{৩৮} : “কোরানের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের মত। শায়খ আদ-দানী (রা.) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একমত যে কোরানের আয়াত সংখ্যা মোটামুটি ছয় হাজারের মত। তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এই ছয়

হাজারের পরে কত সংখ্যা বেশি আছে তা নিয়ে। এ বিষয়ে ছয়টি মত পাওয়া যায় :

১. পূর্ণ ছয় হাজার; না বেশি, না কম।
২. ৬ হাজার ২শত ৪টি।
৩. ৬ হাজার ২শত ১৪টি।
৪. ৬ হাজার ২শত ১৯টি।
৫. ৬ হাজার ২শত ২৫টি।
৬. ৬ হাজার ২শত ৩৬টি।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা—

৭. মুসনাদ দায়লামীর এক বর্ণনায় আছে কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২শত ১৬টি।
৮. ইবনুদ দুরীস (রা.)-এর এক বর্ণনায় জানা যায় কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত।
৯. আমাদের দেশে ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত ৬৬টি।

কোরানের আয়াত সংখ্যা নির্ণয়ে এ মতবিরোধ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাধারণভাবে গণ্য করা হয় ৭টি। কিন্তু ইমাম হাসান (রা.)-এর মতে আয়াত সংখ্যা ৮টি। তিনি ‘বিসমিল্লাহ’-কেও একটি আয়াত গণ্য করেছেন। আবার কারও কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৬টি। এ মতানুযায়ী ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয় মিলে এক আয়াত এবং বিসমিল্লাহ আয়াত নয়। আবার কারো কারো মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৯টি।

তবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কোরানের প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে প্রতিটি সুরার যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখিত আছে তা এক সঙ্গে যোগ করা হলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬টি আর ‘বিসমিল্লাহ’-কে প্রতিটি সুরার এক একটি আয়াত গণ্য করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬+১১৩ = ৬৩৪৯টি।”

পৃথিবীর এতো জ্ঞানী-গুণী ইসলামি পণ্ডিত থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা-মাওলানা কেউই কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলেননি। যা রাশেদ খলিফা ‘কোরানের মিরাকল’ প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আমরা কী বলতে পারি রাশেদ খলিফা সম্পূর্ণ স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অযৌক্তিকভাবে কোরানের আয়াত সংখ্যার মনগড়া হিসাব দাখিল করেছেন; যেমন করে তিনি নিজের অনূদিত কোরানে সুরা ফুরকানের ৫৬ নম্বর আয়াত, সুরা ইয়াসিনের ৩ নম্বর আয়াত, সুরা শুরা’র ২৪ নম্বর আয়াতে এবং সুরা তাক্বির’র ২২ নম্বর আয়াতে ব্রাকেটে নিজের নাম ‘রাশেদ’ ঢুকিয়ে দিয়েছেন,

নিজেকে ‘রসুল’ হিসেবে প্রমাণের জন্য। দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, বাংলাদেশে মেজর জাহান মিয়া, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের মত পণ্ডিতরা কি বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যার সাথে রাশেদ খলিফাকৃত কোরানের আয়াত সংখ্যার গরমিল বা আয়াত কেটে কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? অবগত থাকলে, তবে কেন এই ধরনের গরমিল নিয়ে ‘কোরানের মিরাকল’ প্রমাণের অপচেষ্টায় शामिल হলেন? আবার জানা না থাকলে, কোনো ব্যক্তির ‘মিরাকল থিওরি’ নিয়ে নিজেই পূর্ণ তথ্য না জেনে কি কারণে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন? অর্থাৎ ‘মিরাকল-ফেরিওয়ালার’ মত তাঁরাও এর দায়ভার এড়াতে পারেন না।

কোরানে ‘বিসমিল্লাহ’ ও তার বর্ণ সংখ্যা

দাবি : “কোরানে ‘বিসমিল্লাহ’ ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।”

বর্তমানে কোরানে যুক্ত জের-জবর-পেশ-তাশদীদ-মদ ইত্যাদি নবী মুহাম্মদের কোরানে অস্তিত্ব ছিল না। হজরত ওসমান কর্তৃক সংকলিত-সম্পাদিত কোরানেও সমরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল না। সকলেই জানেন, আরবি বর্ণমালায় ২৯টি বর্ণ রয়েছে; এর মধ্যে ২৬টি বর্ণ বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে গণনা করা হয় এবং বাকি তিনটি বর্ণ (আলিফ, ওয়াও, ইয়া) স্বরবর্ণ হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণ তিনটি প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণরূপেই ধরা হত; পরে ‘আলিফ, ওয়াও, ইয়া’ তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের (মৃত ৭০৫) সময় গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কোরানের পঠন-লিখনের এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রথম ইরাকের বসরা নগরীর সুফি পণ্ডিত হাসানকে অনুরোধ করেন। হাসান জনৈক বসরাবাসী ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামারকে নিয়োগ করেন। ইয়াহিয়াই প্রথমে সিরিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত স্বরচিহ্ন এবং নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ডট পদ্ধতির ব্যবহার আরবি বর্ণলিপিতে শুরু করেন; হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের পার্থক্য, যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সমরূপতা ছিল তার পার্থক্য ও শব্দ নির্ধারণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে একটি বাক্যে শব্দের মধ্যে বিভক্তি, কমা, পূর্ণ ছেদ, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আরবি বর্ণলিপি বা লিখন পদ্ধতিতে এই নতুন জিনিস আমদানি সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কটরপন্থীদের আপত্তি ছিল ‘ঐসব ডট ও স্বরচিহ্ন পবিত্র কোরানের ওহী নয়, এগুলো বিধর্মীদের তৈরি।’ বিখ্যাত সুন্নি নেতা মালিক ইবনে আনাস (মৃত ৭৯৫) মসজিদে এই ‘সংশোধিত কোরান’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্থানীয় আলেম-ওলামা, বাদশাহ একমত হয়ে বললেন, পূর্বের ‘চিহ্নহীন’ কোরানই থাকুক যেমন সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনালয়) তোরাহ রয়েছে। ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান মনীষী হারুন ইবনে মুসা (মৃত ৮১৩) সর্বপ্রথম আরবি শব্দভাণ্ডার প্রস্তুত করেন। এরপর পুনরায় আব্বাসীয় খলিফা ইবনে মুজাহিদ (মৃত ৯৩৬) কোরানের পঠন পদ্ধতি, উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন

ইত্যাদির ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই গোলমালে পরিস্থিতির এখনো পূর্ণ সমাধান হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত কোরানের আবৃত্তি পদ্ধতি মোটামুটি সর্বজনসম্মত হলেও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পঠন পার্থক্য আগের মতোই রয়ে গেছে।^{১০}

এবার মূল আলোচনায় যাই। ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অর্থ ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ স্পষ্টই এ কথাটি একজন মানুষ বলবে, আল্লাহ নয়; কারণ মুসলমানরা কোরানকে ‘আল্লাহর বাণী’ বলে মনে করেন। তাই ‘বিসমিল্লাহ’ কোরানের অংশ হতে পারে না। অনেকে মনে করেন, ‘বিসমিল্লাহ’ কোরানের অংশ না হলেও হজরত মুহাম্মদ কোরান পাঠের আগে বা নির্দিষ্ট অংশ শুরু করার আগে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতেন, যা সাহাবিরা অনুসরণ করতেন। ফলে এই ‘বিসমিল্লাহ’ শব্দটি কোরানের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর ‘বিসমিল্লাহ’-এর অর্থ যেহেতু ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি’, তাই এর দ্বারা বোঝা যায় কোরান পাঠ এখনো শুরু হয় নাই, ‘বিসমিল্লাহ’-এর পরই তা শুরু হতে যাচ্ছে।

তফসির ‘মাআরেফুল কোরআন’-এ বলা হয়েছে : “‘বিসমিল্লাহ’ কোরান শরিফের সূরা নামলের একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ লেখা হয়। ‘বিসমিল্লাহ’ সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, ‘বিসমিল্লাহ’ সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়।” (পৃষ্ঠা ২)। তাই যে ‘বিসমিল্লাহ’ কোরানের অংশ কি-না তা নিয়েই রয়েছে ব্যাপক সন্দেহ, সেই বিসমিল্লাহর মধ্যে উনিশ মিরাকল খোঁজে কোরানকে অলৌকিক প্রমাণের প্রয়াস কতটা যৌক্তিক, তা যে কারো উপলব্ধি পারার-ই কথা।

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে দেখেছি সূরার সংখ্যা ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩ বা ১১৪-এর মধ্যে যে কোনোটিকেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সূরা ‘তওবা’ বাদে বাকি সূরার প্রারম্ভের ‘বিসমিল্লাহ’ বিবেচনায় আনলে এবং এর সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে সূরা নামলের ৩০তম আয়াতে উল্লেখকৃত ‘বিসমিল্লাহ’-কে যোগ করলে আমরা মোট ‘বিসমিল্লাহ’র সংখ্যা যেমন পেতে পারি ১১৪টি, তেমনি ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩টিও পেতে পারি, যাদের কোনোটিই (১১৪ বাদে) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

তাই কোরানে ‘বিসমিল্লাহ’ ১১৪ বার আছে এবং একে স্থির বলে ধরে নিয়ে তার মাঝে ‘মোজেয়া’ খোঁজা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে।

ইসলামি ভাষ্য মতে, ‘কোরান আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত অথবা অন্য কোনো উপায়ে মৌখিকভাবে নাজিল হয়েছে, কোনো লিখিত দলিল আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি।’ তাই কোরানের কোনো একটি বাক্যে কতটি বর্ণ আছে তা হিসেব করতে

হলে মৌখিকভাবে উচ্চারিত বর্ণগুলো হিসেবে আনতে হবে, উহ্য যেসব বর্ণ লেখার সময় আসে, সেগুলো হিসেবে আনা ঠিক হবে না। যাহোক, এভাবে হিসেব করলে ‘বিসমিল্লাহ’র বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩টি। যেসব বর্ণ (যেমন) দুবার উচ্চারিত হয়েছে (তাশদিদযুক্ত হরফ) সেগুলোকে দুবার গণনা করলে দাঁড়ায় ১৬টি। খাড়া জবর যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেবে আনলে মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি।

এবার ‘বিসমিল্লাহ’র লিখিতরূপটিও যদি বিবেচনায় আনা যায় তবে তাশদিদযুক্ত হরফ যেহেতু দুবার উচ্চারিত হয় তাই এগুলোকে দুইবার উল্লেখিত ধরলে ‘বিসমিল্লাহ’র মোট বর্ণ সংখ্যা হয় ২২টি। সেই খাড়া জবরদ্বয় যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেব করলে মোট বর্ণের সংখ্যা হয় ২৪টি (যেহেতু ‘বিসমিল্লাহ’য় তাশদিদযুক্ত লামের পূর্বে একটি উহ্য লাম রয়েছে তাই তাশদিদযুক্ত লামকে একবার গণনা করলে হিসাবটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১ ও ২৩); আর এক্ষেত্রে তাশদিদযুক্ত হরফগুলো একবার গণনা করলে দাঁড়ায় ২১টি। যদি আমরা তাশদিদযুক্ত হরফগুলোকে একবার গণনা করি আর খাড়া জবরকে বিবেচনায় না আনি এবং উচ্চারণে উহ্য বর্ণগুলোকেও হিসেবে আনি তবেই কেবল ‘বিসমিল্লাহ’র মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। তাই এ হিসেবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কিছুই নেই। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’, মূলে ছিল ‘বি-ইসমিল্লাহ’; কিন্তু অধিক ব্যবহারের কারণে পরবর্তীতে মধ্যের ‘আলিফ’-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন মধ্যের আলিফ বাদ দিয়ে ‘বিসমিল্লাহ’-য় মোজেয়া খোঁজা কতটুকু প্রাসঙ্গিক? এবং এই আলিফের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, তা পরিষ্কার নয়।

এখানে আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ, আরবি ভাষার বর্ণসংখ্যা গণনা পদ্ধতি ও লেখার পদ্ধতি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে যার ফলে কোরানের বর্ণসংখ্যার হিসাব সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কোরান-বিশেষজ্ঞরা কোরানের বর্ণসংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে খুবই দ্বিধাবিভক্ত।

রাশেদ খলিফা শুধু ‘বিসমিল্লাহ’র বর্ণ সংখ্যার মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজার চেষ্টা করেননি, ‘বিসমিল্লাহ’র অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন : “কোরানে ‘ইসম’ শব্দটি ১৯ বার, ‘আল্লাহ’ শব্দ ২৬৯৮ বার, ‘আর রাহমান’ শব্দ ৫৭ বার এবং ‘আর রাহিম’ ১১৪ বার রয়েছে যাদের সবগুলোই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।”

১৯৮৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ‘The Muslim Digest’ (জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা) পত্রিকা রাশেদ খলিফার ‘গাণিতিক চালাকি’কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ‘অনিষ্টকর উৎপথগামী’ (sinister heretic) বলে মন্তব্য করেছে। তারা বলছেন : “রাশেদ খলিফার দাবি মত কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দের সংখ্যা ২৬৯৮ নয়, এটি ২,৮১১ বার; আর-রাহমান ৫৭ বার নয় বরং এটি ১৬৯ বার এসেছে।” পূর্বেও ঐ পত্রিকা (জুলাই/আগস্ট, ১৯৮১ এবং মার্চ/এপ্রিল, ১৯৮২ সংখ্যা) রাশেদ খলিফার কোরান নিয়ে ভুলভাবে ‘মিরাকল’

উপস্থাপনের জন্য সমালোচনা করেছে।

কোরানে 'বিসম' শব্দটি ৩ বার, আলাদাভাবে 'ইসম' শব্দটি ১৯ বার এবং 'ইসমুহ্' শব্দটি এসেছে ৫ বার। তাই 'ইসম' মোট ২৭ বার। বহুবচনরূপে 'ইসম' শব্দটি এসেছে ১২ বার; অর্থাৎ মোট ৩৯ বার 'ইসম' শব্দটি কোরানে এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। 'বিসম' ও 'ইসমুহ্'-এর সাথে 'ইসম' শব্দটি রাশেদ খলিফা তাঁর '১৯ মিরাকল'-এ হিসেব করেননি অথচ 'লিল্লাহ'-তে অন্তর্ভুক্ত 'আল্লাহ' শব্দটি হিসেব করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ এটি না করলে তাঁর '১৯ মিরাকল'-এর মিরাকল আর থাকছে না। আবার 'আর রাহিম' শব্দটি কোরানে ১১৪ বার রয়েছে, সেটি সত্য নয়। 'আর রাহিম' কোরানে এসেছে মোট ১১৬ বার (একবার বহুবচনে) যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।^{১০}

কোরানের বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা

দাবি : “কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬)।”

“সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুদাল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেরীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।” (দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)। উল্লেখিত কোরানের তিনটি বর্ণ সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আর সাহাবায়ে কেরামরা কেউই রাশেদ খলিফা প্রদত্ত কোরানের বর্ণসংখ্যার হিসেব দেননি। এখন কোরানের বর্ণসংখ্যা নিয়ে কোন দাবিটি (রাশেদ খলিফার হিসেবকৃত বর্ণসংখ্যা ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরামের বর্ণসংখ্যা) সঠিক? বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আবার হজরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রচিত *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২১২৫০ উল্লেখ করা হয়েছে। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)।

আমাদের জানা মতে রাশেদ খলিফা যদিও কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব দাবি করেননি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিধায় কোরানের শব্দসংখ্যা ও বিভিন্ন অক্ষর সংখ্যা নিয়ে প্রখ্যাত ইসলামি বুজুর্গদের মতামত তুলে দেওয়া হল :

কোরানের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামরা তাদের যুগে কোরানের শব্দসংখ্যাও নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন রেওয়াজ পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী কোরানের শব্দসংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানের কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

বয়ানুল কুরআন-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যা ৮৬,৪৩০ উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম বলেন : কোরানের শব্দ সংখ্যা কত সে বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. ৭৭৯৩৪ (সাতাত্তর হাজার নয়শত চৌত্রিশটি)
২. ৭৭৪৩৭ (সাতাত্তর হাজার চারশত সাঁইত্রিশটি)
৩. ৭৭২৭৭ (সাতাত্তর হাজার দু'শত সাতাত্তরটি)

কোরানের হরফ সংখ্যাও এক কথায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে শায়খ ইবনুদ দুয়ীস (র)-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, কোরানের সর্বমোট হরফ সংখ্যা হচ্ছে ৩২৩৬৭১ (তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত একাত্তরটি)। (দ্রষ্টব্য : উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র, পৃষ্ঠা ১৯)। উল্লেখিত সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আরবি ভাষার ২৯টি বর্ণ দিয়ে কোরান রচিত। কোরানে এই ২৯টি অক্ষরের পরিসংখ্যান হাফেজ মুনির উদ্দীনের অনূদিত কোরান থেকে তুলে ধরা হল : আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, কাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানে ২৯টি অক্ষরের মধ্যে কাফ ও লাম-এর সংখ্যা বাদে আর কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হজরত আশরাফ আলী খানভী'র *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে কোরানের ২৯টি অক্ষরের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নীচে তুলে ধরা হল :

আলিফ ৪৮৮৭১, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭২, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬৪২, যাল ৪১৯৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৮৫১, শীন ৩২৫৩, সোয়াদ ২০১৩, দ্বোয়াদ ১৬০৭, ত্বোয়াদ ১২৭৪, যোয়া ৮৪২, আইন ১৪১০০, গাইন ২২০৮, ফা ৪৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫২৩, লাম ৩৪১২, মীম ২৬৫৩৫, নুন ২৬৫৬০, ওয়াও ২৬৫৩৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭২০, ইয়া ৩৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, পৃষ্ঠা ২১)। এখানের কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দটির সংখ্যা

দাবি : “কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৪২=২৬৯৮)। এছাড়া ‘আল্লাহ’ উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলে যোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৬২১৭=১১৮১২৩)।”

আমরা জানি, রাশেদ খলিফা ৯ নম্বর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) ‘মিথ্যা’ দাবি করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ সুরা তওবার শেষ আয়াতে ‘আল্লাহ’ শব্দটি রয়েছে। সুতরাং হিসাবটির কি অবস্থা দাঁড়ালো তা সহজেই অনুমেয়।

সুরা আলাক

দাবি : “প্রথম নাজেলকৃত সুরা আলাক-এর আয়াত সংখ্যা ১৯। কোরানের পেছন দিক থেকে গণনা করলে তার ক্রমিক নম্বর হয় ১৯। এছাড়া সুরাটির সর্বমোট আরবি বর্ণসংখ্যা ৩০৪ (১৯×১৬)। সুরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণসংখ্যা ৭৬ (১৯×৪) এবং শব্দ সংখ্যা ১৯টি।”

সুরা নাস ও সুরা ফালাক নিয়ে মতানৈক্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ইসলামি পণ্ডিতদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, সে হিসেবে ৯৬ নম্বর সুরা আলাক কোরানের পেছনের দিক থেকে ১৯নং সুরা নাও হতে পারে। আবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পেছনের দিক থেকে গণনা করতে হবে? কেন সামনের দিক থেকে নয়? মিলে যায় বলে? পেছনের দিকটি কি কোনো বিশেষ কারণে (রাশেদ খলিফার) বেশি প্রিয়? সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা এবং প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণ সংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা রাশেদ খলিফা ঠিক কিভাবে-কোন পদ্ধতিতে গণনা করেছেন, তা খুব পরিষ্কার নয়। রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা, প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণসংখ্যা ও শব্দ সংখ্যাকে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য দাবি করলেও সবগুলো আয়াতের সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ১৯ মিরাকলের বিবেচনায় আনেননি। কারণ এখানে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার দাবি করা যাচ্ছে না। আবার সুরা আলাকের আয়াত সংখ্যা ১৯টি ধরেছেন;

অথচ এই সুরার প্রারম্ভের ‘বিসমিল্লাহ’কে আয়াত হিসেবে ধরলে আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।

সুরা নাসর

দাবি : “সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ নাজেলকৃত ওহি। সুরাটির প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।”

এ বিষয়ে বেশ কিছু ভিন্নমত রয়েছে, যেমন :

১. সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ ওহি বলে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।
২. সুরাটি প্রথম আয়াতে আলিফের প্রতিনিধিত্বকারী খাড়া, যবর ও তাশদিদ রয়েছে যা বর্ণ গণনার সময় ‘বিসমিল্লাহ’র মতো একই সমস্যার সৃষ্টি করে।
৩. সুরা নাসর যদি সর্বশেষ ওহি হয় তবে নিয়ম অনুযায়ী এই সুরার সর্বশেষ আয়াতটির বর্ণসংখ্যা বিবেচনায় নেওয়ার কথা। এছাড়া রাশেদ সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যাও বিবেচনায় আনতে পারতেন। কিন্তু কেন তা করেননি, তা বুঝতে বুদ্ধিমান পাঠকের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।
৪. কোরানের সর্বশেষ সংযুক্ত সুরা ‘সুরা নাস’-এ ধরনের বিভাজ্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

হরুফে মুকাত্তাত

রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত বা কিছু সুরার প্রারম্ভে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে নিয়ে পূর্বের মতই অলৌকিকতার জাল বুনেছেন। এক্ষেত্রেও ১৯ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার প্রমাণের জন্য রীতিমতো মনগড়া হিসাবের আশ্রয় নিয়েছেন। অহেতুক লেখাটির কলেবর না বাড়িয়ে উৎসাহী পাঠকদের অনুরোধ করবো রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কিত যে হিসেব দিয়েছেন, তা নিজেরাই একটু যাচাই করে দেখুন, এর অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়ে পড়বে। প্রথমেই একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করবেন রাশেদ খলিফা ২৯টি সুরার প্রারম্ভে হরুফে মুকাত্তাত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ ২৯ সংখ্যাটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হরুফে মুকাত্তাতযুক্ত ২৯টি সুরার বেশিরভাগই মাদানি সুরা, যাদের (হরুফে মুকাত্তাত) ‘সুরার মূল অংশ’ বলে ধরা হয় না। বলা হয়ে থাকে এগুলো যুক্ত হয়েছে সম্পাদনার সময়। ‘অর্থহীন’ হরুফে মুকাত্তাতগুলোর মাহাত্ম্য অজানা, অর্থ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং ‘অতীন্দ্রিয় ও অবাস্তব’ দাবি করে অযথাই রহস্যের জাল তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম মনীষীরা হরুফে মুকাত্তাতের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। ইবনে সিনা, সুয়ুতি, ইবনে খালেদুন, আল-জামাখশারি, আল-বাদাবী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির এ ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি বলেন : আল-কোরানের ১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের প্রারম্ভে ব্যবহৃত ‘কাফ-হা-ইয়া-আইন-সা’দ

অক্ষরগুলো আল্লাহর পাঁচটি গুণাবলীকে প্রকাশ করছে; যেমন কাফ (ك) অক্ষরটি করিম (সদয়), হা (ه) অক্ষরটি হাদী (পথপ্রদর্শক), ইয়া (ي) অক্ষরটি হাকিম (বিজ্ঞ), আইন (ع) অক্ষরটি আলিম (জ্ঞানী), এবং সোয়াদ (ص) অক্ষরটি সাদিক (ন্যায়নিষ্ঠ) বোঝাচ্ছে। তদ্রূপ ৭ নম্বর সুরা আল-আ'রাফ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ' দ্বারা বোঝায় 'আনাল্লাহু রাহমানুস সামাদ' (আমি আল্লাহ, দয়ালু ও চিরঞ্জীব)। আল-বাদাবী একই ধরনের মত পোষণ করে বলেন : “১৩ নম্বর সুরা আর্ রা'দ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'আলিফ-লাম-মীম-রা' অক্ষর দ্বারা 'আনাল্লাহু আলিমু ওয়ারা' (আমি আল্লাহ সবজান্তা, সর্বদ্রষ্টা) বুঝিয়েছে। পাশাপাশি ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষক যেমন এলয়স স্প্রাঙ্গার, থিওডোর নলডেক, হার্সফিল্ড, ওটো লথ, হ্যাস বুয়ের প্রমুখ ব্যক্তিরও কোরানের হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষকদের মধ্যে হার্সফিল্ড (Hartwig Hirschfeld) হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বলেন^{৪১} : “সোয়াদ (ص) অক্ষরটি নবী মুহাম্মদ পত্নী হাফসার জন্য, নূন (ن) অক্ষরটি হজরত ওসমানের জন্য, মীম (م) অক্ষরটি আল মুগিরা, ত্বোয়া (ط) অক্ষরটি (হজরত আয়েশার ছোট বোনের স্বামী) তালহা ইত্যাদি। এরা সকলেই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কোরান সংকলনের সাথে।” অর্থাৎ হার্সফিল্ডের মতানুসারে কোরান সংকলনের সাথে জড়িত ব্যক্তির কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথমে নিজেদের নামকে সাংকেতিক চিহ্নরূপে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, page 155-156)।

আমরা রাশেদ খলিফার ‘১৯ মিরাকল’-এর কয়েকটি মূল দাবি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এ ধরনের আরও বেশ কিছু দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন যা শুধুই তাঁর কৌশলী ধূর্ততা প্রকাশ করে। রাশেদ খলিফার এ ধরনের দাবি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত যেসব সংখ্যা কৌশলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য বলে চালিয়ে দেওয়া যায় সেগুলোকেই শুধু বিবেচনায় এনেছেন। কিন্তু কোরানের সাথে সম্পর্কিত এমন অনেক কিছু আছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় অথচ হতে পারত। নীচে এরকম কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো :

১. কোরানের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যার কোনোটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
২. কোরানের প্রতিটি সুরার আয়াত (যথা সুরা বাকারার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, সুরা আল-ই-ইমরানের আয়াত সংখ্যা ২০০ ইত্যাদি), শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারত।
৩. বলা হয় কোরান ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে

নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

৪. হজরত মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করেন। ৪০ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আবার ৬২ (অন্য হিসেবে ৬৩) বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৬২ বা ৬৩ সংখ্যাগুলির কোনটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
৫. কোরানের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতে পারত।
৬. কোরানের যে আয়াতে ১৯ ম্যাজিকের কথা বলা হচ্ছে, তা হল ৭৪ নম্বর সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াত। ৭৪ এবং ৩০ সংখ্যাদ্বয় ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
৭. কোরানের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।
৮. কোরানের সুনির্দিষ্ট সুরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, শব্দ-বর্ণ সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা কোরান বা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।^{৪২} ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যতা যদি কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে তবে ১৯ দ্বারা অবিভাজ্যতা লৌকিকতার প্রমাণ হবে না কেন?

নিঃশেষে বিভাজ্যতা

আমাদের প্রয়োজনের কারণেই কখনো কখনো নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি; ধরা যাক, ১০টি আম আছে এবং সংখ্যায় মোট পাঁচ জন ব্যক্তি রয়েছে। তাহলে সহজেই সবার মধ্যে সমান ভাগে আম ভাগ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আম যদি ১১টি হয়, তবে পাঁচ জনের কাছে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে; অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্যতা হলে আমরা অনেক সময় খুব সহজেই চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। আবার অনেক সময় নিঃশেষে বিভাজ্যতার কোনো প্রয়োজন হয় না, যেমন পানীয়ের ক্ষেত্রে। পানীয়কে আমরা ইচ্ছেমত সমানভাগে ভাগ করতে পারি। আরেকটি কথা ক্রমিক যে কোনো ১৯টি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। তাই নিঃশেষে বিভাজ্যতার সাথে অলৌকিকতার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে যদি কেউ অলৌকিক বলে দাবি করেন তবে অবিভাজ্যতাকে কেন অলৌকিক বলা যাবে না? যেমন কেউ বললো, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের (অধ্যায় সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা, বর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি) কোনো কিছুই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাই গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ একটি ‘অলৌকিক কাব্যগ্রন্থ’। তখন অলৌকিক-অন্বেষণকারীরা কি জবাব দিবেন?

কেন ১৯?

কোরানে ৭ আসমানের কথা আছে, ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু রাশেদ খলিফা কোরানে এত সংখ্যা থাকতে কেন ১৯ সংখ্যাটিকে বেছে নিলেন তার একটি জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন, যদিও তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। যেসব কারণ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তার বেশ কতকগুলো পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রাশেদ খলিফা প্রদত্ত আরো কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক^{৪০} :

১। ১৯ একটি মৌলিক সংখ্যা।

> মৌলিক সংখ্যা তো প্রচুর আছে, যেমন ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ২৩ ... ইত্যাদি। আর কোরানেও তো ১৯ ছাড়া আরো কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন ৭।

২। ১ ও ৯ অঙ্কদ্বয় পৃথিবীর সব ভাষায় একই রকম। অর্থাৎ ১ ও ৯-এর লিখিতরূপ পৃথিবীর সব ভাষায় একই।

> অলৌকিকতা অন্বেষণের এ ধরনের উচ্ছ্বলা একমাত্র মূর্খতা আর নির্বুদ্ধিতার মহামিলনের ফলেই সম্ভব।

৩। $10 + 9 = 19$

$$10^2 - 9^2 = 19$$

> এটি যে কোনো পর্যায়ক্রমিক দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

$$3 + 2 = 5$$

$$3^2 - 2^2 = 5$$

$$5 + 4 = 9$$

$$5^2 - 4^2 = 9$$

$$13 + 12 = 25$$

$$13^2 - 12^2 = 25$$

এটিকে কারণ হিসেবে ধরলে, রাশেদ খলিফার ‘কৌশলী মানসিকতা’ আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

৪। আমরা যেসব অঙ্ক গাণিতিক কাজে ব্যবহার করি, তার প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষ সংখ্যা ৯।

> গাণিতিক হিসাব-নিকাশে আমরা সাধারণত দশমিক পদ্ধতি বা দশভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করি। মানব-ইতিহাসে সংখ্যার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে দশভিত্তিক সংখ্যা গণনা সুবিধাজনক হওয়ায় (কেউ কেউ বলেন আমাদের হাতে দশটি আঙুল থাকায়) এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন অনুসরণ করে আসছি; যেমন আমরা গণনার সময় ৯ এর

পরই ১০ চলে যাই কিন্তু এর মধ্যে আরো কিছু সংখ্যা থাকতে পারতো অথবা কিছু সংখ্যা কম হতে পারতো। তাই দশমিক পদ্ধতির গণনায় (০ বাদ দেওয়ায়) প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষ সংখ্যা ৯ হওয়ার সুবাদে এখানে কী অলৌকিকত্ব পাওয়া গেল তা বোধগম্য নয়?

বর্তমানে শুধু দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাও নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে আরো কিছু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন :

বাইনারি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সংখ্যা হচ্ছে দুটি ০ ও ১। কম্পিউটারের যাবতীয় সব প্রোগ্রাম এই বাইনারি মেথডে লেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ১৯ লেখা হয় ১০০১১।

অকটেট পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রথমটি ০ ও শেষটি ৭। আর এ পদ্ধতিতে ১৯ লেখা হয় ২৩।

হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয় তার প্রথমটি ০ ও শেষটি F। এ পদ্ধতিতে ১৯কে লেখা হয় ১৩।

তাই শুধুমাত্র ডেসিমেল বা দশমিক পদ্ধতিকে বিবেচনায় এনে ১৯-এর মধ্যে অলৌকিকত্ব খোঁজাকে ‘উদ্দেশ্যমূলক’ বলে ধরে নিতে হবে।

১৯ একটি ছোট সংখ্যা। ভালো করে খোঁজলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য অনেক কিছুই (যেমন কারো জন্ম সাল, মৃত্যু সাল, জীবনের স্মরণীয় ঘটনার তারিখ, মাসিক আয়-ব্যয়, কিংবা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা, অধ্যায়, শব্দ ইত্যাদি) সংখ্যা পাওয়া যাবে। শুধু ১৯ কেন, এরকম যে কোনো ছোট সংখ্যা দ্বারা একই ধরনের অলৌকিকতার দাবি উত্থাপন করা সম্ভব।

সম্ভাবনা ও অলৌকিকতা

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত কিছু সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বলে দাবি করে একেই কোরানের অলৌকিকতার পক্ষে প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। ‘১৯ মিরাকল’ বিষয়টি যদি সত্যি সত্যি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি যে কোনোটির বেলায় ঘটত তবে কেউ কি ঐ গ্রন্থকে অলৌকিক বলে মেনে নেবেন? যদিও অনেক গ্রন্থে এই ধরনের ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে তবে কেউ তা গণনা করার চেষ্টা করবে না; কারণ এর মধ্যে অলৌকিকতা (মূলত সংখ্যা তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার) খুঁজে বের করলেও তা বাজারে চলবে না, ধর্মব্যবসাও হবে না।

সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন। একজন লেখকের লেখা কোনো একটি গ্রন্থ

(নকল করা ছাড়া) হুবুহু আরেকজন লেখকের পক্ষে কাকতালীয়ভাবে লিখে ফেলা একদম অসম্ভব। শরৎ চন্দ্রের ‘পথের দাবী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরে-বাইরে’ বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখবেন না, এটাই স্বাভাবিক এবং এর অন্যথা অসম্ভব। এ জন্য এই গ্রন্থগুলি অলৌকিক হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি কোনো কিছুই অসম্ভাব্যতা এর অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে না।

রাশেদ খলিফার দাবি যদি সত্যি হত

রাশেদ খলিফার দাবি মত যদি কোরান সত্যিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা আবদ্ধ থাকতো তবুও এ সম্পর্কে দুটি কথা বলার অবকাশ থাকতো :

১। এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় (Coincidence)। এ রকম অনেক ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকে, যেমন ফিবোনাক্সি রাশিমালা। এ ধরনের ঘটনা যদি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ বা অন্য বিষয়ে পাওয়া যায় তবে তা অলৌকিক বলে দাবি করা হয় না। তাছাড়া মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করা যায় : কোনো গ্রন্থের বা কোনো বিষয়ের রচনামূল্য (Style) কি ঐ বিষয়বস্তুর বৈধতা দিতে পারে? স্টাইল হচ্ছে কেমন করে-কিভাবে একটি বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে, আর বিষয়বস্তু হচ্ছে কী উপস্থাপন করা হবে। উত্তরটা হচ্ছে না, স্টাইল বিষয়বস্তুর বৈধতা বা Validity দিতে পারে না; কারণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন করা সম্ভব আর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু একই স্টাইলে বা রচনামূল্য দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব। স্টাইল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নেই। স্টাইল বা রচনামূল্য বলতে বুঝি : কোন ভাষায় এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, গদ্যে না পদ্যে, এটি মৌখিক না লিখিত, হস্তলিখিত না প্রিন্ট করা, লেখার অক্ষর কত বড়, বাক্য কত বড়, অক্ষরের সংখ্যা কতটি, শব্দ-প্যারাগ্রাফ-লাইন কতটি, বিষয়টি কি শ্রুতিমধুর, সুন্দর, শব্দগুলো-বাক্যগুলোর মধ্যে অন্তর্মিল কিরকম, বাচনভঙ্গি কিরকম ইত্যাদি।^{৪৪} রচনামূল্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, কোরানসহ যে কোনো ধর্মগ্রন্থকেই তার রচনামূল্য দ্বারা অলৌকিক দাবি করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২। এটি পূর্বপরিকল্পিত; যেমন আমেরিকান লেখক Ernest Vincent Wright-এর লেখা Gadsby: Champion of Youth উপন্যাসটি বা ইভান পেনিনের আবিষ্কার ওল্ডটেস্টামেন্টের অলৌকিক ৭ সংখ্যা। যেহেতু বাইবেলে বলা হয়েছে অনেক লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই পূর্বপরিকল্পিতভাবে ৭ সংখ্যটি সময়ে সময়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘কোরান’-এর অলৌকিকত্ব সংশয়পোষণকারীরা বলেন : “হজরত মুহাম্মদ উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন না। বোখারির প্রচুর সহি হাদিস রয়েছে যা নবী মুহাম্মদকে লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করে; যেমন সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ৬৫; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ১১৪। ঐ সময়ে (ষষ্ঠ শতাব্দী)

আরবের কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। মুহাম্মদ তাঁর সাথীদের নিয়ে কোরান রচনা করেছেন যা কোনো কঠিন কাজ নয়। কোরানকে অতুলনীয় গ্রন্থ বলা যায় না; বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। যদিও তাতে (কোরানে) প্রায়শই জোরপূর্বক অলৌকিকতা আরোপের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বর্ণসংখ্যা ও বাক্যসংখ্যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে অগণিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ (সনেট)। অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯ সংখ্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই কোরান রচনা করেছিলেন।”

কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্যের জবাব রাশেদ খলিফার ‘১৯ মিরাকল’ থেকে দেওয়া যায় না। কোরানকে অলৌকিক প্রমাণের ‘রাশেদ খলিফার সংখ্যাভিত্তিক’ কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম :

- ১) উনিশ নিয়ে কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণের রাশেদ খলিফার দাবি অন্তঃসারশূন্য।
- ২) কোরানের সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে শুধুমাত্র দোজখের ফেরেশতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে; কোনো অলৌকিক সংখ্যা (যেমনটা রাশেদ খলিফা দাবি করেছেন) বা অন্য কিছু বলা হয়নি।
- ৩) রাশেদ খলিফা কোরান শরিফে ‘অলৌকিকত্বের উপস্থিতি’ প্রমাণের জন্য কোরানের আয়াতে যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি আয়াত কেটে কমিয়ে দিয়েছেন, ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
- ৪) এই ধরনের কথিত ‘মিরাকল’ ধর্মগ্রন্থ কোরান ছাড়াও আরো অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।
- ৫) (ইসলামি ভাষ্য মতেই) সম্পূর্ণ কোরান যেহেতু লিখিতরূপে নাজেল হয়নি, তাই এর লিখিতরূপের মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে। একটি ভাষার লিখিতরূপ ভাষা বিশেষজ্ঞরা সময়ে-সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনে নির্ধারণ করে থাকেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটান। অর্থাৎ ভাষার লিখিতরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক।

‘মিরাকল’ টাইটেল জুড়ে দিয়ে কোটি মানুষের দুর্বল আবেগ-অনুভূতির কেন্দ্র ‘ধর্মগ্রন্থ’ নিয়ে অসাপ্ত ব্যবসার চমৎকার উদাহরণ রাশেদ খলিফার এই ‘১৯ মিরাকল’। যুগে যুগে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী এ ধরনের হুজুগ সৃষ্টি করে এসেছে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকে। এতে বিশ্বাসের কিছু নেই। কিন্তু অবাধ হতে হয় উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তির পর্যন্ত যখন নিজেদের দীর্ঘদিনের অর্জিত কাণ্ডজ্ঞান-যুক্তিবোধ-শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু রহিত করে গা ভাসিয়ে দেন হুজুগের

তালে।

উৎস নির্দেশ

- ১) David Hume, *An Inquiry Concerning Human Understanding*, Section X "Of Miracles," (1748), Bobbs-Merrill, Library of Liberal Arts edition. <http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html#10>
- ২) <http://www.newstatesman.com/Life/200606050009>
- ৩) আরও দেখুন : Ali Sina, *The Miracles of Allah*, http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/miracles_of_allah.htm
- ৪) The Skeptic's Dictionary, *pareidolia*, <http://www.skeptdic.com/pareidol.html>
- ৫) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=487764&in_page_id=1811
- ৬) Ernest Vincent Wright-এর উপন্যাসটি পাশের ওয়েব সাইট থেকে পাঠ করা যাবে : <http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html>
- ৭) অনন্ত বিজয়, 'ফিবোনাক্সির গণিত রহস্য', সাপ্তাহিক দিবালোক, ঈদসংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর (রোববার), ২০০৮, বিয়ানীবাজার, সিলেট, পৃষ্ঠা ৩।
- ৮) প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয় লৌকিক, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৯১।
- ৯) Uri geller, *The 11:11 phenomenon*, <http://www.uri-geller.com/articles/11.htm>
- ১০) The Skeptic's Dictionary, *law of truly large numbers (coincidence)*, <http://skeptdic.com/lawofnumbers.html>
- ১১) Keith Newman, *Is God A Mathematician?*, <http://www.wordworx.co.nz/panin.html>
- ১২) G. Nehls, *The Mysterious 19 in the Quran: A Critical Evaluation*, <http://www.answering-islam.org/Nehls/Ask/number19.html>
- ১৩) <http://www.greaterthings.com/Word-Number/CenterofBible/Psalm118.htm>
- ১৪) Rashad Khalifa : Biography; http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa
- ১৫) <http://www.submission.org/salat-how.html>
- ১৬) <http://www.submission.org/suras/sura25.html>
- ১৭) <http://www.submission.org/suras/sura36.html>
- ১৮) <http://www.submission.org/suras/sura42.html>
- ১৯) <http://www.submission.org/suras/sura81.html>
- ২০) <http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/>
- ২১) <http://www.submission.org/quran/app1.html>
- ২২) Martin Gardner, *The numerology of Dr. Rashad Khalifa-Scientist, Skeptical Inquirer*, Sept-Oct, 1997.

- ২৩) Submission.org, *Tampering With the Word of God*, Appendix 24, <http://www.submission.org/tampering.html>. And *Preserving and protecting the Quran*, <http://www.submission.org/quran/protect.html>.
- ২৪) কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১), প্রকাশক: নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ- অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯।
- ২৫) ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কমপিউটার ও আল কুরআন*, প্রকাশনায় : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মিরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩।
- ২৬) হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০০২।
- ২৭) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) (মূল উর্দু), *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৪২।
- ২৮) এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, *বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, প্রকাশক: এ, কে, এম, শহিদুল হক, কুমিল্লা, অনুবাদ কাল ১৯৬২-৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮০।
- ২৯) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), *তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃষ্ঠা ১৪১৯, ১৪২১।
- ৩০) অধ্যক্ষ নাসিম উদ্দিন আহমদ, *পবিত্র কোরআন* (পাদটীকাসহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ), রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩০০।
- ৩১) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাহফহীমুল কুরআন*, (অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ১৮শ খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৯।
- ৩২) *আল-কুরআনুল করীম*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৯৪ (অষ্টম মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ৯৬৮।
- ৩৩) সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাহফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ২১ তম খণ্ড, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪।
- ৩৪) সা'দ উল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ১৯৪।
- ৩৫) <http://www.submission.org/false-verses.html>
- ৩৬) <http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/>
- ৩৭) <http://www.submission.org/suras/sura9.html>
- ৩৮) এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম, *উচ্চ মাধ্যমিক*

ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫,
পৃষ্ঠা নম্বর ১৮-১৯।

- ৩৯) Benjamin Walker, *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, Rupa & Co, New Delhi, 2004, Page 158-159.
- ৪০) William Campbell, *A Numeric Miracle of the Number 19?*, <http://answering-islam.org.uk/Campbell/s6c1.html>
- ৪১) Aurthur Jeffery, *The Mystic Letters of the Koran*, http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/mystic_letters.htm.
- ৪২) Mumin Salih, *New Amazing Numerical Findings in the Quran*, <http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1836>.
- ৪৩) <http://www.submission.org/quran/app1-part2.html>
- ৪৪) Hekmat, *The Miracle of 19*, <http://www.faithfreedom.org/Articles/Hikmat10101.htm>